হুজুরের ঘোড়া

কিন্নর রায়

সৃষ্টি প্রকাশন

শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
—শ্রদ্ধাভাজনেষু

গল্পক্রম

নব-বৃন্দাবন	১১
নক্ষত্রের রাত	১৮
কথাকার	২৮
কামদেব-পুরাণ	৪০
বসুধারার স্মৃতি	৫০
কামধেনু	৬০
যাই	৬৭
বরফের গায়ে আগুন	৭৮
কোজাগরীর নৌকো	৯২
যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট	৯৯
মণ্ডুককথা	১০৫
আজান-গাছ	১১৪
অচিনতলা	১২১
হুজুরের ঘোড়া	১২৮

নব-বৃন্দাবন

আকাশে পুরনো কাঁথার নকশা হয়ে লেগে আছে চাঁদ। তার আলো কিশোরী সাগরের জলে নিজের মতো ফোকাস মেরে মাঝে মাঝেই ঝিমিয়ে পড়ছে। তখন চাঁদের মুখে কপালে ঠোঁটে মেঘের আড়াল। আবার সরে গেলে সেই আলো আলো।

অনেকটা দূরে দেউড়ি। বড় দেউড়ি। ছোট দেউড়ি। বাইরের রাস্তা থেকে এসে ঢোকার সময় প্রথম চোখ পড়ে যাতে, তার মাথায় লম্বা টানা খিলানে বটের চারা। অশ্বত্থের শেকড়। আরও কোনো জংলা লতা। গাছ। একটা বড় চাঙড় খুলব-খুলব, পড়ে যাব— এই পড়ব এবার, এমন একটা ভাব নিয়ে কোনোরকমে লেগে আছে চওড়া খিলানোর গায়ে। থামের গায়ে পলেস্তারা-খসা সরু সরু পুরনো ইটে যেটুকু চাঁদের আলো, তাতে সবটা অন্ধকার সরে না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে বনোয়ারিজিউ আকাশের দিকে তাকাল। আহা, এমন ভরা চাঁদে বৃন্দাবনের নিধুবন-কুঞ্জবনে সুমধুর বংশীধ্বনি। বাঁশি শুনে মুগ্ধ হরিণ, ময়ূর, গোরুর পাল। মুকুতা ফলের ঝোপে জ্যোৎস্না। যমুনার বুকে চাঁদ হাসে। ভাসে। আমি বাঁশি বাজাই। পাশে রাইকিশোরী। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, নন্দাদেবী, ইন্দুরেখা। দূরে কোথায় যেন কদম ফুটেছে। তার মন-কেমন-করা গন্ধ নিধুবন, কুঞ্জবন, দানগলি, মানগলির বাতাসে।

নীল যমুনার বুকে মাথা উঁচু করে ভেসে বেড়ানো হলুদ হলুদ কচ্ছপেরা আমার বাঁশি শুনে চুপ করে ভেসে আছে। গলার বনফুলের মালায়, মাথায় গোঁজা ময়ূর-পেখমে, গালে মাথা কদমরেণুর মাধুরীতে চাঁদ আর চাঁদ।

কষ্টিপাথরের কালোতে জ্যোৎস্না পড়েছে। নিজের পায়ে পায়ে পিছলে যাওয়া চাঁদের আলো দেখতে দেখতে বনোয়ারাজিউ পথ ভাঙছিল।

বড় দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেই বাঁ দিকে অনেক অনেক দিন আগের ঝাড়াল তেঁতুলগাছের ছায়ায় রাস্তা আর পাশের জমিতে বড় একখানা ছায়াছাপের ডিজাইন। উল্টো দিকেই ইস্কুল-বাড়ি। তার গায়ে কাগজের ওপর সবুজ লাল কালো কালিতে পোস্টার। 'নিমাই + বীথিকা = ?' নিমাই+বীথিকা+—এদের অবৈধ সম্পর্ক চলবে না।' 'মাস্টারমশাইরা ক্লাসে না পড়িয়ে টিউশনিতে বেশি মনোযোগী কেন? কর্তৃপক্ষ জবাব দাও।'

আমি এসব দেখতে পাই পাথরের চোখে। এসব নিজেকেই নিজে শোনাতে শোনাতে বনোয়ারিজিউ ডান দিকে তাকাল। দোতলা বড় বাড়ির টানা একতলায় এখন পুলিশ চৌকি। ছ'জন পুলিশ আছে। ধান কাটার সময় প্রতিবার গণ্ডগোল। খুনোখুনি। ঝাণ্ডা পোঁতাপুঁতি। দু'দলেরই লাল ঝাণ্ডা। অন্য রঙের পতাকাঅলারাও আছে।

মাথার ওপর দিয়ে তখনই একটা শাদা প্যাঁচা উড়ে গেলে তার ডানায় চাঁদের গুঁড়ো লেগে গোটা ছবিটাই বদলে গেল। প্যাঁচাটা গিয়ে শিবমন্দিরের মাথায় বসবে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চলে যাবে মেঠো ইঁদুরের খোঁজে। আহা, গত বারই তো—বনোয়ারিজিউর মনে পড়ল—হ্যাঁ, গত শীতেই—শীত সবে একটু পড়ব কি পড়ব না, পড়ব কি পড়ব না করছে—তখন আমার মন্দিরের বারান্দায় ছ'টা প্যাঁচার বাচ্চা। তার

একটা মরল কয়েকদিনের ভেতর। তারপর বাকি পাঁচটা বাচ্চা। একটু একটু করে বাড়ে। মা প্যাঁচা, বাবা প্যাঁচা—তারা রোজ মাঠ থেকে ব্যাঙ, ছুঁচো, ধেড়ে ইঁদুর মেরে আনে। নখে। ঠোঁটে।

মাছ-মাংস সব তো বারণ এই মন্দিরে। সেখানে মেঠো ইঁদুর, ব্যাঙ, ছুঁচো। দুর-দুর করে তাড়ানো হল প্যাঁচাদের। আহা, কী বাচ্চা তারা তখন। আর চিঁ-চিঁ-চিঁ করে কেমন তীক্ষ্ণ ডাক। বাচ্চারা কাঁদছিল মাটিতে পড়ে। ঠাণ্ডা। একটু-আধটু বৃষ্টি। আরে বাইরে ফেলল তো ওদের সেই পটাই হারামজাদা। একমাথা টাক। দু'পাশে একটু একটু চুল। রঙ দিয়ে তাকে আবার বাহারি করে রাখে। শখ আছে বলতে হবে। বুকের পাকা লোমেও লাগায় 'কেশকালা'। নইলে কেমন করে আমার গায়ের রঙের মতো তা এখনও কুচকুচে? সেই প্যাঁচার পাঁচটা ছানা তো ঝোপের পাশে মাটির ওপর পড়ে ভয়ে, খিদেয় চিল্লোচ্ছে। ওদের মা-বাবা রাতে দূরে ভাঙা দেউড়ির কার্নিশে বসে দেখে। মেঠো ইঁদুরের ঘাড় মটকে, নখে ব্যাঙ গেঁথে নিয়ে এসে ওদের খাওয়ায়-দাওয়ায়। কিন্তু হলে হবে কী! দিনে দেখলেই তো প্যাঁচার ছা-দের ঠোক্কর দেবে কাক। মেরে ফেলবে।

শেষ অব্দি পরের রাতে যেমন রোজ বেড়াতে বেরোই মন্দির থেকে, তেমনি বেরিয়ে ওদের তুলে দিলুম পুরনো বটগাছের খোঁদলে। সেই কোটরের ভেতর আনন্দে বাড়ল প্যাঁচারা। উড়ে গেল।

মন্দিরের গর্ভগৃহে রাতে রেড়ির তেলের বাতি, ঘিয়ের পিদিম জ্বলে। সেই আলোয় দেখে দেখে ফুলের একটা খালি ঝুড়ি করে পাঁচটা বাচ্চা এক সঙ্গে গুছিয়ে নিলাম। সবে চোখ ফুটেছে। হলুদ শক্ত ঠোঁট। গায়ে লোম বেরিয়েছে। পালক হয়নি। কী শক্তপোক্ত পা! ধারালো নখ। ঝুড়িতে চাপিয়ে প্যাঁচার বাচ্চাদের বটগাছের কোটরে দিয়ে এসে নিশ্চিন্দি। রাধারানী ঘুমোচ্ছিল। শয়ন দেয়ার পর তো ঘুমোতেই হয়। তার পেতলের মাজা গায়ে, সোনার গয়নায়, ঝলমলে মুকুটে রেড়ির তেলের আলো। ঘিয়ের পিদিমের ছায়া।

রাধারানি, তুমি বুড়ি হয়ে গেলে! রুক্মিণী সত্যভামারাও বুড়ি। এইসব বুড়িদের দিয়ে থাকা যায় দিনরাত! পা ভাঁজ করে বাঁকা হয়ে স্টাইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেরও কোমর গোড়ালি পায়ের পাতায় কী ব্যথা! তার ওপর কনুই মুড়ে, বাঁশি ধরে থাকা ঠোঁটের কাছে। সেও কম জ্বালা নাকি!

তা হলে আমিও কি বুড়ো হচ্ছি!

হলুদ কাপড় —পীতবাস —বনফুলের মালা, কদম্বরেণু, সুন্দরী গোপবালারা—কিছুই কি সময়কে আটকাতে পারে না! তো সে যা বলছিলাম, বটগাছের গর্তে প্যাঁচার বাচ্চাদের রেখে এলাম, সে রাতেই রাধারানী কত-কত বছর পরে যে হেসে উঠল। সেই হাসিতে বৃন্দাবন। নিধুবন-কুঞ্জবন। নীল যমুনার বুকে ভেসে থাকা পূর্ণিমা।

কেন হাসল রাধারানী!

কেন হাসল! কতদিন হাসেনি। হাসতে দেখিনি তাকে।

আমি তো পারিনি এই মন্দিরে এক ছাদের নিচে রাধারানী আর অষ্টসখিদের এক সঙ্গে রাখতে। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, নন্দাদেবী, ইন্দুরেখা—আরও কে কে সব—তারা তো

এখন কিশোরী-সাগরে। দিঘির জলে। মাছ হয়ে ভেসে আছে। অষ্টসখিদের পছন্দ করে না রাধারানী।

বন কেটে বসত হল বলে বনোয়ারিবাদ। ফিসফিস করে বলছিল দেউড়ি। তার মাথার খিলানে কোনোরকমে ঝুলে-থাকা পাথর বলল, ওভাবে বলো না—হাওয়া লাগলে আমি পড়ে যেতে পারি।

দেউড়ি চুপ করে গেল।

আর সেই পুলিশ চৌকির সামনে নরম মাটিতে বেশ খানিকটা গেঁথে-যাওয়া লোহার কামান উপুড় হওয়া কুমির হয়ে জ্যোৎস্না পোয়াতে পোয়াতে বলে উঠল, আমার নাম কামানদল। আমার নাম কামানদল।

আগে গোলা ছুঁড়তে হত। এখন কথা ছোঁড়ে। রোজই এক কথা—আমার নাম কামানদল। আমার নাম কামানদল। কে না জানে! যখন ধান দখল হয়, তা নিয়ে ফাটাফাটি বন্দুকবাজি, পার্টি, পুলিশ, খুন—তখন কোথায় থাক বাবা! তখন তো মুখে কুলুপ। শিবমন্দিরের প্রায় মাথায় উঠে যাওয়া ছাগলছানাটির যেমন হয়। একদম ডাক বন্ধ। মুখে তালা। দিনের বেলা সেখানে একজন দু'জন থানা-সেপাই। নয়ত পটাই। বসে বসে হাত-আয়নায় নিজের মুখ, মাথার চুল দেখে। কী যে এত দেখে!

আকাশ থেকে নেমে-আসা জ্যোৎস্না নিজের মতো ছড়াচ্ছিল অনেকটা দূরে চরকি ব্রিজে। তার নিচে বয়ে যাওয়া অজয়। পাচুন্দির ফাঁকা গো-হাটে চাঁদের দুধ। ঘরে-ফেরা গোরু, বলদের খুরের দাগ তখনও মাঠের কাদায়, ধুলোয়। যত্ন করে কারা যেন সব গোবর কাচিয়ে নিয়ে গেছে, তবুও সেই নাদি, চোনার ঝাঁঝালো গন্ধ সমস্ত গো-হাটা জুড়ে।

পাচুন্দি বর্ধমানে। পাচুন্দি থেকে কাটোয়ার দিকে যেতে গেলে বাজুয়া, চুরপুনি, ফুলবাগান মোড়। আরও পরে যাজিগ্রাম। সেখানে শ্রীনিবাস গোস্বামীর সমাধি। নিমগাছ। পরপর সব দেখতে পাচ্ছিল বনোয়ারিজিউ। আচ্ছা রাধা, তোমার এত হিংসে কেন! অষ্টসখিদের তুমি কেন জেদ করে করে সরিয়ে দিলে মন্দির থেকে? কই, বৃন্দাবনে তো এমন ছিলে না! বৃন্দাবন থেকে মুর্শিদাবাদের বনোয়ারিবাদে এসে সব কেমন বদলে গেল! রুক্মিণী-সত্যভামার সঙ্গে তো নয়, আমি মন্দিরে থেকে গেলাম তোমার সঙ্গে। কখনও একা একা। মানুষের মুখে মুখে কেমন ভেসে বেড়ায়—রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ। আগে তুমি পরে আমি। থাকতই না-হয় অষ্টসখিরা। তারা তো তোমায়-আমায় ঘিরে। বেদির চারপাশে। মূল আসনে তো তুমি আর আমি। সেখানে কেউ নেই। ভাবতে ভাবতে লম্বা হাই উঠল বনোয়ারিজিউর। আর তখনই চাঁদের আলোয় নিজেদের ছায়া দেখে ঝগড়া করতে করতে তিনটে কুকুর ছুটে গেল বড় দেউড়ির দিকে। দূরে কোনো চোরাগোপ্তা অন্ধকার থেকে ডেকে উঠল বুড়ো-তক্কক।

হাঁটতে হাঁটতে বনোয়ারিবাদের রানি কল্যাণীসাহেবার স্বপ্নে ভেসে উঠতে ইচ্ছে করল বনোয়ারিজিউর। মেহগনির উঁচু পালঙ্কে রানি।

ও বনোয়ারিজিউ—ঘুমের ভেতর বিড়বিড় করতে করতে রানি চিৎ হলেন। গায়ের ফর্সা রঙ অনেকটাই তামাটে। মুখের চামড়ায় সময়ের গিলে। মাথার পাকা চুলে সুন্দর করে

টেনে বাঁধা খোঁপা। সোনালি ফ্রেমের চশমাটি ভাঁজ করে রাখা মাথার বালিশের পাশে।

আধো-জ্যোৎস্নায় রানিকে লুকিয়ে দেখছিল বনোয়ারিজিউ। মাথার বালিশের শাদা ওয়াড়ে হাতে নকশা তোলা হলুদ-সবুজ টিয়েপাখি। তার ঠোঁটটি লাল।

ও রানি, উঁচু বালিশ নাও কেন? ঘাড়ে-পিঠে ব্যথা হবে যে!

স্বপ্নের ভেতর ছোটরাজকুমার — পছন্দকুমারের বিয়ে করা বৌ হাসল।

কবেই মারা গেল পছন্দকুমার। এখন রানির কত হবে, তা পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি। দুই মেয়ে। আমায় সকাল-সন্ধ্যে আরতির সময় রানি গিয়ে ঠিক মন্দিরে বসবে। অনেকক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসতে পারে না। বাতের ব্যথা, তবু থাকে। মন্দির, কাছারিবাড়ি, দেউড়ি, পুলিশ পাহারা—সব পেরিয়ে সন্ধ্যারতির শব্দ কোন দূর আকাশে মিশে যায়। সকালেও তাই।

আরতি করেন সুকুমারবাবু। সুকুমার মুখোপাধ্যায়। কুলীন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। তিনিই প্রধান পুরোহিত। আরও আছেন দু'জন। প্রদীপ, চামর, জলশঙ্খ—আরতির জিনিসগুলো পরপর দেখতে পাচ্ছে বনোয়ারিজিউ।

তারপরই সেই শব্দ, আলো, ছবি মুছে গিয়ে মেহগনির পালঙ্কে ঘুমনো, স্বপ্ন দেখা কল্যাণীসাহেবার মুখখানা আবারও চাঁদের আলোয় একটা বরফের টুকরো হয়ে ভেসে উঠল বনোয়ারিজিউয়ের সামনে।

উঁচু, বড় খাট থেকে মেঝেয় নামতে জলচৌকি লাগে। পালঙ্কের চারকোণে লাগানো চারটে কাঠের সর্প-মিথুন। শঙ্খলাগা সাপ আর সাপিনী। পায়ায় সিংহের থাবা। নখ. পা আর মাথার কাছে অনেকটা উঁচু কাঠে সুন্দর খোদাইয়ের কাজ। ডিজাইন।

ও বনোয়ারিজিউ, আমাদের এগার একর জমি সিলিং হতে হতে তলানি পঁচিশ বিঘে। তার খানিকটা আবার দেবোত্তর। আমার তো দুই মেয়ে। ছেলে নেই। আমি চোখ বুজলে তোমার সেবা—

অন্ধকারে কালো কষ্টিপাথর হাসলে আলো ছড়ায়।

তুমি হাসছ ঠাকুর! একটু মন দিয়ে শোন—এখানে প্রতিবার ধান কাটা নিয়ে কী খুনোখুনি। লড়ালড়ি। পুলিশ, প্রশাসন, পার্টি—সব তটস্থ। বড় জামাইয়ের মতিগতি ভালো না। খালি সম্পত্তি বিক্রির তাল।

জানি তো।

জানি বলছ? বিহিত তো করছ না! অথচ তোমার কথা আমি সব শুনি। স্বপ্ন দিয়ে বললে, অষ্টসখিদের জন্যে রোজ সন্ধ্যারতির পরে বৈকালির প্রসাদ জলে দিতে। তোমার অষ্টসখি সেখানে মাছ হয়ে খেলছে। তোমার নিত্যসেবার ব্যবস্থা, তাতেও তো কোনো ত্রুটি রাখিনি ঠাকুর।

অল্প দূরে কিশোরীসাগরে জলের গভীর থেকে যেন কী ঘাই দিল। ল্যাজের ঝাপটায় জল কাটার শব্দ শুনতে পেল বনোয়ারিজিউ।

তা হলে কি অষ্টসখিরা আমায় ডাকছে! ভেবে হাতের বাঁশি ঠোঁটের কাছে তুলে আনল বনোয়ারিজিউ।

কত্তার বাবার বাবা—মানে আমার শ্বশুরমশাইয়ের বাবার আমলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ,

রঙপুর, দিনাজপুরে আমাদের চার চারটে মহাল। তার টাকায় তোমার বারোমেসে সেবা। ঝুলন রাস দোল। ফুলের দোলায় করে তুমি যাচ্ছ। ফুলের দোলনায় ঝুলছ। পাশে রাধারানি। এই তো বর্ধমান শেষ হল সোনারুন্দিতে। তারপর মুর্শিদাবাদ। আমাদের বনোয়ারিবাদও মুর্শিদাবাদে। এখান থেকে সালার চলে যাওয়া যাবে। আরও দূরে কোথাও।

কিশোরীসাগরে আবারও প্রাচীন কোনো মাছ ঘাই দিল। সেই শব্দ দেউড়ি, কাছারিবাড়ি, শিবমন্দিরের চূড়ো, সিংহদরজা ছুঁয়ে আবারও কিশোরীসাগরের জলেই ফিরে এল।

তুমি রানিমা, প্রাসাদে বৌরানি সেজে থাক কেন?

কে বললে সেজে থাকি?

এখানে তুমি নাকি কোনো পুরুষমানুষের মুখ দেখ না, আর কাটোয়াতে বাজার করার সময়—

ও কথা থাক বনোয়ারিজিউ—

কেন থাকবে কেন?

অস্ফুটে কী একটা বলে রানি পাশ ফিরল। তার গালের চাঁদমাখা ছোট ছায়া ডানা ঝাপটে মিশে গেল ওয়াড়ের টিয়াপাখির গায়ে।

তুমি আমার ইষ্ট। বংশের কুলদেবতা—তোমাকে আর—বলতে বলতে ঘুমের মধ্যেই চিৎ হল রানিসাহেবা। বুকের কাপড় হয়ত বা সরল একটু। সেখানেও ছুঁয়ে গেল চাঁদ।

শেষ আশ্বিনের আকাশে কোথাও মেঘের ছায়াবাজি নেই। সময়ের সুতোয় সেলাই করা চাঁদ নিজে নিজে হেসে যাচ্ছে।

ও বনোয়ারিজিউ—

কী বলবে বল—

কী আর বলব!

তা হলে আমি চলে যাই।

না ঠাকুর, তুমি যেও না।

বাইরের বারান্দায় সার দেয়া পাখির খাঁচা। সেখানে এখন আর পাখি নেই। একটা বুড়ো চন্দনা ছিল বছর দুই আগে। সেও তো মরে গেল! ঘুমের মধ্যে এ সব মনে পড়ছিল না রানিসাহেবার। চাঁদের ফিকে আলো এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল খাঁচার লোহার জালে। মেঝেয়।

একটিও পাখি নেই, কত দিন হয়ে গেল। শুধু খাঁচা আছে। খাঁচার জাল। জালের ছেঁড়া ফোকরের ভেতর দিয়ে হুটপাট করে দৌড়ে যায় ধেড়ে ইঁদুর। নেংটি।

দূরে কুকুর ডাকল। শাদা প্যাঁচাটি ছোট উড়ানে শিবমন্দিরের চুড়ো থেকে পৌঁছে গেল রাজবাড়ির ছাদের কার্নিশে।

মন্দিরের ভেতর রেড়ির তেলের ছায়াল আলোয় ঘুমের মধ্যে পা ঠুকল রাধারানি। 'বিগ্রহ হলে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে হয়, বিগ্রহ হলে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে হয়'—বলতে বলতে মন্দিরের ভেতর অন্ধকার ভাঙছিল একা একটা চামচিকে।

ও ঠাকুর, আমার ইস্কুলেও বড় গোলমাল। পার্টিবাজি।

জানি তো। পছন্দকুমারের বাবার তৈরি ইস্কুল। সেখানেও দলাদলি ঢুকে গেল!

তুমি এর কোনো একটা বিহিত কর ঠাকুর।

কী করব বল তো! তোমাদের ইস্কুলের হলুদ দেয়ালে নিমাই+বীথিকা, বিমল+যূথী, বাণী + স্বপন, এই সব লেখা দেখে আমিও এক রাতে রাস্তা থেকে ইটের টুকরো তুলে বগা বগা করে লিখলাম—বনোয়ারি + ইন্দুরোখা, বনোয়ারি + বিশাখা, বনোয়ারী + ললিতা।

ও সে সব তোমার কাণ্ড! কী দুষ্টু তুমি!

আরে আবার দুষ্টুমি নিয়ে তো তোমাদের কত গান, গল্প, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল। ননীচোরা, মাখনচোরা উপমা। নটখট কৃষ্ণাকানহাইয়া—সেও তো হয়েছে গানে। ওসব তো তোমাদের জানা।

তুমি তো দেয়ালে ওইসব আঁশকথা পাঁশকথা লিখে খালাস। আর এদিকে আমি মরি নিজের জ্বালায়।

কেন কী হল আবার?

ইস্কুল কমিটি জরুরি মিটিং ডাকল। বনোয়ারি কে? ললিতা, বিশাখা, ইন্দুরেখাই বা কারা?

সবাই ভুলে মেরে দিয়েছে আমার কথা। তাই না! অথচ দ্যাখো, এখনও সন্ধ্যে সকাল আরতির ঘণ্টা বাজছে। ভোগরাগ হয়। সন্ধ্যেআরতির পর প্রসাদ যায় কিশোরীসাগরের জলে। তার ভেতরই অ্যাত ভুল!

আমি তো ভেবেছিলাম এসব করা পার্টি করা নাস্তিক ছেলের কাণ্ড। কিংবা পাগল-টাগল হবে কেই! হাতের লেখা প্র্যাকটিস করেছে দেয়ালে। নেহাতই খেয়ালে। নয়ত রস করা।

তাই আমিও নিজেকে নিয়েই নিজে রস করলাম।

চাঁদের আলো আলগা ঢেউ হয়ে আবারও এসে পড়ল রানির গালে। পাখির খাঁচার জালে। আশপাশে। জ্যোৎস্নামাখা জালের ছায়ায় ছায়ায় খাঁচার সিমেন্ট করা মেঝেতে জলছাপের নকশা।

শেষরাতে চাঁদ গড়িয়ে যাচ্ছে পুবে। তার সেই গড়িয়ে যাওয়ার রেশ চারপাশে। দূরে দেউড়িতে ঢঙ ঢঙ ঢঙ করে রাত তিনটের ঘণ্টা বাজল। ঘাড় এদিক-ওদিক করা প্যাঁচা আবারও তার জায়গা বদলাল ডানা ঝাপটে। কিশোরীসাগরের দিঘিতে আবারও ঘাই দেয়ার শব্দ।

আমি যাই রানিসাহেবা। অষ্টসখিরা ডাকছে।

তুমি কি আর পার না অষ্টসখিদের ডেকে আনতে মন্দিরে?

তা আর হয়না রানি। রাধা পছন্দ করবে না। বলতে বলতে বনোয়ারিজিউ দেখতে পেল দেয়ালে টাঙানো পছন্দকুমারের অয়েলপেইন্টিংয়ে চোরা জ্যোৎস্নার আভাস। শাদা

পাগড়ি। শাদা শেরওয়ানি। শাদা চোস্ত। পায়ে সোনালি নাগরা। পাগড়ির মধ্যিখানে ঝকঝকে হিরে। ছবির হিরে পেরিয়ে ঠিক তখনই একটা ধাড়ি টিকটিকি বুকে হাঁটছিল। অন্ধকারে উড়ে বেড়ানো আরশোলা লক্ষ করে।

পছন্দকুমারের নাকের নিচে পাকানো গোঁফ। ঠোঁটে পাতলা হাসি।

আমার মন্দিরে, বেদির চারপাশেও আরশোলা আছে। মাকড়শা। আমি মাঝে মাঝে তাদের তাড়াই। কিন্তু দেড়-দু ফুটিয়া পাথরকে কে আর তেমন পাত্তা দেয়!

অন্ধকারে টিকটিকি বুক বাইছে। সেদিকে তাকিয়ে বনোয়ারিজিউ হাতের বাঁশিতে ফুঁ দিল। বাঁশির মিষ্টি সুর সামনের ভাঙা দেউড়ির থাম পেরিয়ে তেঁতুল গাছ ছুঁয়ে বাইরের দেউড়ির গায়ে আছড়ে পড়ল। আর তখনই সেই বাঁশি শুনে কিশোরীসাগরের জলের ভেতর নড়াচড়া শুরু করে দিল অষ্টসখি।

স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল রানি—কল্যাণীসাহেবা। পছন্দকুমারের তেল-ছবির ওপর বুকে হাঁটা ধাড়ি টিকটিকি অন্ধকারে ডেকে উঠল। আরশোলা ফসকে গেছে একটুর জন্য। আবার চেষ্টা করতে হবে। বিরক্ত টিকটিকি মুখ নিচু করল।

পুরনো সিঁড়ির ঠাণ্ডা উঠে আসছে বনোয়ারিজিউয়ের পায়ের তলা দিয়ে। তার পায়ের মলজোড়া বেজে উঠছে। বাজছে। ঝুন ঝুন। ঝুন। ঝুন ঝুন।

বিছানায় উঠে বসা রানি একটু আগের ভাঙা স্বপ্ন জোড়া দিতে দিতে ডাকল—সুরোর মা—ও সুরোর মা—সুরো।

পাশের ঘরে রানিমার সব সময়ের কাজের লোক সুরোর মা আর তার সুরো দুজনেই গভীর ঘুমে। শেষ রাতের হালকা হালকা শিশির গড়িয়ে পড়ছিল লোহার দেউড়ির গায়ে।

ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কিশোরী সাগরের পাড়ে পৌঁছে বনোযারিজিউ দেখতে পেল গোটা দিঘি জ্যোৎস্নার পানা হয়ে আছে। চাঁদের আলোগোলা সেই জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল বনোয়ারিজিউ।

আর তখনই গভীর জলতল থেকে আটটি মাছ ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে উঠে এল জলের ওপর। তাদের নাকের নথে চাঁদের আলো মিশে যাচ্ছে। রুপোলি আঁশে আকাশ-আলোর মায়া।

হলুদ, সবুজ, নীল, লাল—এরকম আরও কত রঙ—পর পর।

খুব ধীরে বাঁশি বাজাচ্ছে বনোয়ারিজিউ। কিশোরীসাগরের জলের ওপর নাকে নথ, মাথায় ঘোমটা দেয়া অষ্টসখির নাচ। ঘুরে ফিরে। ঘুরে ফিরে। নাচতে নাচতে, হাততালি দিতে দিতে তারা ফিস ফিস করে বলছিল, এই দিঘির মাছ মরলে গঙ্গার ধারে পুঁতে দেয়া হয়, কেউ খায় না। কেউ খায় না। বলতে বলতে তারা জলের ওপর নব-বৃন্দাবন ডেকে আনল।

মন্দিরের বেদিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাধারানি ঘুমের ভেতর বৃন্দাবনের ফুলদোলায় দোলার ছবি দেখতে দেখতে, স্বপ্নের আকাশে ফুটে থাকা চাঁদের দিকে তাকাল। অনেক চেষ্টা করেও শ্রীরাধিকার পাশে, দোলায় বসা বনোয়ারিজিউয়ের মুখ দেখতে পেল না।

নক্ষত্রের রাত

মান সিং, কোন মান সিং-এর কথা তুই বলছিস?

কেন, ভারতের ইতিহাসে মান সিংহ তো একজনই—বলে মেহগনির সাবেক কালো, ছ কোনা টেবিলে কাচের বেঁটে গ্লাস বেশ জোরেই নামিয়ে রাখল অমিতবিক্রম। পুরনো কাঠে কাচের বাহারি গ্লাস বসানোর 'ঠক' শব্দে উড়ে গেল একটা কানামাছি। যে অনেকক্ষণ ধরে নিজের গায়ের রঙ টেবিলের রঙে মিশিয়ে বসেছিল।

মুঘল ডায়নেস্টির বন্ধু, রাদার গ্রেট মোগল শাহেনশা আকবরের খুব কাছের লোক, অম্বর রাজ ভগবানদাসের ছেলে, রাজপুত বীর রাণাপ্রতাপকে যুদ্ধে হারানো মান সিংহ। বাংলার বাগী বারো ভুঁইয়াদের শায়েস্তা করতে কোন দিল্লি থেকে এসে এই ইছামতি পেরিয়ে এপারে, শ্রীপুর, নাকি আরও কোথাও কোথাও চলে গিয়েছিল। সঙ্গে রেগুলার মুঘল আর্মি। শাহি ফৌজ।

আমারটায় আর একটু জল দে। কড়া হয়ে গিয়েছে।

শুধু জল না সোডা? বলতে বলতে অমিতবিক্রম সরকার সুখরঞ্জন সেনশর্মার দিকে তাকাল। এখনও কেমন পাতলা রেখেছে নিজেকে। মাথা ভর্তি থাক থাক চুল। সেখানে কাঁচায়-পাকায় দাবার ছক। টেনে পিছনদিকে আঁচড়ানো। সাতষট্টি পেরোনোর পরও দিব্যি ধারালো নাক, চিবুক। চিবুকের মধ্যে আশ্চর্য টোল। চোখে সরু ফ্রেমের সোনালি চশমা। এখন অবশ্য চশমা খুলে রাখা টেবিলে। তাতেই দু চোখ কেমন যেন আরও বিষাদ-গম্ভীর। কোমরে গালে বাড়তি চর্বি নেই।

তোকে জল বা সোডা দিয়ে কী হবে? তুই তো খাবি না ডাক্তার। গেলাস ধরে থাকবি। কথা বলবি কম। চুপ করে আমাদেরটাই শুনবি। আমাদের যেমন বলাটাই প্রফেশন তোর তেমনি শোনার। বলে অমিতবিক্রম সরকার দিব্যজ্যোতি সরখেলের দিকে তাকাল। ভারী গাল। আমারই মতো অনেকটা। ডাবল কেন, ট্রিপল চিন্‌ও বলা যায়। আমার অবশ্য চিন্‌ অতটা ঝোলেনি। জেলা শহরের নামকরা ব্যারিস্টার। মাথায় বিশাল টাক। ফরসা সেই টাকে দু-তিন পেগ ডি এস নেয়ার পরই ঘামের কুয়াশা। ঘাড়ের কাছে দু-চার গাছি যা আছে, তা যত্নে ছাঁটা। চওড়া মোটা জুলপি আছে গালে। সেটা কালো, মানে রঙ করা। আমি যেমন মাথা রঙ করাই। পঞ্চাশ পেরোনোর অনেক আগে থেকেই মাথায় কলপ। পাড়ার সেলুন থেকে লোক এসে করে দিয়ে যায়, সাতাশ-আঠাশ দিন অন্তর।

বাবা প্র্যাকটিস করতেন, ক্রিমিনাল সাইড। ঠাকুর্দা আনডিভাইডেড বেঙ্গলের মোক্তার। তিনি যশোর থেকে এপারে চলে আসেন। এপার-ওপার দুপারেই তখন আমাদের বাড়ি। ঠাকুরদা হরিনারায়ণের তখন খুব পশার। নামডাক।

আমাদের এই তিনজনের টেবিলে পিটার স্কট, ডাইরেক্টরস স্পেশাল, যাই খাই না কেন, কোনো দিন ঠাকুরদা হরিনারায়ণ সরকার এসে বসেন। কোনো কোনো দিন বাবা দেবনারায়ণ। ঠাকুরদা, বাবা দুজনেই ভালো খেতেন। মনে আছে, বাড়িতে চাকর রাধেশ্যামকে দিয়ে মাথা কালো করাতেন ঠাকুরদা। ভুরু, গোঁফ—সেখানেও কালো লাগাতেন। একবার

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি গোঁফ, চুল, ভুরু—এসব রঙ করান কেন?

শীতের দিন। ছুটির সকাল। সম্ভবত রবিবারই হবে। কোর্ট বন্ধ। সব পর পর মনে পড়ে যাচ্ছে অমিতবিক্রমের। হরিনারায়ণ সরকারের খালি গা। একটা আট হাতি ধুতি পরা। গায়ে একটা নাপতে-চাদর জড়ানো। সেই চাদরে, ধুতিতে কলপের দাগ। আমার তখন বছর বারো-তেরো, আজ থেকে চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর আগে, তখনও দেশভাগ হয়নি। আমার কথা শুনে ঠাকুরদা বলেছিলেন, কেন রঙ করি জান চুল, গোঁফ, ভুরু! না হলে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়ালে বেরযো কাঠ লাগে। একটু থেমে রাধেশ্যামকে কী একটা বলে আবার বলেছিলেন হরিনারায়ণ, এসব তুমি এখন বুঝবে না বাপু। বুড়ো হও। চুল-দাড়ি পাকুক, তখন বুঝবে। তখন বুঝবে বুড়ো হওয়ার মতো খারাপ কিছু নেই। এখন সব বোঝাতে গেলেও তুমি বুঝতে পারবে না।

ঠাকুরদা মারা গেলেন দেশভাগের কিছু পরে। আশি হয়েছিল ওঁর, কী একটু বেশি। আমার জন্ম ১৯৩২। বাবা জন্মেছেন ১৯০৮। আমি বাবার দ্বিতীয় সন্তান। ঠাকুরদার জন্ম ১৮৭৪। বাবা তাঁর একটু বেশি বয়সের সন্তান। ১৯৫৬-৫৭ সালে মারা গেলেন হরিনারায়ণ সরকার। বাবা তাঁর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি পুকুরে শ্রাদ্ধ শেষে বৃষকাঠটি পুঁততে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার অন্য ভাইয়েরা। কাকা-জ্যাঠার ছেলেরা। এ কাজে নাতিদেরই অধিকার। একটি কাঠের বড় দণ্ড, তাতে কি মানুষের মুখ? কেমন মুখ ছিল সেটি? নাকি কাঠের বৃষ একটি? চার পা। শিঙ। সব মনে পড়ে না এখন। বৃষকাঠ ছুতোরকে দিয়ে তৈরি করান হয়েছিল। তখন এসব কাজের লোক পাওয়া যেত। কারিগর ছিল বৃষকাঠের। এখনও কি পাওয়া যায়?

আগের রাতে একটি কমবয়সি ষাঁড় নিয়ে আসতে হয়েছিল গোয়ালাদের কাছ থেকে। বৃষোৎসর্গের ষাঁড়। সব পর পর কেমন ছবি হয়ে ভেসে ভেসে আসে অমিতবিক্রমের সামনে।

আজকাল নিট খেতে বেশ ভালো লাগে, জানিস দিব্য।

খাস না, মরবি। টক করে মরে যাবি। সেই যে হাইকোর্ট বার লাইব্রেরিতে যেমন সুজয়টা পড়ল আর মরল। বছর পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে। তারও কোল্ড সোয়েট। ঠাণ্ডা ঘাম। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। নিট খাওয়ার ফল। সান ডাউনের আগেও খেত। ভর দুপুরে।

কোল্ড সোয়েট—ঠাণ্ডা ঘাম, সে তো আমারও একবার হয়েছিল, সুখরঞ্জন জানে। জিভের নীচে আধখানা সরবিটেট দিয়ে কোনোরকমে ওকে ফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারসাহেব এসে হাজির। প্রেসার দেখল। নীচেরটা অনেক বেশি। একশো দশ। জেনারেলি আমার নব্বই থাকে। ওপরেরটা একশো আশি। সঙ্গে পোর্টেবল ই সি জি মেশিনও এনেছিল। ই সি জি হয়ে গেল। তারপর রেফার করল কলকাতার একজন কার্ডিওলজিস্টকে। খুব নামকরা। বলল, অন্তত দিন সাতেক বেড রেস্ট। হালকা খাবার। কোর্টে বেরনো বন্ধ।

টেবিলে রাখা গেলাস হাতে ছুঁয়ে ঘাড় সমেত ভারী মাথা খানিকটা ঝুঁকিয়ে চেয়ারে বসা অমিতবিক্রম নিজের মনের ভিতর অনেক রঙের নানা সুতোর টুকরো জট ছাড়িয়ে আলাদা

আলাদা রাখতে চাইল।

এই শেষ পৌষে ইছামতির ধার ঘেঁষা এই শহরে শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমেছে। দোতলার ঘরের ভেতর গ্লাসে টলটলে পিটার স্কট। কিছু শশা কুচি, পমফ্রেট মাছ ভাজা। শুকনো খোলায় ভাজা খোসা ছাড়ানো বাদামও আছে কাচের ডিশে। যার যা পছন্দ।

কী যেন বলছিলি মান সিং—

সুখরঞ্জনের কথায় একটা হারানো সুতো যেন অনেকক্ষণ বাদে কুড়িয়ে পেল অমিতবিক্রম। —ইয়েস, ও হ্যাঁ মান সিংহ—শাহানশাহ, জালালুদ্দিন আকবরের সুদক্ষ সেনাপতি, হাজারি মনসবদার, বোম্বাই—ধ্যুস ভুলে গিয়েছি, এখন তো আবার বোম্বাই বলা যাবে না, মুম্বাই—সেই সিনেমায় আকবরকে 'মহাবলী' বলে ডাকা রাজপুত মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে বসলেন ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। বাবা ভগবান দাস মারা গিয়েছেন, সিংহাসনে তো বসতেই হবে। এর চব্বিশ বছর পর—১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে মান সিংহ মারা যান।

একজন বাঘা ক্রিমিনাল ল'য়ার হয়ে ইতিহাসের এত সব সাল, তারিখ, নাম কী করে মনে রাখিস?

যেমন করে তুই একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান, মেডিসিনের খুব নাম করা প্র্যাকটিশনার হয়ে কোন সালে, কবে রাজ কাপুর, মধুবালা, নার্গিস, মীনাকুমারী, দিলীপকুমার, নিম্মি, সুরাইয়া, দেবানন্দদের সিনেমা রিলিজ করেছে তার খুঁটিনাটি সব মনে রাখিস। ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, কানন দেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছায়াদেবী, সন্ধ্যারানী, সায়গল, মেনকা, যমুনা দেবী, মলিনা দেবী—এঁদেরও অভিনয় জীবনের নানা ঘটনা সাল তারিখ তোর মনে থাকে কী করে? এসব বলতে বলতেই অমিতবিক্রম দেখতে পেল তাদের টেবিলের সামনে ফাঁকা চেয়ারে এসে বসেছে অম্বর রাজ মোগল সেনাপতি মান সিংহ। পাশে ঠাকুরদা হরিনারায়ণ সরকার। মান সিংহ কোনো কথা বলছে না। হরিনারায়ণ সরকার তার বাঁধানো দাঁতের পাটি বসানো মুখের ভিতর থেকে একটু খসখসে আওয়াজ তুলে বলল, দিন দশেক আগে যে মামলাটা তুমি করলে বাপু, তার সওয়ালটা ঠিক হয়নি। সাক্ষীদের ক্রস এগজামিনেশনে আরও মন দেয়া উচিত। ডাকাতির মামলা। আই পি সি-র ৩৮০ ধারা। টি আই প্যারেডে দুজন সাক্ষী তোমার মক্কেলকে চিনে ফেলেছে। কেস গুরুচরণ। একেবারে কেলোয়াঙ্কারি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কেলেঙ্কারি নয়, কেলোয়াঙ্কারিই হবে। তুমি জেরাটা ঠিক করে করো। ঠিক করে কোয়েশ্চেন করো। জেরা ঠিক হচ্ছে না। সেশানস বলে কথা। আসামী জামিন পায়নি। তাকে জেল কাস্টডিতে নিয়ে গিয়েছে। ডান হাত নাকি বাঁ হাত—কোন হাত দিয়ে তোমার ক্লায়েন্ট হার ছিনিয়েছিল সাক্ষীর! বারবার জিজ্ঞেস কর। মামলাটা অত সোজা নয়। এরকম হতে থাকলে তোমার নাম খারাপ হবে। পসার কমবে।

আপনি এখন যান ঠাকুরদা। এ বাড়ির পেছন দিকে যে সিঁড়ি আছে, সেখানে আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে। যেমন হয়।

ওখানে তো সেই ব্যাটা মান সিং বসে থাকে। আবার কখনও কখনও সেই মেয়েটা গো—সুলতানা রাজিয়া, ইলতুৎমিসের মেয়ে।

আমার মেয়েটাও তো একেবারে বিগড়ে গেল।

কেন কী হয়েছে তার ? এখন তা ভালো প্র্যাকটিস করছে। কোর্টে বেরয় নিয়ম করে। বেশ ভালো মামলা করে। নাম হয়েছে। তোমার মতো মারুতি ভ্যান নয়, নিজে টাটাসুমো কিনেছে। বেশ বড়ো গাড়ি। নিজেই চালায়।

তাতে কী হল ? ডিভোর্স হয়ে গেল তো।

তোমার একটিই সন্তান। তাকে যেভাবে মানুষ করেছ, বড় করেছ, স্বাধীনচেতা, একরোখা, জেদি। যাকে সাদা বাংলায় বলে কিনা বেশ গোঁয়ারও। তার ফল তো পাবেই।

একটা—একমাত্র সন্তান হবে কেন ঠাকুরদা! আপনাদের বউমা তো আরও দুবার কনসিভ করেছিল। পেটে বাচ্চা থাকেনি। নিজের মনে মনে এতসব বিড় বিড় করে বলতে বলতে মাথা আরও যেন খানিকটা সামনে ঝুঁকে এল অমিতবিক্রমের। দু-ঠোঁট সামান্য নাড়িয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে উঠল অমিতবিক্রম সরকার —মিসক্যারেজ! মিসক্যারেজ! একবার তো জীবনসংশয়ই হয়েছিল ছবির।

ছবি, মানে আমাদের নাতবউয়ের। যার গলা টিপে ধরেছিলে তুমি একদিন!

আপনি জানলেন কী করে ?

সব জানি আমি।

হরিনারায়ণের গোল গোল চশমার কাচের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল অমিতবিক্রমের। ১৮৭৪-এর এপাশে-ওপাশে জন্মানো হরিনারায়ণ সরকারের গা ঘেঁষে বসে অম্বরের রাজা, মোগল সেনাপতি মান সিংহ। তার মাথার পাগড়িতে বেশ ঝকমকে পাথর একখানা। সেদিকে তাকিয়েও চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

কি বিড়বিড় করছিস! আউট হয়ে গেলি নাকি ?

কে বলল একথা! মাথা সামান্য নাড়িয়ে ঝাড়কাড়া দিয়ে উঠল অমিতবিক্রম। তার সামনে মেহগনির টেবিলে কাচের গেলাসে পিটার স্কটের টলটলে তলানি। সুখরঞ্জনের হাতে সেই একবার ভরা গেলাস। বাইরে শেষ পৌষের গা কেটে বসে যাওয়া চাবুক চাবুক বাতাস নিজের মতো বয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, আমরা একসঙ্গে বসে খাই কেন বল তো!

দিব্যজ্যোতির এই কথাটি শুনে সোজা তাকাল অমিতবিক্রম।

তারপর একটু জড়িয়ে ভারী গলায় বলল, একা একা মদ খেতে ভালো লাগে না। একা একা বসে মদ খাওয়া আর খুন করা—দুটোই বোধহয় সমান। আসলে খেলে খানিকটা আহ্লাদ হয় বোধহয়। কিছুক্ষণ খাওয়ার পর মাথার ভেতর বড় একখানা জল ভরা মেঘ একটু একটু করে গলতে গলতে হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় টপটপিয়ে পড়ে। সেই বৃষ্টির ফোঁটার ঘা টের পাই মাথার ভেতর। চনমন করে ওঠে গোটা শরীর। বুকের ভেতর, রক্তে তখন একসঙ্গে দৌড়য় দশটা ঘোড়া। মাথার ভেতর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনি। ঘোড়া দৌড়য়। দৌড়য়। আসলে তাও হয়ত নয় — কী জানিস দিব্য, রোজ রাতে, ঠিক রাত নয়, সন্ধ্যে নেমে এসেই সব কীরকম যেন মরে যেতে থাকে। এই বাড়িটা—এই বিশাল বাড়ি—যা আমার বাবা দেবনারায়ণ ঘোষ করে গিয়েছেন, মনে হয় নার্সিংহোম। কিংবা একটা পুরনো, মাস্তুলভাঙা আধডোবা জাহাজ। চারপাশে কেউ বেঁচে নেই। এমন কি আকাশের চাঁদ,

নক্ষত্ররাও মরে গিয়েছে। মরে গিয়েছে বহু বছর আগে। গোটা টাকি শহরটাই মরে গিয়েছে। চারপাশে কেউ বেঁচে নেই। কোনো বন্ধু নেই। স্বজন নেই। গান, পাখির ডাক—কিছুই নেই। শুধু এই বাড়ির পিছনদিকে যে অন্ধকার চোরাই সিঁড়ি, সেখানে পেঁয়াজের খোসা বা আমসত্ত্বের পরত যেভাবে সরায় নয়ত খোলে, ঠিক সেইভাবে কেউ যদি অন্ধকারের মোড়ক খুলে ফেলে, তাহলে তার কোনো ভাঁজে ১৯০০ সালের হরিনারায়ণ সরকার, কোথাও ১২৩৬ থেকে ১২৪০—দিল্লির সিংহাসনে বসা সুলতানা রাজিয়া, কোথাও ১৫৯০-এ অম্বরের রাজা হয়ে ওঠা মান সিংহ।

কী বলছিস তুই অমিত? বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে। নাও স্টপ ফর দ্য ডে।

নাহ, বেশি খাইনি দিব্য। বেশি খাইনি। সবে চারটে হয়েছে। তার মধ্যে দুটো জল না দিয়ে। আর একটা পাতিয়ালা। আমার হিসেব ঠিক আছে। যতই খাই, আমি আসলে জে এম টি টি। জাতে মাতাল, তালে ঠিক।

নিজেই তো তুই বড় করে ঢাললি। বললি, একটা পাতিয়ালা পেগ বানাই।

হ্যাঁ ঢাললাম। বানালাম। আচ্ছা বলতে পারিস দিব্য, আমার বেঁচে থাকার মানে কী?

কেন, একজন সাকসেসফুল, ওয়েল ফেমড ল-ইয়ার।

ফেম্। ফুঃ। এই দ্যাখ না ফ্রোজেন শোলডারের একটা ব্যথা আছে। তা হবে বছর দশেক। সাত-আট বছর আগে যখন ভালো করে ব্যথা টের পেলাম, তখনই খুব বাড়াবাড়ি। একেবারে বাবারে-মারে বলে চিৎকার। কোনো পেনকিলারেই ব্যথা বাগ মানে না। সুখরঞ্জন বলল, পেনকিলার খাস না। টেপাটেপি করিস না। টেপাটেপি, মালিশ-মাসাজে উপকার তো হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়। তার চেয়ে যতটা সহ্য করতে পারিস, গরম জল ঢাল। সাময়িক হলেও খানিকটা কমবে, গরম জলে ব্লাড সার্কুলেশনটা হবে। আর রক্ত চলাচল ঠিক হলে ব্যথা-বিষ নেমে যায়। বড়জোর, সামান্য আয়োডেক্স বা ওরকম কিছু একটা দিয়ে অল্প অল্প রাব করা যেতে পারে। তখনও বাজারে 'মুভ' আসেনি। কিন্তু 'উইন্টোজিনো' আছে।

তোর ফ্রোজেন শোলডার আছে। কষ্ট আছে। আমারও রক্তে চিনি চর্বি—দুটোই বেশ বেশি। রক্তে হুইস্কির ফোঁটারা ঘোড়া ছোটালেও কেডস পায়ে রোজ সকালে হাঁটতে ভুলি না। হঠাৎ হাসতে গিয়ে আয়নায় নিজের ছায়া ভেসে উঠলে যদি সেদিকে চোখ পড়ে, মনে হয় টাকমাথা, চওড়া জুলপির একটা খুনি আয়নার কাচে দাঁড়িয়ে। কিংবা মনে হয়, হাসি তো নয়, কাউকে ভ্যাংচাচ্ছি। অনেকক্ষণ পেট খালি থাকলে চোয়াল আটকে যায়। কিন্তু কী করব, তবু আমি দিব্যজ্যোতি সরখেল। আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে।

তোর একটা সুবিধে আছে দিব্য। মস্ত সুবিধে। সেই সুবিধে আমাদের কারও নেই।

কী, কী সুবিধে?

তুই, বল না সুখরঞ্জন।

আমি জানি না। তুই বল।

কম খাও। হেলথ মেইনটেন কর। গ্ল্যামার ঠিক রাখ। বয়েস বাড়লেও তার ছায়া ফেলতে দাও না নিজের মুখে। গায়ে। আর তুমি জান না দিব্যর কী সুবিধে আমাদের

থেকে! নিশ্চয়ই জান। ডাক্তারসাহেব, তুমি বল। বল্ ব্যাটা। দিব্যর কীসের সুবিধে আমাদের থেকে!

বলছি তো, জানি না।

তাহলে আমি বলি?

হ্যাঁ, বল।

এক নম্বর পয়েন্ট—দিব্য বিয়ে করেনি। কনফার্মড ব্যাচেলার। শালা রাজা। দু নম্বর—এবার দু নম্বরটা বলি—কী বলেই ফেলি তা লে—

হ্যাঁ, বল।

দিব্য গান জানে। ভালো গানের গলা। মস্ত সম্পদ। সেটা সুখরঞ্জন, তোর আমার কারও নেই. শোনা না ভাই দিব্য—ওই যে দু কলি—প্রণয় পরম রতন/যতন করে রেখ তারে...প্রণয় পরম রতন...

ওঃ! চণ্ডীদাস মালের গলায় দারুণ রেকর্ড আছে। আমি অবশ্য ওঁর গলাতেও শুনেছি। অসাধারণ গায়কি।

গা-না ভাই, দু কলি—প্রণয় পরম রতন ... যতন করে রেখ তারে...

কী দরকার দিব্যকে দিয়ে গান করাবার! ও কি হরিমতি, মানিকমালা, গহরজান, মালকাজান, নাকি আঙুরবালা? কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালাও তো নয়। সন্ধ্যেটা নষ্ট কোরো না।

আপনি চুপ করুন তো। হরিনারায়ণ সরকারের চশমার গোল গোল ঝাপসা মতো কাচের দিকে তাকিয়ে ঝামটে উঠল অমিতবিক্রম। হরিনারায়ণের গা ঘেঁষে বসা রাজা মান সিং মেহগনির টেবিল বাজিয়ে তাল দিয়ে মাথা নাড়া শুরু করল দিব্যজ্যোতি সরখেলের গানের সঙ্গে সঙ্গে। প্রণয় পরম রতন ... যতন করে রেখ তারে ...।

বাইরে বোধহয় বৃষ্টি শুরু হল।

শীতের বৃষ্টি বেশ জ্বালায়। বৃষ্টির পর রোদ উঠলে ঠাণ্ডা আরও বাড়বে। উঠোনের বড় হাতার ভেতর মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু, কুরচি, কাঠগোলাপ, স্বর্ণচাঁপা অকাল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভূত হয়ে গেল।

ভাই, তোমার উঠোনটা বড় নিচু। জল দাঁড়িয়ে যাবে, একটু বেশি বৃষ্টি হলে। গাড়ি বার করতে অসুবিধে হবে।

হবে তো হবে। থেকে যাবি। দিব্য তো ব্যাচেলার। সুখরঞ্জন, তুই কি এখনও বউয়ের পাশে শুস?

না। সে তো বছর কুড়ি হল চুকেবুকে গেছে।

তোর ছেলে-মেয়েরাও তো বাইরে বাইরে।

না ছোট ছেলেটা এখনও আমার কাছে থাকে। বড় দুজন আলাদা। একটাই মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সবই তো জানিস।

ছোটর এখনও পাখা গজায়নি, তাই আছে। ডানা গজালেই উড়ে যাবে।

প্রণয় পরম রতন ... যতন করে রেখ তারে ...

আমি ছবির সঙ্গে এক বিছানায় শুই না ঊনত্রিশ বছর। গলা টিপে ধরেছিলাম একদিন। মেরেই ফেলতাম। নেহাত রাখি এসে গেল বলে তাই। চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল। তখন রাখি সাত-আট। তারপর থেকে আর এক বিছানায় শুইনি। তারপর তো মরেই গেল। সুইসাইড। সঙ্গে সুইসাইডাল নোট—'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ি নয়।' সেও তো পঁচিশ বছর হয়ে গেল। নাইনটিন সেভেনটি ফাইভ—ইমারজেন্সির বছর।

সত্যিই কেহ দায়ি নয়?

কে বললে কথাটা! নিজের ভেতরই এটুকু চিবিয়ে ফেলে অমিতবিক্রম দেখতে পেল বাঁধান দাঁত সামান্য মেলে দিযে টিপি টিপি হাসছে হরিনারায়ণ সরকার।

প্রণয় পরম রতন ... যতন করে রেখ তারে ...

ফ্রোজেন শোলডারের জন্য বাঁ হাতে, কাঁধে ব্যথা। কানের নীচে হাত দিয়ে ডান কাতে শুলে আরাম পাই। হট ব্যাগ, হট ওয়াটার বটল দিয়ে এখন আর তেমন আরাম হয না। ভাবছি এবার ম্যাগনেট বেল্ট লাগাব। বেল্টে চুম্বক ফিট করা। তাতে নাকি রিলিফ হয়। সেরেও যায় কখনও কখনও। কাগজে, টিভি-তে বিজ্ঞাপন দেখি।

রাখি এখন এই বাড়িতেই থাকে?

হ্যাঁ। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের ডিভোর্সি। ইস্যু নেই কোনো। বেশ খানিকটা খিটখিটে, খুব মেজাজ। এক বগ্‌গা। বিয়ের এক বছরের ভেতর প্রথম কনসিভ করল। কিন্তু রাখল না। নিজেরা কিছুদিন ঝাড়া হাত-পা থাকবে বলে অ্যাবরট করল। তারপর আর কিছু হয়নি।

যাই বল, আমার নাতির ঘরে পুত্‌নি কিন্তু প্র্যাকটিসে খুব নাম করেছে। বেশ পসার। তোমার মতো ভুলভাল জেরা করে না। মামলার মেরিট দেখে ব্রিফ নেয়।

আপনি এখান থেকে যাবেন? সেই থেকে আমার মুড স্পয়েল করছেন।

তোর মেয়ে—মানে আমাদের রাখির ক বছর হল ডিভোর্স হয়েছে?

বারো বছর। সেপারেশনের পর মেয়েটা কারও সঙ্গে সেটলও করল না। এত বড় বাড়ি। প্রপার্টি। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া খানিকটা জমি। বড় পুকুর। আমারও তো বয়স হচ্ছে। তার ওপর ঠাণ্ডা-ঘাম!

দিব্যজ্যোতির গান কখন যেন থেমে গেছে। বাইরে এখন আর বৃষ্টি নেই। দম দেয়া বড় দেয়াল ঘড়িতে ঢঙ করে সাড়ে নটা বাজল।

আমরা তাহলে উঠি।

এখনই উঠবি?

হ্যাঁ, রাত হল। কাল আবার বেরন আছে।

কোর্ট তো দশটায়। ডিসপেনসারি—সরি, এখন তো ডিসপেনসারি নয়, চেম্বার—সেটা কটায়?

আটটায়।

বোস না আর একটু। খাই। মাছ ভাজিয়ে আনি। নতুন মদ। ধর, সবাই মিলে একসঙ্গে যদি. হারিয়ে যাই। খেতে খেতে খেতে—আর না ফিরি—

কী আবোল-তাবোল বকছিস অমিত! রাখি ফিরেছে?

নিশ্চয়ই ফিরেছে। সেও তো নিজের ঘরে সন্ধ্যের পর ড্রিংকস নিয়ে বসে। একা একাই খায়। এটুকু বলে অমিত চুপ করে থাকে। তার চোখ নিয়ে জল গড়ায়। জিভ ভারী হয়ে এলিয়ে আসে।

তোর নেশা হয়ে গেছে অমিত।

আমার! নেশা! এখনও ছ-সাতটা খেতে পারি। খেয়ে তোদের বাড়ি পৌঁছে দেব। ফকির, ফকির—ফ্রিজ খুলে মাছ বার কর। ভাজ। বরফ দে। আজ মোচ্ছব হবে। দিব্য আবার গান গাইবে।—অনুগতজনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা...।

আজ আর গান নয়। আবার একদিন হবে। আজ থাক।

না। আজই হবে। আজই।

কেন বাড়াবাড়ি করছ বাপু! যেতে দাও না ওদের। তারপর তোমায় আমি সওয়াল করা শেখাব। কীভাবে মামলার মুখটা ধরতে হয়।

আপনি থামবেন?

নাতির দাবড়ানি খেয়ে হরিনারায়ণ সরকার চুপ হয়ে গেল।

তোর মনে আছে দিব্য, গেল বছর এই রকমই শীতে আমরা সারা রাত ইছামতির ধারে গেস্ট হাউস ভাড়া করে রইলাম। সামনে ইছামতি। ওপারেই আমাদের যশোর খুলনা। মাথার ওপর ঠ্যাঙ ছড়ানো কালপুরুষ। ধ্রুবতারা। লুব্ধক। চাদর গায়ে হুইস্কির গেলাস নিয়ে দোতলার ঘর থেকে তিন জন একতলায় নেমে এলাম। নিশুতি রাত। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

ইছামতির দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যে থেকেই কেমন কান্না পাচ্ছে আমার। হরিনারায়ণ সরকার দেবনারায়ণ সরকারদের তো দেখতেই পাচ্ছি। হরিনারায়ণের বাবা সারদাচরণ, তাঁর বাবা অন্নদাচরণ—সবাই এসে নদীর ওপারে বালির ওপর দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের হাতে লণ্ঠন। ঐ তো মেজো কাকা সত্যনারায়ণ সাইকেল চালিয়ে শীতের নতুন গুড় নিয়ে আসছেন এপারে। তিনি হোমিয়োপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন ওপারে—আমাদের ভিটেয়। শীতে সেই বাড়ির পাশের বিলে বালিহাঁস নামে। সেই বালিহাঁস বন্দুকের ছররায় মেরে বাঁ হাতে ঘাড়ভাঙা পাখি ঝুলিয়ে ডান হাতে বন্দুক নিয়ে ফিরছেন সত্যনারায়ণ। তাঁর পায়ে ফিতে বাঁধা লাল কাপড়ের কেডস। খাকি হাফ প্যান্ট। ঐ রঙেরই হাফ শার্ট। মাথায় শোলার হ্যাট।

উঠোনে কাঠ জ্বেলে রান্না হবে শিকার করা বালিহাঁসের মাংস।

নদীর ওপর পা মেলা কালপুরুষের আবছা আলোয় বড় পিসিমাকে দেখি যমপুকুর ব্রত করছেন। উঠোনে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা পুকুরের চারপাশে পিটুলির আলপনা। দক্ষিণ ঘাটে মাটির তৈরি যমরাজা-যমরানি। উত্তর ঘাটে মেছো-মেছোনি। পুব ঘাটে ধোপা-ধোপানি। পশ্চিম ঘাটে কাক চিল—সবই মাটি দিয়ে তৈরি। হাতে হাতে বানাত পিসিমারা। বড় পিসিমা, ছোট পিসিমা। যমপুকুরের পশ্চিম ঘাটে হাঙর-কুমিরও থাকত।

উঠোন খুঁড়ে তৈরি করা পুকুর জলে ভরে দিত পিসিমারা। সেই ব্রতের পুকুর পাড়ে পাড়ে হলুদ আর কচু গাছ। জলে ভেসে থাকে সুষনি-কলমি-হিঞ্চের ঝাড়।

পিসিমা ছড়া কাটত। কী ছড়া, এখন আর অত মনে নেই। তবে তারা বলত, বাপ-ভাই, বাপের কুলের সবাই সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক। তাদের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

পিসিদের তৈরি করা যমপুকুর ব্রতের পুকুরে হঠাৎই ছবির কাটামুণ্ডু ভেসে যেতে দেখে অমিতবিক্রম। মাটির মুণ্ডু যেমন গলে মিশে যায় জলে, ছবির মুণ্ডুও তেমন হল।

বড় খুকি এই ব্রত উদ্‌যাপনের সময় বড় খোকাকে কড়ি দিত। এক কাহন কড়ি।

আপনি চুপ করবেন। আস্তে করে হরিনারায়ণ সরকারকে দাবড়ানি দিল অমিতবিক্রম।

সওয়াল করার সময় ঠিক মতো পার না, ডাকাতির আসামীর জামিন করাতে দম বেরিয়ে যায়। সেশনস চলার সময় তোমার মক্কেলকে থাকতে হয় জেলে কাস্টডিতে আর যত ধমক আমার বেলায়!

হরিনারায়ণ সরকারের এসব কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিল অমিত। তারপর বলল, ওপার থেকে যমপুকুরের জল ইছামতি পেরিয়ে ছিটকে এসে লাগছে আমার গায়ে। আমার বড় জ্যাঠামশাই, ছোটো ঠাকুরদা—সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। বালিহাঁসের মাংস তারার আলোর নীচে ফুটে উঠছে। কাঠপোড়া আঁচের গন্ধ, সেদ্ধ হয়ে আসা মাংসের ঘ্রাণ, দূরে ইছামতির বয়ে যাওয়ারও হয়ত কোনো গন্ধ আছে—সব একসঙ্গে পাচ্ছি। আমি আর পারলাম না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে জল ছুঁলাম ইছামতির। তারার আলোয় তর্পণ করলাম—সাতপুরুষের। অজানা নক্ষত্রের আলোয় হাতের বালি, জল—সব জ্যান্ত হয়ে উঠল। তারা কথা বলছে। কথা বলছে কালপুরুষ।

ইছামতির পাড়ে যাওয়ার জন্য মালের গেলাস হাতে আমরা পর পর — তিনটে ধুমড়ো মদ্দ গেস্টহাউসের লোহার গেট টপকালাম। বাইরে, ভেতরে কুকুর ডাকছে। রাতে নাকি অঘোষিত কার্ফু থাকে ওখানে। খুব নাকি চোরাচালানদারদের উৎপাত। চাদর মুড়ি দেযা তিনজন পরপর ইছামতির পাড়ে। সুখরঞ্জন অবশ্য প্রথমটায় আসতে চাইছিল না। বলেছিল, দরকার কী, এত রাতে...

হাওয়ায় নতুন গুড়ের ফুটে ওঠা, বালিহাঁসের রান্না করা মাংসের গন্ধ বার বার কান্নার ঢেউ বয়ে আনছিল আমার চোখে। আকাশের গায়ে তারায় বোনা কুকুরসমেত তির-ধনুক হাতে শিকারিকে দেখে কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। যখন আমরা শিকার করতাম, গুহায় থাকতাম। দৌড়তাম বুনো শুয়োর, হরিণের পিছু পিছু। তারার আলোয় সব মনে পড়ে যায়।

সেদিন দুপুরেই খাওয়ার পর লঞ্চ নিয়ে আমরা ইছামতিতে ঘুরছিলাম। তুই বার বার জানতে চাইছিলি জনা বিশেক লোক দিয়ে এক মাস লঞ্চে ইছামতিতে ভেসে থাকার খরচ কত ?

হবে হয়ত। দুপুরে অনেকটা খেয়েছিলাম তো। তবে আমার তো প্রায়ই এরকম ভেসে যাওয়ার কথা মনে হয়। বলে অমিত মাথা ঝোঁকাল। আর তখনই বাইরে আবার বৃষ্টি এল জোরে। সঙ্গে সঙ্গে ইছামতি তার মুখ ঘুরিয়ে খাত পালটে এ বাড়ির হাতার ভেতর দৌড়ে ঢুকে পড়ল।

দেবনারায়ণ সরকাররের তৈরি দোতলা বাড়ি এখন দোতলা জাহাজ। তার মাথায় মাস্তুল। ঢেউয়ের দোলায়, ফুলে ওঠা জলের চাপে জাহাজ মাঝে মাঝেই এদিক-ওদিক হেলে যাচ্ছে।

এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা মোগল সেনাপতি মান সিংহ বলে উঠল, এই জাহাজে ফৌজ নিয়ে আমি কি শ্রীপুর পৌঁছতে পারব!

হরিনারায়ণ সরকার বলে উঠল, আ খেলে যা! নদীটা দেখি এখানে চলে এল।

সুখরঞ্জন, দিব্যজ্যোতি কোনো কথা না বলে চুপ।

খাওয়ার পর অনেকক্ষণ থেকেই তলপেটে চাপ দিচ্ছে। এখনই ভারমুক্ত হওয়া দরকার। এমন ভেবে নিয়ে একটু টলো পায়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল অমিতবিক্রম। আর তখনই প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় খানিকটা ছিটকে গিয়ে বাড়ির পেছন দিকে সেই অন্ধকার সিঁড়ির মুখে পৌঁছে গেল।

আমি এখানে এলাম কীভাবে? আমি তো কলঘরে যাব। এরকম ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একমাত্র সন্তানকে দেখতে পেল অমিত।

ঢিলে নাইটি পরা রাখি। হাতে গেলাস। মাথার চুল খুলে ছড়িয়ে রাখা পিঠের দু পাশে।

অমিত দেখতে পেল রাখি অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

ওখানে কোনো আলো নেই খুকু। বাড়িটা এখন—একটু আগে জাহাজ হয়ে গেছে। চারপাশে জল। ঢেউ। নদী।

রাখি কোনো জবাব দিল না।

খুকু, আমার কথা শোন। যাসনি। ওখানে সুলতানা রাজিয়া আছে।

খুকু যাবেই। ফিস ফিস করে বলে উঠল এবাড়ির দেয়াল।

কোথায় রাজিয়া! ইলতুৎমিসের মেয়ে। দাসবংশের সুলতান ইলতুৎমিস। ছেলে—অপদার্থ রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনে না বসিয়ে বাবা তো রাজিয়াকেই তখত-এ-তাউস-এ বসাতে চাইলেন। কিন্তু দিল্লির আমির-ওমরাহ্‌রা রাজিয়াকে মানতে চায়নি। পরে অপদার্থ সুলতানকে সরিয়ে তারা রাজিয়াকেই মসনদে বসাল।

এসব আমি শুনতে চাই না। আমার মেয়ে—একমাত্র সন্তান সিঁড়ির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। গোটা বাড়ি এখন জাহাজ হয়ে গেছে। চারপাশে জল। নদী। ঢেউ। বাইরে জোর বৃষ্টি। আমার খুকু হারিয়ে যাবে। তাকে আর পাব না। এই সিঁড়ির অন্ধকার ভয়ানক। ওখানে মিনহাজ-ই-সিরাজ থাকে। মিনহাজ নিজের মতো করে ইতিহাস লেখে। সুলতানা রাজিয়ার অনেক গুণ তার পছন্দ। কিন্তু একজন নারী কেন বসবে দিল্লির সিংহাসনে? তাইতে মিনহাজ-ই-সিরাজের ঘোর আপত্তি। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজিয়া সুলতানা হলে মিনহাজ পদত্যাগ করে। পাঞ্জাবের উচ শহরের মানুষ মিনহাজ দিল্লি, গোয়ালিয়রের কাজি। সুলতান নাসিরুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন বলবন সকলের কথা আছে মিনহাজের কেতাবে। দেবনারায়ণ সরকারের তৈরি করা দেয়াল ফিস ফিস করে, প্রায় কানে কানে বলে গেল এসব কথা।

এই বাংলায় দু বছর ছিল মিনহাজ। তার কাহিনীতেই উঠে এসেছে লক্ষ্মণ সেনের আমলে সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা দখলের গল্প। এ বাড়ির দেয়াল আবারও কথা বলে উঠল।

থাক, ওসব পণ্ডিতি কচকচি। কিছু শুনতে চাই না আমি। এ বাড়ি এখন জাহাজ। বাইরে বৃষ্টি। চারপাশে ঢেউ। খুকি এ সবকিছুই জানে না। সিঁড়ির অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে।

'খুকি'—নিজের সন্তানকে অন্ধকারে মুছে যেতে দেখে শেষবারের মতো চেঁচিয়ে উঠল অমিতবিক্রম সরকার।

বাড়ির পিছন দিকে সিঁড়ির হাঁ-মুখ তখনও একই রকম স্থির। শান্ত। ঠিক তখনই বড় ঢেউয়ের ধাক্কায়, জলের ছোবলে অমিতের চারপাশ, পায়ের নীচের মাটি আবারও কেঁপে উঠল।

কথাকার

এক কিলোতে কটা রসগোল্লা হবে ?

ছাব্বিশটা।

দাও—এক কিলো এক কিলো করে দুটো আলাদা জায়গায়—বলতে বলতে হাফিজুর আলম তার হাতা ভাঁজ করা সিল্কের পাঞ্জাবি মোড়া জাপানি হাতঘড়িতে সময় দেখল, পাঞ্জাবি সরিয়ে। এখনও বাংলাদেশেরই সময়, ইন্ডিয়া থেকে এক ঘণ্টা এগিয়ে। একটা পনের—তার মানে বারোটা পনের এই ইন্ডিয়ায়। ভাবতে ভাবতে হাফিজুর তার পাতলা হয়ে যাওয়া মাথার চুলে ডান হাত দিল। চওড়া হতে হতে, নদীর মুখে, সাগরে মেশার আগে বদ্বীপ যেমন হয়, এমন চওড়া কপালে ডান হাত রাখলে অনামিকার লাল পলাটি চোখে পড়ে।

কাটোয়া থেকে অ্যামবাসাডারে ড্রাইভার নিয়ে আমরা আটজন কীভাবে যে এলাম সারাটা রাস্তা ? সত্যি, এই এক আজব গাড়ি ইন্ডিয়ার অ্যামবাসাডার, কতজন যে ধরে ! বাংলাদেশে এরকম গাড়ি নেই।

নিগনচটিতে রাস্তার ওপর যে মিষ্টির দোকানটি, তার কোনো সাইন বোর্ড নেই। ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা। পাশাপাশি দুটো লম্বা কাঠের বেঞ্চ। তাদের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। লোহার কড়াইয়ে রসে ডোবা গরম রসগোল্লা।

বাইরে মে মাসের রোদ। একটু আগে খানিকটা মেঘ রোদ্দুর আড়াল দিয়েছিল। এখন আবার আকাশ ফাটিয়ে রোদের নেমে আসা। গরম বাড়ছিল। একটু আগে আমরা কৈচরের হাটে নেমেছিলাম, নিগন পৌঁছনর আগে—হাফিজুরের মনে পড়ল। তার আগে রাস্তায় পড়েছে বনকাপাসি, দুরমুট, শ্রীখণ্ড, গাঙ্গুলিডাঙা।

কাটোয়া থেকে বর্ধমান, কাটোয়া রোডে পড়তেই গাড়ি নেচে উঠল। দে দোল দোল। দে দোল দোল। বাঁদিকে কাটোয়া থেকে যে ছোট লাইনের ট্রেন ছাড়ে তার সরু লাইন। ডানদিকে ধানের খেত। রাস্তার পাশে বনসৃজন প্রকল্পের সার বাঁধা সুবাবুল, শিশু। এই ছোট লাইনের গাড়িতে কত চেপেছি, হাফিজুরের মনে পড়ল।

খুব গাছ লাগাচ্ছে পঞ্চায়েত, কিন্তু রাস্তার অবস্থা এরকম কেন—বলতে বলতে আকাশ দেখল হাফিজুর। এই তো কতদিন হয়ে গেল ইন্ডিয়া ছেড়ে। ১৯৬১-তে বাবা যবগ্রামে আমাদের বাড়ি বদল করলেন তখন ইস্ট পাকিস্তানের প্রপার্টির সঙ্গে। সাইদুল হোসেনরা ইন্ডিয়ায় চলে আসেন। আমরা ইস্ট পাকিস্তানে।

কই হল, আমার রসগোল্লা ? এটুকু বলেই হাফিজুর ফিরে এল নিগনচটির মিষ্টির দোকানে।

দিচ্ছি দাদা।

বেশ, এবার আমাদেরও রসগোল্লা দিন তো দুটো করে।

আমি মোণ্ডা খাব। বলতে বলতে রাজকুমার কাচের শো কেসে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রাখা সন্দেশ চেহারার মিষ্টির দিকে আঙুল দেখাল।

আমিও মোণ্ডা—সিরাজ আমেদ এটুকু বলে মিষ্টি-দোকানিকে বলল, ভাই জল হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে। জালার ভেতর থেকে মগ ডুবিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে ঢালল দোকানি।

পাঁচ বছর পর নিজের গ্রামে যাচ্ছি। গাড়িতে বসে বসে মনে পড়ছিল হাফিজুরের। এই তো মাস দুই আগে গ্রাম ঘুরে গেলেন বড়ভাই। তাঁর শরীর মোটে ভালো নেই। হার্টের প্রবলেম। আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। আমার বাষট্টি হল। আব্বাকে ইন্ডিয়া ছাড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বড়ভাইয়ের তাড়াই বেশি ছিল। আমি তো তখন যুবক। তবু কিছু বলতে পারিনি।

বাঃ, মোণ্ডা বেশ সুন্দর তো। সিরাজ মিষ্টিতে একটা কামড় দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে দেখতে এটুকু বলল। কাটোয়ার দিক থেকে আসা যাত্রী বোঝাই একটা উপুরচুপুর বাস ধীরে গড়িয়ে যেতে চাইছিল বর্ধমান স্টেশনের দিকে।

যাই বল, তোমাদের কৈচরের হাটটি কিন্তু মজার—সিরাজের দাঁতে-জিভে তখনও মোণ্ডার স্বাদ জড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ হাট তো এরকমই সিরাজ—বলে রাজকুমার তার হ্যান্ডলুমের নীল পাঞ্জাবির হাতায় নাকের নীচের ঘাম মুছল। তার পা চাপা শাদা আলিগড়িতে মিষ্টির দোকানের অন্ধকার পেটের ভেতর গড়িয়ে নামা রোদ কেমন করে যেন ছুঁইমুই খেলা খেলে যাচ্ছিল।

তোমাদের কত জমি ছিল রাজকুমার?

সে হবে কয়েক হাজার বিঘে। ওসব মনে করলে মন খারাপ হয় সিরাজ।

কিছুই নেই আর এখন?

যা আছে তলানি। কোনোরকমে কিছু ধান পাই। আমি আমার বউ আর ছেলে—চলে যায়।

মোণ্ডাটা কিন্তু বেশ ভালো। কিলো যেন কত করে বলল?

সাঁইত্রিশ টাকা, সিরাজ। সব কথা মন দিয়ে শোনো না কেন?

রসগোল্লার সঙ্গে একটু ঝোল বেশি করে দেবেন। ঝোল না দিলে কেমন শুকনো মনে হয়।

হাফিজুরদা রসকে 'ঝোল' বলছেন। রাজকুমার বুঝতে পারল। বাংলাদেশে কি রসকে ঝোল বলে?

আর একটা মোণ্ডা খাব রাজকুমার—বলে সিরাজ বাইরে-রোদের দিকে তাকাল। রাস্তা তেমন চওড়া নয়। সেখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বাস, অটো যাচ্ছে। গামছা জড়ানো মিষ্টি দোকানি তার থেকে খানিকটা কমবয়েসী একজনকে বলছিল, বাবুদের জল দে।

বেঞ্চের কালচে কাঠে কালো কালো মাছি। লোহার কড়াইয়ের ভেতর রসে হেসে হেসে ভাসা রসগোল্লাদের গায়ে দুপুরের চোরা রোদ এসে পড়েছে টালির চালের ফাঁক দিয়ে। দোকানের দেয়ালে নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার। এখনও একটিও পাতা ছেঁড়া হয়নি।

পলিপ্যাকে গুনে গুনে রসগোল্লা তুলছিল দোকানদার।

হাঁড়িতে দিন তো। রাজকুমার জল খাওয়া গ্লাস বেঞ্চে নামিয়ে বলে উঠল।

হাঁড়িতে কি সুবিধে হবে—হাফিজুর জানতে চাইল।

দেখতে ভালো। পলিপ্যাক মুড়ে হাঁড়িতে বসিয়ে দিলে গাড়িতে যেতে যেতে ভাঙার ভয় নেই।

বেশ তাই হোক—এটুকু বলে হাফিজুর আবার ঘড়ি দেখল।

মোণ্ডা খেয়ে সিরাজের মনে পড়ল কৈচরের হাটে সেই বিশাল বটগাছটি। তাকে বেড় দিয়ে ধু ধু মাঠ। মাঠের বুকে খোঁটা পোঁতা। সেখানে হালের বলদ, গাই। একটু দূরে ভেড়া, পাঁঠা, খাসি, ছাগল।

বলদের জোড়া কত—সিরাজ জানতে চাইল।

এগার হাজার!

তাগড়া হবে তো? আলটকপা এমনটি বলে সিরাজ আকাশ দেখতে থাকে। তার কোণে কেমন যেন গুঁড়িমারা মেঘ। আর তার পাশ দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কৈচরের হাটে। যে মেয়েরা, বউয়েরা গোরু, বলদের নাদ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাটে আসে, তারা এপাশে-ওপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। গোবর কুড়োচ্ছিল।

তাগড়া মানে—বলতে বলতে হাতের লম্বা লাঠিটি বলদের নাকের সামনে নাড়াতেই কি তিড়িং-বিড়িং লাফ বলদের।

দেখলেন তো বাবু! বলতে বলতে লোকটি লাঠি সরিয়ে নিল।

সিরাজ দেখতে পাচ্ছিল একটা আখ যেমন মোটা হয়, তেমনই চওড়া হবে বড়জোর, হাত পাঁচেক লম্বা লাঠিটির গোড়ায় শিঙসুদ্ধ ছাগলের চামড়া। গলা থেকে মাথা অব্দি, খুলে লাগানো লাঠির ডগায়।

একে বলে চামড়া-লাঠি। গোরু, বলদ এই শিঙসুদ্ধু চামড়া দেখে ভয় পায়। গ্যাস সহ্য করতে পারে না। নড়ে বসে। এটুকু বলেই রাজকুমার ভেড়া দর করতে থাকল।

লুঙ্গি অনেকটা তুলে পরা। গায়ে বুককাটা ময়লাটে হাওয়াই শার্ট। খালি পা।

ভেড়াটা কত রে! রাজকুমার জানতে চাইল।

সাড়ে তিনশো বাবু।

সাড়ে তিনশো কিরে, কতটা মাংস হবে?

এখন ভেড়ার মাংস একশো টাকা কিলো বাবু। কত দেবেন?

একশো পঁচাত্তর।

তা আপনি বলতেই পারেন। আপনি খরিদ্দার। ও দামে আমি দিতে পারব না বাবু।

তাহলে থাক—এসো সিরাজ—বলতে বলতে রাজকুমার এগিয়ে গেল।

হাটে কত কী-ই না ছিল—সব পর পর মনে পড়ে যাচ্ছিল সিরাজের। গো-হাটায় আসার অনেক আগে, হাটে ঢোকার মুখেই ডুগডুগি বাজান আইসক্রিমঅলা। পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি, মাথায় গামছা বাঁধা। গলায় ঝোলান আইসক্রিমের চৌকো বাক্স। পাশে ঝাল-মশলার দোকান। তেলেভাজা। কুমড়ো, আলু পটল, শশা। শশাঅলা—'ক্ষীরা, ক্ষীরা' বলে চেঁচিয়ে খরিদ্দার ডাকছিল। এপাশে খানিকটা পাকা, কালো, পুরনো তেঁতুল নিয়ে বসেছে একজন্। তার পাশে কুলোর দোকান। রবিবারের দুপুরে হাট জমজমাট।

জয়ন্ত, অসিত, শ্যামল, আর আমার বন্ধু এককড়ি—সবাই পেয়েছে তো রসগোল্লা? আর ড্রাইভার সাহেব? পকেট থেকে একশো টাকার একখানা নোট বার করতে করতে হাফিজুর জানতে চাইল।

হ্যাঁ, সবাই নিয়েছে। রাজকুমার সকলের হয়ে বলে উঠল।

এককড়ি তুই? আবারও জানতে চাইল হাফিজুর।

তুমি হলে আমার স্কুলের বন্ধু। এটুকু বলে আবারও মাথার চুলে হাত ছোঁয়াল হাফিজুর।

থাক, আর যত্নের দরকার নেই। এমনটি বলেই কাল রাতে শ্রাবণীর দোতলায় আড্ডার কথা মনে পড়ে গেল এককড়ির। বাইরে ঝম ঝম ঝম ঝম বৃষ্টি। বিকেলে কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারে একটা সংবর্ধনা ছিল হাফিজুরের। শাদা, ঢোলা পায়জামা। হাতামোড়া সিল্কের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির বুকে আবছা নকশা। পায়ে বাটার জুতো। বাংলাদেশ বাটার। সামনের দিকটা ঢাকা। পেছন দিকে কোনো বেল্ট নেই। খয়েরি চামড়ায় শেষ বেলার রোদ। সভায় ভারত-বাংলাদেশের এখনকার সাহিত্য, লেখালেখি বলতে গিয়ে বারে বারে গলা বুজে আসছিল হাফিজুরের। আমরা তো তখন দর্শক-আসনে—এককড়ি পালের মনে পড়ছিল।

'আপনারা আমায় আপন করে নিন। আমাকে কাটোয়ার সন্তান বলে দাবি করুন। আমি এদেশেরও মানুষ। দীর্ঘদিন বাদে মায়ের কাছে ফিরে এলে ছেলে যেমন স্নেহের জন্যে বুভুক্ষু থেকে যায়—আমিও, তেমনই—আসলে দেশ ছেড়ে চলে না গেলে তার টান টের পাওয়া যায় না—আমি এখন বুঝতে পারি'—বলতে বলতে খান দশেক বইয়ের লেখক, হাফিজুরের গলা বুজে আসছিল।

তুই এখন কত বড় হাফিজুর। তোর কত নাম। এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের তুই একজন—তবু তুই বাংলাদেশ থেকে এ বাংলায় এসে আমাদের খবর নিস। আমি এককড়ি পাল। স্কুলমাস্টার। এম এ, বি টি। তোর সঙ্গে যবগ্রাম মহারানি কাশীশ্বরী ইনস্টিটিউশনে পড়েছি। সঙ্গে রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরি, সমরেশ মণ্ডল, আরও কে কে সব ছিল। কেউ কেউ মরেও গেছে। ১৯৬১-তে সম্পত্তি বদলে তোরা মঙ্গলকোট থানার যবগ্রাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলি। তারপর মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ায় আসিস। এদিকে এলে দেখা হয়।

এককড়ি পাল তার গালে চার-পাঁচ দিনের জমান শাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে শুনতে পাচ্ছিল—'এককড়ি পাল, বিশ্বনাথ চৌধুরি, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়—এরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছের মানুষ। এদের দেখলে আমার বুক ভরে যায়। ছোটবেলা মনে পড়ে...

তুই কি বলছিস হাফিজুর! কতটা সম্মান দিলি আমায়—এত লোকের সামনে। বলতে বলতে পরনের ধুতি পায়ের দিকে একটু টেনে দিল এককড়ি—মশা কামড়াচ্ছে। কাঁধের ঝোলা আলগা করে কোলে রাখল। টেরিকটের ফুল হাতা, নীল শার্টের গোটানো হাতার বাইরে বেরিয়ে আসা কালো কারে বাঁধা মাদুলি হাতার আড়ালে চালান করতে করতে বলে উঠল—তুই অনেক বড় হাফিজুর। নইলে তোকে ডেকে এনে কেউ মহকুমা লাইব্রেরির নতুন ঘরের উদ্বোধন করায়! সেখানে—সেই নতুন লাইব্রেরি ঘরের গায়ে শ্বেতপাথরের চৌকো ট্যাবলেটের ওপর কালোয়—'এই পাঠাগার কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধক প্রখ্যাত কথাকার হাফিজুর আলম।' আমি তো আগেই দেখে গেছি সব। শ্বেতপাথরের চৌকো ফলকে আমার বন্ধুর নাম। বন্ধু লেখক। গল্প লেখে। মন্ত্রী, আমলা, এম এল এ বা পঞ্চায়েত প্রধান নয়,

তবু তার এত সম্মান।

এককড়ি চল, গাড়িতে উঠি। দুই বাড়ি যাওয়া আছে। খালার বাড়ি। চাচার বাড়ি। তারপর কাটোয়া ফেরা আছে—বলতে বলতে রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে এগোয় হাফিজুর। সিরাজের হাতে আর একটা হাঁড়ি।

রসগোল্লা ভালো ছিল না জয়ন্ত?

হ্যাঁ—জয়ন্ত ঘাড় নাড়ে।

গাড়ি নড়ে উঠলে জানলার ধারে হাফিজুর আবারও তার ডানদিকে নিচু জমিতে ধান দেখতে পায়। এখন অনেকগুলো চাষ, তাই না—বলতে বলতে হাফিজুর বলে ওঠে—আচ্ছা এককড়ি, শ্রীখণ্ড গ্রামে ঢুকতে একটা বড় বিল তারপর একটা কাদড় ছিল না।

এখনও আছে।

অ্যামবাসাডার ধুলো উড়িয়ে ছোটে।

কতবার গেছি ঐ বিলের ধারে—

হাফিজুরের মনে পড়ল।

এদিকে—নিগন, কৈচরের আগে থেকেই রাস্তা একটু বেটার—তাই না রাজকুমার? সিরাজ জানতে চায়।

একটু বোধহয়।

তারপর গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে তারা নিগন স্টেশন, সরু রেললাইন পেরিয়ে বাঁক নিলে গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়ে।

এবার আমরা যবগ্রাম পৌঁছে যাব। এটুকু বলার পরই এককড়ি পাল দিগন্তে উধাও মাঠের ভেতর একটি বাড়ি আবিষ্কার করে।

এখানে তোদের দোকান ছিল না!

ছিল এককড়ি। বড় মুদি-মশলার দোকান। বলতে বলতে হাফিজুর বাইরে রোদে পোড়া যবগ্রামের মাঠ দেখতে পায়। ইন্ডিয়ার মাঠ রোদে পুড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে হাফিজুর খুব চাপা গলায় বলে ওঠে, সে দোকান আব্বা ওপারে যাওয়ার আগেই বিক্রি করে গেছেন। কত কত রাত এখানেই থেকে গেছি। এই দোকানে। আমার আব্বার একটা বন্দুক ছিল। তা দিয়ে পাখি তো মারা যেতই। মানুষও। আমাদের দোকানের কর্মচারীরা আমি থাকলে খুব মাছটাছ কিনে আনত। রান্নাবাড়ি। এলাহি ব্যাপার।

ঐ যে, ঐ যে দেখছেন তালের সারি—হাতের রসগোল্লার হাঁড়ি, পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে নামিয়ে হাফিজুর আলম তার স্বাস্থ্যবান পুরুষ্টু আঙুল তুলে বাইরে দেখিয়ে আবারও বলে—ঐ যে তাল গাছের সারি, সেখানে চন্দ্রবোড়ার আড্ডা ছিল। কি সাপ! কি সাপ! বাপ রে বাপ।

একটা পুকুর ছিল না ওখানে—এককড়ি পাল জানতে চাইছিল।

সবুজ মাঠের ওপর কাদামাখা নিচু জমিতে শাদায়-কালোয় কোনো সারস জাতীয় পাখি। লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে কাদা কাদা জমি পার করতে করতে পোকা খুঁজছে ঘাড় নিচু করে করে।

পুকুরটা নেই। হাফিজুরের বুক ভেঙে কোনো বড় শ্বাস বেরিয়ে এল কি? জিনস শার্টের

বড় পকেট থেকে সরু, লম্বাটে ডায়েরি বের করে সিরাজ নোট নিচ্ছিল।

পাঁচ বছর গ্রামে এসে কত কি বদলে গেছে দেখেছি। একটু আস্তে ড্রাইভার ভাই! প্রথমের অংশটি না বলে পরেরটুকু বলল হাফিজুর।

ধানঝাড়ার মেশিন চলছিল—ফরর ফরর। ফরর ফরর।

মহারানি কাশীশ্বরী ইনস্টিটিউশনের আগে গাড়ি থামল। আজ রবিবার। স্কুলের মেইন গেট বন্ধ। সিরাজ দেখতে পেল গেটের মাথায় পাথরে লেখা আছে— 'যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী ইনস্টিটিউশন। স্থাপিত ১৯১৬। প্রতিষ্ঠাতা—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

স্কুলের উল্টোদিকে প্রায় এক মানুষ সমান সিমেন্ট বাঁধানো শহিদ বেদি। হরিপদটা খুন হল। সঙ্গে বিনয়। যবগ্রামে ঢোকার আগে বড় বটের নীচে পাশাপাশি তার দুজনে—এই তো বছর দুই আগে, এককড়ি পালের সব মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আচ্ছা, হাফিজুরদা, ১৯৬০ সালে লেখা আপনার 'ঘোড়া' গল্পের সেই যে ডানাঅলা ঘোড়া, যা নেমেছিল শূন্য থেকে—সে কি এ গ্রামেই?

হবে হয়ত রাজকুমার। আবার নাও হতে পারে। এটুকু বলে হাফিজুর চোখ নাচাল।

ডানাঅলা ঘোড়াটি নেমে এল আকাশ থেকে, ছেলেটি তাকে দেখল। ঐ গল্পের লাইন মনে পড়ে যাচ্ছিল রাজকুমারের। সে কি এই গ্রামে? এরকম কোনো দুপুর বা বিকেলে? ভাবতে ভাবতে রাজকুমার থই পাচ্ছিল না।

কে, হাফিজুর না!

অ তুই—সমরেশ!

বলতে বলতে আলিঙ্গন।

খালি গায়ের মানুষটি হাফিজুরকে ছাড়তে চাইছিল না।

কি খবর বল! কেমন আছিস?

আর থাকা ভাই। গাঁয়ে যেমন হয়। বুড়া হলুম বটে। সুগার। প্রেসার। তুই তো দিব্যি আছিস।

না, শরীর খুব ভালো নয়।

আচ্ছা, দিবার খবর কী?

কে দিবা?

দেবশংকর রে বাপু—আমাদের দিবা—খানিকটা চেঁচিয়েই বলে ওঠা হাফিজুরের। তার শুকনো হয়ে আসা ঠোঁট, ছাই রঙের জিভ, টাগরা—সবই কেমন খরায় পাওয়া, তবু এটুকু বলাতেই সমরেশ বুঝতে পারে—দিবা মানে হরেনবাবুর বড় ব্যাটা দেবশংকর, মানে দিবা নন্দী।

সে তো মরে গেছে, দুই বৎসর হল প্রায়।

দিবা মরে গেছে? হাফিজুর কেমন যে হাপসে ওঠে। হয়ত-বা এই গরমেই।

হ্যাঁ, দিবা মরল। সুনীল মরল। শামসুর মরল।

চলি রে সমরেশ। তুই আয় তা-লে—বলতে বলতে হাফিজুর সামনে পা বাড়ায়। সরু মাটির রাস্তা। মাঝে মাঝে মাটি ফেলা। দু পাশে বাড়ি। খড়ের চাল। ঢেউ টিন দু-চারখানা।

আমাদের বাড়িটা বুঝলে—নেই। মাটির সঙ্গে একদম মিশে গেছে। মাটির দোতলা ছিল আমাদের। চার চার—আটখানা ঘর। সে সব কিচ্ছু নেই। আব্বা বড় শখ করে বানিয়েছিলেন। কিন্তু যারা বদলাবদলি করল, তারাও সেই বাড়ি রাখল না। এইখানে। এইখানে—বলতে বলতে হাফিজুর আঙুল দেখাল। ঘাস ছাড়া, চৌকো ন্যাড়া জমি একখণ্ড। তাকে ঘিরে খড়ের চাল দেয়া মাটির ঘর কয়েকখানা। হাতখানেক উঁচু মাটির দাওয়ায় বসে পাটি বোনার খেজুরপাতা কুটছিল যে কিশোরী, সে তার তামাটে উদলা উরু ঢাকল এতজন মানুষ দেখে।

এইখানে, এইখানে, জানো তো আমাদের ভিটে—বারে বারে বলছিল হাফিজুর। রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে সিরাজ আর রাজকুমার দাঁড়িয়েছিল।

কি হাওয়া খেলত ঘরে! ফ্যান লাগত না। চারপাশ তখন ফাঁকা। পাশে একটা বড় পেয়ারা গাছ ছিল। সেই গাছটাও নেই।

কিন্তু ডানাঅলা ঘোড়া কোথায় নেমেছিল? কবি রাজকুমার রায়চৌধুরিব ভেতর প্রশ্নের ঢেউ।

চল হে—খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ি যাবে। তারপর মাসির বাড়ি। এককড়ি তাড়া দিচ্ছিল।

সমরেশ বলল, কড়িলালের সবেতে তাড়া হে—সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। বড় ধড়ফড় করে কড়িলাল—ছেলেটা গাঁয়ে এল কতদিন পরে। একটু দেখুক। ঘুরুক। কথা বলুক।

তাকে আবার ফিরতে হবে না কাটোয়ায়? সেখান থেকে বর্ধমান যাবে। বর্ধমানে সভা আছে তার, সাহিত্যের। তারপর আমি আবার কড়ুই ফিরব।

আরে কড়ুই তো তুমি বাসেও যেতে পারবে।

তা কেন সমরেশ! আমি এককড়িকে গাড়িতে নিয়ে এসেছি। আবার খানিকটা এগিয়েও দেব। বলতে বলতে হাফিজুর বলল, চল হে—

সবাই এগোচ্ছিল। উঠোনে, পথের ধারে গোর। পুকুরঘাটে চান সারছে কেউ কেউ। চাচা রমজান আলির ভিটেয় দাঁড়াতেই কাঠের রেলিং ঘেরা মাটির দোতলা থেকে উঁকি দিল যে কিশোরী, সে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তারপর, তা হবে মিনিট পাঁচ সাত, উঠোনে যে দুই যুবক নেমে এল— তারা দুজনেই 'কালোচাচা ও কালোচাচা' বলে হাফিজুরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ও প্রদীপ, তুই—এই তো জ্যোতিও রয়েছে—বিদ্যুৎ কই? হাফিজুর জানতে চাইল।

দাদা পঞ্চাত ভোটে পোচারে গেচে।

অ। তা ফিরবে কখন?

সে তো পাটির পোগ্‌গাম। পাটি যকন ছাড়বে—

তোদের আব্বা!

আব্বা আসবে এখনই।

লাল সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়া, তাতে মাদুর বিছিয়ে দিল প্রদীপ। এক ঝাক কালো কালো মাছি দাওয়া থেকে উড়ে আবার মাদুরে বসল।

ও কালোচাচা, দুপুরে খাবে একেনে—

আগে খালার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। নে, এটা রাখ—

হাফিজুরের হাত থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি নিল প্রদীপ।

এ দুটো কে? জ্যোতির পায়ের কাছে ঘুরে বেড়ান দুই ফ্রকপরা নেহাতই বালিকার দিকে আঙুল তুলল হাফিজুর।

ও তো নাইস আর বিউটি। দেড় বছরের ছোট বড়। প্রদীপের দুই মেয়ে।

কোন ক্লাসে পড় বাবা তোমরা?

ক্লাস থ্রি। ক্লাস ফোর। পর পর জবাব ভেসে এলে হাফিজুরের কানে।

জ্যোতির ছেলেপিলে কি?

ঐ এক ছেলে। তার তিনদিন ধরে খুব জ্বর। কাশি। গাঁয়ে কি ভাইরাস না কি জ্বর হচ্ছে না!

খালার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি একটু। বলতে বলতে হাফিজুর তার চাচার উঠোন ছাড়াতে চাইল। সিরাজ দেখল উঠোনের একপাশে রাখা ধান-মড়াইয়ের ছায়া লম্বা হয়েছে। কলকে ফুলগাছে হলুদ হলুদ অনেক ফুল। এ সবই বুক পকেট থেকে লম্বা নোট বই নামিয়ে নোট করছিল সিরাজ। হাফিজুর আলমের ওপর একটা সংখ্যা তো আমাদের কাগজের করবই, তখন সব তথ্য লেগে যাবে। ভাবতে ভাবতে সিরাজ নোট বইতে ডট পেন বুলোচ্ছিল।

এই যে আমাদের গাঁয়ের পাঁচপীর। রাজকুমার, সিরাজ, জয়ন্ত দ্যাখো। অসিত, শ্যামলদেরও ডাকো।

খোড়ো চাল, মাটির ঘর, রাস্তা থেকে প্রায় আধমানুষ সমান উঁচু। তার ভেতর মাটির নিকনো বেদিতে চারটি শাদা ঘোড়া। তাদের কালো চোখ। পিঠে হলুদ আর কালোয় সওয়ারি বসার জায়গা আঁকা।

এই আমাদের পাঁচপীর। আমাদের বাড়ির লোকেরাই এর খাদেম।

খাদেম মানে জানেন তো রাজকুমার, সেবায়েত। বলেই সিরাজ একটা সিগারেট ধরাল।

হ্যাঁ, সেবায়েত। ঠিক বলেছেন সিরাজ—বলে হাফিজুর সেই পীর-ঘরের দিকে তাকাল।

রাজকুমার হাত বাড়িয়ে সিগারেট চাইল সিরাজের কাছে। তারপর এগিয়ে গিয়ে একেবারে খোড়ো ঘরের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল মাটির চৌকো বেদিতে চারটি ঘোড়া, একটি নীচে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কোথা থেকে যেন চোরা আলো এসে পড়েছে ঘোড়াদের পিঠে, গলায়। আর সেই আলো হঠাৎই পাঁচ জোড়া পাখনা হয়ে গেলে ঘোড়ারা উড়তে উড়তে উড়তে কোন দিগন্তে যেন মিশে যায়। খড়ের চাল থেকে নেমে আসা রথের কাঠামো যেমন হয়, তেমনই হাতখানেক লম্বা শোলার কী একটা যেন বাতাসে দোল খাচ্ছিল। রাজকুমার দেখতে পেল ঘোড়াদের সঙ্গে সেও উড়ে গেল। এমনকি বেদির বাইরে যে ঘোড়াটি কাত হয়ে পড়েছিল সেও কেমন গা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, কেশর ফুলিয়ে দিব্যি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পীরের শূন্য থানটুকু পড়ে থাকে। ঘরের সামনে একটি শাদা ছাগলছানা। সেই ছাগলছানা দ্রুত দৌড়ে কোথাও হারিয়ে গেলে একটি শাদা মুরগি,

দিব্যি বসে থাকে। এসবই রাজকুমার দেখতে দেখতে একসময় ভ্যাবলা মেরে যায়। তাহলে কি সেই ঘোড়া এখানেই কাছাকাছি কোথাও নেমেছিল উড়তে উড়তে—নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করে রাজকুমার।

তারপর সবাই মিলে খানিকটা এগোলে ডানদিকে একটি সরু নিচু গেটঅলা পাকা মসজিদ দেখিয়ে হাফিজুর আলম বলে ওঠে, এটি আমাদের গ্রামের মসজিদ। কাঁচা ছিল। পেকেছে।

রাজকুমার ঘোড়াদের উড়ে যাওয়ার ঘোর থেকে বেরিয়ে সবার সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

অ সমরেশ, তুই কি করবি? হাফিজুর জানতে চায়।

বাড়ি গিয়ে চান-খাওয়া করি!

তাই কর।

খালার বাড়ির দরজাটি আলকাতরা মাখানো। ফ্রেম এত নিচু যে সকলকেই মাথা নামিয়ে ঢুকতে হয়। হাফিজুর মাথা নুইয়ে উঠোনে পৌঁছে দেখতে পায় একটি ঝাড়ালো আমগাছের নীচে শাদায় খয়েরিতে গাভীন গোরু জাবর কাটছে।

অ খালা। খালা!

বোনপোর ডাকে মাসি ছুটে বেরোয়। শাদা থান ঢাকা গা-টি—মাথায় শাদার ছাউনি।

অ আনু এলি! আজু তো কয়েকমাস আগে এল। তুই তো সেই কবে এসেছিলি! আবার এই এলি, কতদিন পরে। তা খালাকে কি মনে আছে বাবা! একটা চিঠিও লেখ না।

মাসির এই কথায় হাফিজুর কোনো উত্তর দেয় না। শুধু মিষ্টির হাঁড়িটি তার হাতে দিয়ে বলে, ছেলেদের দিও।

আমি তোমার ছোটবেলার পায়ের ছাপ, ছবি—সব রেখেচি। সিতি বাবা সিতি। তা বোসো বাবা ঘরে গিয়ে। ওপরে গিয়ে বোসো। অ আনু। যাও বাবা—

সরু সিঁড়ি। তা বেয়ে উঠলে কাঠের রেলিং ঘেরা দোতলা। সরু বারান্দা আছে। এক খানিই বড় ঘর। সেই ঘরে বস্তা বোঝাই সর্ষে, গম। ঘরে তেমন আলো-বাতাস নেই। গোটা ঘর জুড়েই কেমন যেন পুরনো কাঁথা-কানির গন্ধ। একটি বছর সাতেকের ছেলে চেয়ার এনে দিল। হাফিজুর বসল তার ওপর। মাটির মেঝেতে খেজুর পাটি পেতে দিয়ে গেল খোকাটি। তার ওপর থেবড়ে বসল রাজকুমার, সিরাজ, জয়ন্ত, এককড়ি, অসিত, শ্যামল।

এই যে খোকাটি দেখলে, মাসির ছোট মেয়ের ছেলে। মাসির ছেলে নেই। দুই মেয়ে। বড়টির একটি খোকা। তার বিয়ে হয়েছে বছরখানেক। ছোটর তিনটি ছেলে। বড় মেয়ে নেই। মারা গেছে। বড় জামাইয়ের সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছে খালা। খালু নেই। জমি, বাড়ি, সম্পত্তি দেখতে একজন সমর্থ পুরুষমানুষ চাই তো। এটুকু বলে হাফিজুর চালের কাছাকাছি বাঁশের মাচায় অনেকগুলো খেজুরপাটি দেখতে পেল।

দোতলার আবছা অন্ধকারে হাফিজুরের ঠোঁট নড়া দেখতে পাচ্ছে সিরাজ, জয়ন্ত, এককড়ি, রাজকুমার। কথা শুনতে পাচ্ছে।

ততক্ষণে খালা এসে দাঁড়িয়েছে দোতলায়। মাথার কাপড়টি আরও টানা।

তা তোমরা চা খাবে তো?

না খালা, বেলা হল। কি গো, তোমরা খাবে না কি? হাফিজুর জানতে চাইল।

না, বেলা হল অনেক।

কিছু খাও তো বাপু।

না, চাচার বাড়ি বলে এসেছি খালা। ওখানেই আয়োজন হবে।

তা মুড়িটুড়ি কিছু—

কি খাবে মুড়িটুড়ি—হাফিজুর সিরাজের দিকে তাকাল।

খাব—প্রায় সবাই একসঙ্গে একথা বলে উঠতে খানিকক্ষণের মধ্যেই প্লাস্টিকের বড় খান্‌চা এল। শাদার ওপর লালে ফুল পাতা। সেই খানচায় ইউরিয়া ছাড়া লালচে মুড়ি। মুচমুচে। চিনির বড় বড় শাদা বাতাসা। তারপর পেঁয়াজি।

নারকেল দেব নাকি আনু? খালা জানতে চাইল।

দাও। মুখে মুড়ি ফেলতে ফেলতে বলল হাফিজুর।

চাক চাক করে কাটা নারকেল এল। প্লাস্টিকের জগে জল।

ভালো আছ ভাই? দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইছিল খালার ছোট মেয়ে। তার কনুই ধরে দাঁড়ানো একটি খোকা। পাশে আরও দুজন। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়েছিল খালা।

আর দুটো মুড়ি দি বাবারা?

না। আর লাগবে না। সিরাজ বলল।

শাদা পাঞ্জাবি, গাঁটের ওপর অনেকটা উঁচু করে নীল-শাদা চেকদার লুঙ্গি পরা যে মানুষটি দরজার একপাশ থেকে হাতে হাতে খান্‌চা এগিয়ে দিচ্ছিল, তার মাথায় শাদা টুপি। পায়ে প্লাস্টিকের হলদেটে জুতো। কালো-শাদা দাড়ি থুতনি ছাড়িয়ে অনেকটা নেমে এসেছে বুকের দিকে। গোঁফ ছোট করে ছাঁটা।

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

মসজিদে।

অ—উত্তর শুনে হাফিজুর আবারও মুড়িতে মন দিল।

সিরাজ তার হাতঘড়িতে দেখল এখন দেড়টা। মিনিট পনের কুড়ি আগে জোহরের আজান হচ্ছিল। আমাদের নতুনহাটে বারোটা চল্লিশ থেকে পৌনে একটায় জোহরের আজান হয়, সেই সময় আমি প্রায়দিনই চানে যাই, সিরাজের মনে পড়ল।

কি মনে হওয়াতে সেই পরহেজগার চেহারার মানুষটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। আর তখনই এককড়ি পাল চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল, হাফিজুর এ তোমার মাসির বড় জামাই না?

আগে বড় জামাই ছিল। এখন ছোটও, বললাম না আগেই। দাও তো জলের গ্লাসটা—বলেই হাফিজুর জলের জন্যে হাত বাড়াল।

নীচে থেকে মাসির জামাই ততক্ষণে আর একটা প্লাস্টিকের খানচায় রসগোল্লা সাজিয়ে এনেছে।

মিষ্টি একটাও না। আমরা খাব না। বাচ্চারা খাবে। বাচ্চাদের জন্যে মিষ্টি এনেছি, হাফিজুর দেখতে পেল খালা দাঁড়িয়ে।

অ আনু, চিঠি দাও না কেন! কবে মরে যাব। অর দেকা হবে না বাবা। তোর ছবি রেকেচি কত যত্ন করে। পায়ের ছাপ। সব সিতি।

কই, দেখাও দিকি খালা, কেমন ছবি আছে!

বুড়ি সত্যি সত্যি পুরনো খাতার ভেতরে রাখা একটা খামের পেট থেকে অনেকগুলো ছবি বার করে। হাফিজুর, হাফিজুরের বউ দিলারা, দুই মেয়ে। দাদা—আজিজুল। দাদার মেয়েরা। ছেলে। তাদের ছেলেমেয়েরা। সবার কেমন কম বয়েস।

এসব ছবি কি আমার?

আমি তো নিজেকেই নিজে চিনতে পারি না। মাথা ভর্তি চুল। কালো। থাক থাক। অ্যাত চুল কি আমার মাথায় কখনও ছিল! অ্যাত ঘন। অ্যাত কালো। অ মা, এ ছবিতে আমি বন্দুক নিয়ে বসে আছি মাঠে। পরনে ধুতি আর শার্ট। পায়ে কেডস। এ ছবি তো আমিও ভুলে গেছিলাম। এই তো, কি ব্যাপার রে ভাই—আরে, এই ছবিতে আমি আর সমরেশ পাশাপাশি। আজ থেকে কত বছর আগে! চল্লিশ হবে কি? কিংবা তারও আগে! এত সব ছবি খালা সাজিয়ে রেখেছে! এতদিন ধরে! ভাবতে ভাবতে হাফিজুরের চোখে জল এল।

বন্দুকঅলা ছবিটা আমরা আমাদের কাগজের আপনার ওপর স্পেশাল নাম্বারে রাখব হাফিজুরদা। সঙ্গে সমরেশবাবুকে নিয়ে যে ছবিটি আছে, সেটাও—

খালা কি দেবে, দ্যাখো—

আমরা ছবি দুটো নিয়ে কপি করে ফেরত দেব—এটুকু বলে সিরাজ হাত বাড়াল।

নিয়ে যাও বাবা। এখন শুধু সিতি। মরে গেলে—কে দেখবে! আনুর পায়ের ছাপও আছে—আলতা দিয়ে তোলা—তখনও এতটুকুন। বলে খালা যে মাপ দেখাল, তাতে তখন বছর চার-পাঁচ হবে বড়জোর হাফিজুরের।

ছবি আমরা ফেরত দিয়ে দেব—দুটো ছবি নিজের জিনস-শার্টের বুক পকেটে পুরতে পুরতে সিরাজ বলল।

থাক না বাবা। আনুর তো আরও ছবি আছে। কবে মরে যাই, তখন এসব ছবি যে কোতায় যাবে!

দূরে বেড়া ঘেরা রান্নাঘরে ঠিক তখনই মাটির হাঁড়ি থেকে ভাতের ফেন খাচ্ছিল একটা পাঁশুটে রঙের বেড়াল। তার জিভ যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল কোনো শব্দ না করে। হাঁড়ির গায়ে কাঠ, পাতার কালি। গাভীন গোরুটি একমনে কী যেন চিবিয়ে যাচ্ছিল। লম্বা, উঁচু মতো ঝোড়া চাপা এক মা-মুরগি তার গোটা দশেক বাচ্চা নিয়ে কঁ-ক্ক-কঁ বলতে বলতে নিজের ভাষায় বকাবকি, নাকি খবরদারি করছিল।

নাতবউ দেখাতে পারলাম না। বাপের বাড়ি গেছে, বাচ্চা হতে—বলতে বলতে খালা আবারও মাথার ঘোমটা টানল।

চলি খালা।

আবার এসো বাবা। চিঠি দিও। সিতি বড় মনে পড়ে।

হাফিজুর মাথা নিচু করে গেট পেরল। পেছন পেছন এককড়ি পাল, জয়ন্ত, সিরাজ, রাজকুমার—অন্যরা।

চাচাতো ভাই সামসুরের লাল সিমেন্ট মোড়া দাওয়ায় মাদুরের ওপর খবরের কাগজ। তাতে ফুলছাপ প্লাস্টিকের খানচা। প্রত্যেকের জন্যে ফুলকো লুচি চারখানা করে। ছোট ছোট করে আলুর কুচি দেয়া ছোলার ডাল। একটা মাঝারি খানচায় ধোঁয়া ওড়ানো সুজি। প্রদীপ, জ্যোতি, বিদ্যুৎ লুচি, ডাল দিচ্ছিল। জল দিচ্ছিল নাইস, বিউটি।

মাছিদের টেক অফ, ল্যান্ডিং চলছিল মাদুরের ওপর।

দূর থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। সিঁড়ির মুখে হাত গুটনো ছিটের ফুলশার্ট আর লুঙ্গি পরে বসেছিল হাফিজুরের খুড়তুতো ভাই শামসুর।

ড্রাইভার সাহেব খাবেন না? হাফিজুর জিজ্ঞেস করছিল তার খুড়তুতো ভাইকে।

জিজ্ঞেস করতে গেছিলাম। ড্রাইভার বলল, ভাত খেয়ে এসেছে। আর খাবে না।

অ কড়িলাল, কদ্দিন পরে এলে, ভালো করে খাও—হাসতে হাসতে বলল শামসুর।

খাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে এল প্রায়। রোদ পড়ে আসছে। হাওয়ায় গরম আছে। সেই এবড়ো-খেবড়ো মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাফিজুর বলছিল, কত লোক বেড়ে গিয়েছে গ্রামে। অ্যাত ভিড়। আগে এমনটি ছিল না।

গোটা গ্রামের খানিকটা পেছন পেছন আসছিল হাফিজুরের। রাস্তার পাশে পাশে হাঁসের ছানা, হাঁস, মুরগি। জাবর কাটা বলদ।

নাইস বলল, আবার এস কালোদাদু।

বিউটি বলল, আবার আসবে তো কালোদাদু?

হাফিজুর দুহাতে দুজনকে কাছে টেনে নিল।

আবার আসিস। বলতে বলতে সমরেশ মণ্ডল কাঁধের গামছায় মুখ মুছল।

ঘাড় নাড়ল হাফিজুর। আসব। নিশ্চয়ই আসব।

সিরাজ তার লম্বা নোটবুকে যতটা পারছিল নোট নিচ্ছিল। ইস, একটা টেপ রেকর্ডার আনলে—বারে বারে মনে পড়ছিল সিরাজের। যাক, নোটই নি—পরে সংখ্যাটা বের করার সময়—

ছবি দুটো ঠিক করে রেখেছ তো সিরাজদা—জয়ন্ত জানতে চাইল। খুব ইমপর্ট্যান্ট ছবি।

রেখেছি ভাই। রেখেছি। বলতে বলতে বুক পকেটে হাত দিল সিরাজ।

কবি রাজকুমার রায়চৌধুরি দেখতে পেল দূরে রোদ নিজের মতো সরে যাচ্ছে। আর সেই রোদের ভেতর থেকে যবগ্রামের পাঁচপীর থানের পাঁচটি শাদা ঘোড়া ডানা নাড়তে নাড়তে শোলার রথটি বয়ে আনছে। অ্যামবাসাডার পেরিয়ে রথ এসে দাঁড়াল ভিড়ের সামনে। রাজকুমার পরিষ্কার শুনতে পেল রথ বলে উঠেছে, হাফিজুর ভাই, উঠে পড়ুন। রথে উঠে পরুন।

পাঁচপীরের পাঁচটি ঘোড়াই ঘাড় বাঁকিয়ে অস্থির হয়ে পা ঠুকছিল। ডানা নাড়ছিল

কামদেব-পুরাণ

শ্রীশ্রী মহিষাসুরমর্দ্দিনী পালা
লেখক — শ্রী কামদেব শিউলি
পিতা — ৺কৃষ্ণ শিউলি
গ্রাম-বলরামপুর, নতুনহাট, নাড়ুপাড়া

ওঁ শ্রী শ্রী গণেশায় নমঃ

আমি শ্রী কামদেব শিউলি, পিতা ৺কৃষ্ণ শিউলি—তাহাকে সবাই কেষ্ট শিউলি বলিযা ডাকিত। আমি মাধ্যমিক ফেল। ফেল বলিলে ভুল হইবে। বেক পাইয়াছি। তাহার পর আর পড়িতে পারি নাই। আমি ব্রহ্মপুর বটতলা বাজারে গোটা ও গুঁড়া মশলা লইয়া বসি। সঙ্গে কখনও কখনও প্যাকেট করা শুকো মাছ। প্লাস্টিকের প্যাকেটে শুকো মাছ পুরিয়া, সেই প্যাকেটের মুখ মোমবাতির আগুনে বন্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখি। তাহাতে গ্যাস কম বাহির হয়।

আমি একটি পালা লিখিব। যাত্রাপালা। বীণাপাণি নট্ট কোম্পানির 'মহিষমর্দ্দিনী পালা' গতবার দেখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল পালার নাম দিব বীর মহিষাসুর। কিন্তু তাহা শুনিযা কেহ ২ ভদ্রলোক কহিলেন শুধু মহিষাসুরের নামে পালা চলিবে না।

এটুকু লিখে কামদেব শিউলি আট নম্বর রুল টানা বাঁধানো খাতা বন্ধ করে রাখল। খাতার শুরুতে শুঁটকি মাছের দর লেখা।

১। লটকে শুকনো (নেহেড়ে)/সবচেয়ে বেশি চাহিদা—৬০ টাকা কেজি।
২। পমফেট শুকনো/তেমন চাহিদা নাই—৮০ হইতে ১০০ টাকা কেজি।
৩। আমোদিনী/চাহিদা আছে—৪০ টাকা কেজি।
৪। চিংড়ি/দুরকম, কুচো বা ফুল চিংড়ি ৮০ টাকা, বড় চিংড়ি ১০০
৫। ইলিশ/১৫০ টাকা কেজি
৬। নোনা ইলিশ/ঐ
৭। পায়রা চাঁদা/৫০ হইতে ১০০ টাকা কেজি
৮। সীতেপাটি (ছোট) ৫০ টাকা কেজি (ভালো চাহিদা)
৯। সীতেপাটি (বড়) ৫০ টাকা কেজি (ঐ)

পরের পাতায়—
১। হলুদ গুঁড়ো, ১ প্যাকেট — ১০০ গ্রাম ৭ টাকা
২। জিরে গুঁড়ো, ১ প্যাকেট — ১০০ গ্রাম ১৫ টাকা
৩। লঙ্কার গুঁড়ো, ১ প্যাকেট — ১০০ গ্রাম ৭ টাকা

যাত্রাপালা — শ্রী শ্রী মহিষাসুরমর্দ্দিনী

চরিত্র

মহিষাসুর

রম্ভাসুর

মাহিষমতী

রক্তাসুর

জৈবাসুর

ভৈবাসুর

জম্ভাসুর

পদ্মাসুর

মা দুর্গা

অসুররাজ মহিষাসুরের সভা।

জয় অসুররাজ মহিষাসুরের জয়! জয় অসুররাজ মহিষাসুরের জয় ...।

সভায় নৃত্যগীত হইতেছে। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসিয়া অসুররাজ মহিষাসুর মাল খাইতেছে।

এই অব্দি লিখে কামদেব চুপ করে রইল। আমি কি মাল লিখব, না কি মদ? অসুররাজ মহিষাসুর কী মদ খাবে! দেশি, চোলাই—নাকি বিলিতি? মাধ্যমিক পড়ার সময়ে অনেকগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো বাচ্চা পড়াতাম। তখন যাকে বলে একটা চর্চা ছিল। এখন শুকো মাছ আর মশলার হিসেব ছাড়া কিচু মনে আসে না। লিখতে পেন সরেনা। অথচ মনে কতদিনের ইচ্ছে একটা পালা লিকব। সেই পালায় অভিনয় করব।

আমার বাবা ˚কেষ্ট শিউলি যাত্রা করত। অভিনয়। বাবা রিকশা চালাত। রোজ রাত দুটো আড়াইটে অব্দি। গায়ে গেঞ্জি, লুঙ্গি, পায়ে ফটফটানো কাঠের খড়ম। খুব বিড়ি খেত। তালতলা, সাহেব কুঠির মোড়ে এখন যেখানে পার্টি অফিস, বাবার রিকশা নিয়ে দাঁড়ানর জায়গা ছিল ওটা। বাবা বিরানব্বই সালের পয়লা বৈশাখ পটল তুলল।

ছিঃ, পটল তুলল বলতে নেই। বলতে হয় মারা গেছেন। কে যেন বলেছিল এই কতা! ঠিক মনে নেই। বাবার হাগা হচ্ছিল কয়েকদিন। রক্ত আমেশা। বিছানায় শোয়া। পয়লা বৈশাখ দিদিদের নেমন্তন্ন করেছিল বাড়িতে। জামাইবাবুদেরও। কথা ছিল রাজহাঁস কাটা হবে। তখন আমাদের বাড়িতে তিন জোড়া রাজহাঁস। ১৯৮৬ সালে গোপালগঞ্জের পর রামমাকাল চক থেকে পঞ্চাশ টাকা জোড়া রাজহাঁস এনেছিলুম। আমি তাদের কুঁড়ো খাওয়াতুম হাতে করে। ভাত। গেঁড়ি ভাঙা। গেঁড়ির ঝোল আমরাও খাই। ঝিনুক। পুকুর থেকে তুলে তুলে। গেঁড়ি চোখের জন্য খুব ভালো।

বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মা গেঁড়ি খায় না। কাঁকড়া খায় না। ডিম, মাংস—খাসির মুরগির—কিছু খায় না। শুধু মাছ খায়। তাও সব মাছ নয়। ল্যাটা নয়। শিঙ নয়। মাগুর নয়। কুঁচে-মাছ নয়। কুঁচে-মাছ আমরা খাই। পঞ্চাশ টাকা কিলো নেপালগঞ্জের বাজারে। ডুমো ডুমো করে কেটে আলু দে, ঝাল দে, প্যাঁজ, আদা দে—ও হো—হো—গেঁড়ির

ঝোলও আদা প্যাঁজ রসুন দে—কি যে সোয়াদ লাগে না! বড় বৌদি খুব ভালো রাঁদে গোঁড়ি। বড়দা আলাদা থাকে। বড়দার প্রথম বউ তো পুড়ে মোলো গায়ে আগুন দে। তখন বড়দার দুটো ছেলে। সবাই বড়দারে বে বসতে বলল। বড়দা বসল না। পরে শালিরে বে করলে। সে শালির আবার একটা ছেলে। আগে বিয়ে হয়েছিল এক ন্যাপালির সঙ্গে। সেই ন্যাপালি দেশে চলে গেল। তার খোকা রইল। দাদা বিয়ে করল সেই শালিরে। সে মাগি আবার চুন্‌নি। চোর। মায়ের বাক্স খুলে শাড়ি বের করে নিতে চাইছিল ছোট বোনের বে-র সময়ে।

বড়দার বড় ছেলেটার নাম ভরত। তারে আমি খুব ভালোবাসতাম। দুজনে অসুর সেজে যুদ্ধু করতাম বাড়ির পাশে, উঠোনে। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর ভরত বলত, কাকু, আমার আর যুদ্ধ করতে ভালো লাগচে না।

ভালো লাগচে না কেন শালা! কর। যুদ্ধু কর।

ভরত বলত, না কাকু। আর পারছি না।

দূর, এভাবে কেউ অসুর হয নাকি। অসুরদের গায়ে কত জোর!

কি করে অ্যাত জোর হয় কাকু?

মাংস খায়। মাল খায়।

সে তো মেজোকাকাও খায়। মেজোকাকার গায়ে কি জোর আছে!

দূর, তোর মেজোকাকা তো রোজা।

রোজা কি কাকু!

ভূত ছাড়ায়। ভূত নামায়। ফুঁকফাঁক মারে।

আবার বাবা *কেষ্ট শিউলি। তার বাবা *নারায়ণ শিউলি। তার বাবা *কালিপদ শিউলি। *কালিপদ শিউলির বাবা *উমাশঙ্কর শিউলি। আমার মা সুন্দরী শিউলি কয়ালদের মেয়ে। মায়ের বাবা *সুন্দর কয়াল। তার বাবা *অনুরোধ কয়াল।

কেদার সাহেবের বাড়ি বাবা চাকরের কাজ করত। কেদার সাহেব খুব বড়লোক। নাড়ুপাড়ায় তার বাড়ি। নাড়ুপাড়ায় বেশ কয়েক ঘর নাড়ু থাকে। মানে তাদের টাইটেল নাড়ু। বাবার যখন চোদ্দ, তখন বাবার বিয়ে দিল কেদার সাহেব। মায়ের তখন কত হবে, দশ টশ। কি আরও কম। আটটাটও হতে পারে। তারপর আমরা পর পর জন্মালাম। চার ভাই। ছ বোন। মোট দশজন। ভাইয়েরা বলতে জয়দেব, বাসুদেব, মহাদেব আর এই কামদেব। বোনেরা হল—লক্ষ্মী, সরস্বতী, বেস্পতি, প্রতিমা, কমলা, কামিনী। পাঁচ বোনই বড় আমার থেকে। খালি কামিনী ছোট। কেদার সাহেবের বাড়িতে বড় বৈঠকখানা। খুব চওড়া চওড়া দ্যাল। কেদার সাহেবের বড় ছেলে নীরববাবু। আমার বাবা বাঁশি বাজাত। কেদার সাহেবের বাড়ি সেই বাঁশি রাখা ছিল। এখনও আছে কি?

আচ্ছা, অসুররা কী মদ খাবে? তারপর যে সে অসুর নয়, অসুররাজ মহিষাসুর।

মেজদা নিজেকে বলে তান্‌তিক। সবাই বলে মেজদা গুণিন। রোজা। ফুঁকফাঁক জানে। বশীকরণ, বাটি চালান। জল-পড়া তেল-পড়া। বাণমারা।

মেজদা কালিপুজো করে। অমাবস্সার নিশিতে উদোম ন্যাংটো হয়ে বনচাঁড়ালের শেকড় তোলে। সেই বনচাঁড়াল গাছের সামনে হাততালি দিলে নাকি অমাবস্যার রাতে নাচতে থাকে। মাথা দোলায়।

মেজদার মুখে একগাদা দাড়ি। মাথায় বোঝা রুখু চুল। দেখে মনে হয় উকুনের বাসা। শকুনের বাঁ পায়ের হাড়, অমাবস্যায় মারা কালো বেড়ালের হাড়, গলায় দড়ি দেয়া দড়ির টুকরো, চাঁড়াল মেয়েছেলের হাড়, অপঘাতে মরা বাঁজা মেয়ের মাথার সিঁদুর, মাসিকের ন্যাকড়া—সব নিয়ে টিয়ে মেজদা যে কি করে না!

মেজদা গাছ চালাতে পারে। মানে গাছ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এ বিদ্যে কাঁযুর-কামিখ্যেয় শেখা। ভবঘুরে লোক তো। টই টই করে দেশ ঘোরে। ছ ছেলেমেয়ের বাপ। সে সব নিয়ে একেবারে হুঁশ-পব্বটি নেই। এই বাড়ি আছে তো এই নেই। বাড়ি থাকলেই সাইকেল সারানোর টুকটাক কাজ, তন্তোসাধনা। মদ গ্যাঁজা। চুল্লু। সে এক রই-কেত্তন। ভাঁটার মতো দুচোখ ঘুরছে। গায়ে গ্যাস। রোজ দিন চান করে না। বলে ভর নেমেছে। ওর নাকি পোষা ভূত পিশেচ আছে। গায়ে কি বোটকা গন্ধ মেজদার! আর তার বড় ছেলেটাও হয়েছে তেমন। বাড়ি থাকে না। হাওড়ার পোলের নিচে কোতায় কোতায় নাকি জঞ্জাল ঢিবি করা থাকে, তার পাশে শুয়ে থাকে। মাথায় চুল জটা জটা। গালের দাড়িতে ময়লা শুকিয়ে পাকিয়ে আছে। বছর কুড়িতেই মনে হয় কেমন বুড়োটে চেহারা। সেই বাবার মতো মদ, গ্যাঁজা, চুল্লু, তাড়ি, পাতাও খায়। কোনো নেশা বাকি নেই।

হাওড়ার পোলের কাছে ময়লার ঢিবির পাশে ছাড়াও রেল লাইনে দাঁড়ান মালগাড়ির পেটের ভেতর হাত-পা ছড়িয়ে শোয়। কখনও জেলখানায়। তা বার চার পাঁচ ঘোরা হয়ে গেছে এর মধ্যে জেল, হবে না! কোমরে ম্যাশিন থাকে। ফট ফট চালিয়ে দেয়।

এই তো ছোট বোন কামিনীর বিয়ের সময়ে। বিয়ের রাত্তিরে আমরা সবাই পাশাপাশি শুইছি। তো মেজদা মহাদেব শিউলির বড় ছেলে জিতেন্দ্র শিউলির কোমর থেকে ম্যাশিন আলগা হয়ে গড়িয়ে মাটিতে। জিতেন্দ্রবাবুর তো সে সবে খেয়াল নেই। খাসির মাংস দিযে খানিকটা বিলিতি হয়ে গেছে। ওপাশে, বাগানের ওধারে বাপ টানছে কালির নাম করে। এদিকে ছেলে। কেউ কম যায় না।

আমি বাগানে পেচ্ছাপ ফিরতে যাব। রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। দেরিতে খাওয়া হয়েছে। তারপর একগাদা বাসন কোসন আলগা আছে। সে সব মনে করে উঠতে যাব—ওমা, দেখি কালো মতো কি একটা। এতো টি বি তে দেখিচি। সিনিমাতেও। এরে তো ম্যাশিন বলে। নাকি মেশিং? পিস্তল। হাতে তুলে দেখতেই হাত থর থর। যদি গুলি বেরিয়ে যায়! পাশে শুয়ে ছিল সেজোমাসির ছেলে পিন্টু। সেও ভেটকে পড়েছিল। আমার হাতে মেশিং দেখে বলল—ওরে, রেখে দে। রেখে দে। উড়ে যাবি।

জিতেন্দ্র তখন আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরছে। ঠাণ্ডা, কালো, ভারী ঐ জিনিসটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে—

ওমা, দূরে ব্যাঙ ডাকছে। কট কট কট কট। কামদেব শিউলি শুনতে পেল। ব্যাঙের ঠ্যাঙ ঠিক যেন মুরগির পা। এখন আর পাওয়া যায় না। বাবা তো মরে গেল। গড়িয়ার

শ্মশানে আমরা পুড়িয়ে এলাম বাবাকে। মরার আগে বাবার কি হাগা! কি বমি! বাপরে বাপ! তার গ্যাস কি! বাবা তখনও সোম্‌সারে নিজের বিড়ির খচ্চা বাদ দিয়ে কুড়িটা ট্যাকা ধরে দ্যায়। আমি যেমন এখন এগারো টাকা দি। ছ টাকার কয়লা। পাঁচ টাকার মশলা। বড়দা যখন এক সঙ্গে থাকত—এক বস্তা—আশি কেজি চাল কিনে দিত ফেমিলির জন্যে। নিজেরা মাগ-ভাতার। নিজের দুই ব্যাটা। সেই ন্যাপালির বউ। আর ন্যাপালির ছেলে। সব মিলিয়ে পাঁচটা পেট, তাদের দুবেলা গেলন। দেড়মাস নিশ্চিন্দি আটশো টাকায়। সেখানে আমার মা পঁয়তিরিশ দেয়। রোজ।

মা—সুন্দরী কয়াল লেক মার্কেটে সবজি নিয়ে যায়। রোজ ভোর তিনটেয় ওঠে। বাড়ি ফেরে বেলা চারটেয়। মা লেকাপড়া জানে না। কিন্তু একশো, পঞ্চাশ, দশ, কুড়ি, পাঁচ, দুই, এক—সব নোট চেনে। পয়সা বোঝে। সেই মা বেলা চারটেয় বাড়ি এসে পরশু দিন ভাত খেল শুধু পটল ভাজা দিয়ে।

বাড়িতে ছোট বোন, বোনাইয়ের নেমন্তন্ন ছিল। সেজদার বৌ—এমন খচড়ির খচড়ি, বলব কি—বলতে গেলে খিস্তিখাস্তা বেরিয়ে আসে, সে মেয়েকে তো দেখে আমিই ঘরে নিয়ে এলুম। সে কি না মাকে খালি দিল ভাত আর পটল ভাজা!

বাড়িতে খাসির মাংসের তরকারি হয়েছে। ক্যাংড়ার তরকারি। ছোট বোন-বোনাই, বোনের ছেলে-মেয়েরা সব পেট টিপ করে খেয়েচে! সেকেনে মায়ের জন্যে শুধু ভাত আর পটল ভাজা। কেন মায়ের জন্যে একটু আলু সিদ্দ দাও। নয়ত আলু ভাজা কর। আর একটু ডাল। আমার মা কি-ই বা এমন খায়! খায় তো এই ক-টা ভাত। পেট মরে গেচে এই বয়েসে। মা তো প্যাঁজ, রসুন, মাংস, ক্যাংড়া খাবে না। আদাটা খাবে। গরম মশলা খায় না। দালচিনি খায় শুদু। সেই মাকে খালি পটল ভাজা ভাত!

আমার বাবা কেষ্ট শিউলি বলেছিল—দ্যাখ বাবা, শিমুল ফুল যকন লাল হয়, ত্যাকন ক্যাংড়ায় ঘি আসে। এখন—এই বর্ষায় ক্যাংড়া তো বাচ্চা ছাড়ছে। তেল নেই। কেমন যেন কাট কাট। তবু সেই ক্যাংড়ার ঝাল।

মা চোকির জল মুচতে মুচতে বলল, বাবা কেটুরে—মা আমায় কেটুরে বলে। বাবা কখনও কখনও বলত, কানদেব। তো মা আমায় বললে, কেটুরে রে—আমার দুক্ষু সারা জেবন। ঐ টিপ কপালি মাগি—আমি আর পারি না কেটুরে—এই বয়েসেও রাত থাকতে উটে সবজির বোঝা নে—সেজোখোকা ক্যামন ঝ্যান হয়ে গেল বে-র পর। শ্বশুরবাড়ির কতায় ওটে বসে।

কিন্তু আমার পালার কি হবে! যে পালার গোড়ায় মহিষাসুর নেত্যগীত শুনচে আর মাল খাচ্চে!

ভাবতে ভাবতে কামদেব আবারও বাইরে ব্যাঙের ডাক শুনতে পেল। ব্যাঙের ডাক তো শুনছি। কিন্তু বিষ্টি নেই। কি গরম! উফ! বাপ রে বাপ!

মহিষাসুর তো বসে আছে রাজসভা আলো করে।

আহা, আমি কতবার গো অ্যাজ ইউ লাইকে অসুর সেজিচি। নকল গোঁফ। মোটা, লম্বা জুলপি। একবার কুটো রুগী হলাম। পাকা কলা, আলতা, গায়ে মাখা সাবান জলে নরম করে ঘা, পুঁজ. রক্ত ফোটালাম সারা গায়ে পায়ে। আর একবার বুড়ো ভিকিরি। মাথার মাঝখানের চুল কামিয়ে ফেললাম। বাঁ গালে একটা বড় আঁচিল। বাকি চুলে রাস্তার ধুলো। সারা গায়ে পায়ে ধুলো। হাতে লাঠি। ভাঙা বাটি। সে সব ছবিও তোলা আচে আমার কাচে।

কিন্তু আমার পালা! সে তো এগোতে হবে। আচ্ছা, লিখি এবার—

(রক্তাসুরের প্রবেশ)

রক্তাসুর—প্রণাম মহারাজ।

মহিষাসুর—আয়ুষ্মান ভব।

'আয়ুষ্মান ভব' বলবে কি? মায়ের টাকায় কেনা শাদাকালো টিবিতে মহাভারত দেখে 'আয়ুষ্মান ভব' শিকিচি। কিন্তু মহিষাসুর এমনটা বলতে পারে কি? আমার বাবা রিকশা চালাতে চালাতে বকবক করত পেসেনজারের সঙ্গে। গল্প বলত আমাদের। মহাভারত, রামায়ণ, শুক-সারি—বাবা রিকশা চালাত আর বকে যেত। অন্য সময়ে গল্প করত আমার সঙ্গে।

(সখীদের গান)

জয় জয় জয় রাজেন্দ্র

মুখ শোভা যেন পূর্ণচন্দ্র

দেহের কান্তি ভানুর ভাঁতি।

আচ্ছা, ভানুর ভাঁতি শব্দটি কি হয়!

আমি মাধ্যমিকে বেক পাওয়া চব্বিশ বছরের কামদেব। এখন আমি কী করব?

বাবা—ও বাবা, আমি কি করব বল তো? তুমি বলে দাও। পালাটা এটকে গেচে। ব্রহ্মপুর বটতলা বাজারে যেখানে রাস্তার ওপর মশলা সাজিয়ে বসি, সেখানে সামনে একটা বড় গাড্ডা। সেই গাড্ডায় গাড়ির চাকা পড়লেই জল ছেটকায়। কাদা। সেখানে বসে পেপার পড়ি আর পালার কথা ভাবি।

অ কেটুরে, খাবি না? খেয়ে শো বাবা। মা ডাকে।

ওমা, তোমার বাবা সুন্দর কয়াল তো ভেড়ির লেঠেল ছিল। বাবাও ভেড়ি থেকে ভাঙন, পারসে, ক্যাংড়া আনত। মা-ও ভেড়ির মাচ আনত। তো সেই সব ভেড়ি আর এখন নেই। দাদু যার লেঠেলি করত, সেই মন্মথ কয়ালও বেঁচে নেই। সবাই তো একদিন মরে যায়। এই যে বাবা পয়লা বোশেখ রাজহাঁস কেটে খাওয়াবে বলে দিদিদের নেমন্তন্ন করল—এক একটা হাঁস মাসে পনের কুড়িটা করে ডিম দিত। কি বড় বড় ডিম। একটা ভাতে দিয়ে, নুন লঙ্কা ডলে এক থালা ভাত সাবাড় হয়ে যায়। সেই দিনই বাবা মরে গেল।

অ কেটুরে, রাত হল বাবা। কি অ্যাতো ছাই পাঁশের নেকা! তার চে মশলায় মন দে। মশলা করে মেজোজামাই একন ক্যামন বড়নোক!

আচ্ছা মা, বড়দা তো ইস্কুল ভ্যান চালায়। মেজদারে সাইকেল সারানোর কাজ কে

শেকালে ?

ক্যান রে—সে খোঁজে তোর দরকার কি ?

না, এম্নি।

নিজে নিজেই শিকলে।

আর ফুঁকফাঁক ?

সে ওর গুরু গুণিন, রোজা আচে।

এত ফুঁক মারে—মাল খেয়ি আমারে মুক-খিস্তি করে—এদিকে বড় ছেলে তো মেশিংবাজ। পর পর তিন মেয়ে। কুদঘাট বাজারে সবজি বিক্কিরি করে মেজোবৌদি। দাদা গাচ চালান দ্যায়। ফলন্ত আম গাচ, নারকেল গাচ বান মেরি মেরি মেরে ফ্যালে। নারকেল গাচের গুঁড়ি উড়োয়ে নিয়ে যায় কাঁয়ুর-কামেখ্যার মন্তরে, তারে ঘর বেঁদি থাকতি হল বলরামপুর দখিন পাড়ায়, বাগানের ভিতরি। টালিখোলার ঘর। বেড়ার দ্যাল। মাটির মেজে।

ওসব বলতি নেই বাবা। অনেক মন্তর জানে মহাদেব। এই তো আমাদের পুকুরঘাটে যে খেজুরের গুঁড়ি—

ও তুমি কি বলবে আমি জানি। আমরা শিউলি—জাত ব্যবসা গাছ কেটে রস বের করা। তা গোটা তিনেক খেজুর গাছ ছিল বাগানে। তার ভেতর সব চেয়ে পুরনো, সরেস মদ্দা গাছটারে দিয়ে বাবা পুকুর ঘাটের ধাপি করল। তো একদিন মেজোবাবু বাবার ওপর রেগে মেগে সেই কাটা গাছটারেই উড়োয়ে দিলে। দিলে তো দিলে, ঘাট লোপাট—কিন্তু সেই যে ওড়া, তা দেকেচে কেউ!

ওসব কি দেকা যায় বাবা! নাকি দেকা কত্তব্য ?

কেন নয় ? এই যে বাবা বনহুগুলির জয়েনপুর, ডিঙেলপোঁতা—সেখানে আমাদের আদিবাড়ি— সেখান থেকে ডেমরে কলার মোচা, থোড় আনত। পরে শুনেচি সে সব নাকি কাকাদের থেকে চেয়েচিন্তে আনা—তুমি জিগ্যেস করলে বাবা বলত—ওসব আমাদের জমির। কিন্তু বলার সময়ে বেশ গম্ভীর থাকত। আমি তকন অত বুজতাম না। বাবার আনা ভেড়ির মাচ, ডেমরে কলার থোড়, মোচা, কয়েতবেল—সবই তো আমরা খেয়িচি। তো বাবা এসব কি করে আনত, সে সব জানাও কি আমাদের কত্তব্যের মধ্যে ছিল ?

তুই বড্ড ঠ্যাঁটা তককো করিস বাপু। নে, রাত হল। ওসব পালা ফালা রাক। শো। কাল কি শুকো মাচ আনতে যাবি ভোরে ?

না, ফুলেশ্বর যাব সামনের হপ্তায়।

শিয়ালদা থেকে শুকো মাচ এনে বিককিরি করে কেউ, শুনেচি এরকম!

ও পড়তা পোষায় না। শিয়ালদায় দিঘার মাল আসে। আমি আনি দক্ষিণ বারাসাত থেকে। নয়ত ফুলেশ্বর। ওখান থেকে মাল নিয়ে ট্রেনে উটে—তারপর বাস। তাও কি ঝামেলা কম! শুকো মাছ আনতে গেলে গ্যাস ছড়ায় বড্ড। বাবুরা, বৌদিরা সব নাকে কাপড়। ইংরিজি গালাগাল—

সেজন্যে তো ব্যাগ বানালি বাবা পাঁচশো ট্যাকা দে। পেলাস্টিকের বড় ব্যাগ। চারপাশে চেন দেয়া। সে ট্যাকা তো একনও পুরো শোদ দিস নি বাপু। আমি ধার দিলাম যে।

দেব। দেব। আরও একটু পুঁজি বাড়ুক। বলেই কামদেব শিউলি শুনতে পেল অন্ধকারে উঠোনে রাজহাঁস ডাকছে। আহা, কি রাজহাঁসই ছিল আমার বাপ কেষ্ট শিউলির আমলে। আহা, কোঁয়াক, কোঁ-য়াক। কোঁ-য়াক। কি গম্ভীর ডাক! পায়ে পায়ে ঘুরত, যেন পোষা কুকুর। অচেনা কাউকে বাড়ির হাতার ভেতর একবার দেকলে হল। মাথা নিচু করে তেড়ে যাবে। আর যকন পুকুরে সাঁতার দিত! ওমা, জলের বুকে কি তার শোভা গো। আহা, যেন চাঁদ উটেচে। ফুল ফুটেচে। শাদা হাঁস একখানা আয়না বসান পুকুরে। যেন মা সরস্বতীর পায়ের কাচ থেকে উটে এল গো। আমরা তো বাড়িতে অমনি সরস্বতী পুজো করি ফি বচর। মায়ের পায়ের কাচে মাটির নীল ধাপিতে শাদা রাজহাঁস। হাঁস তো নয়, সত্যিই রাজা। কি তার গলা! কি তার ঠোঁট! আর পাখনাই বা কি! সবেরই কি বাহার! কি বাহার!

মাটির হাঁস জ্যান্ত হাঁস সব এক হয়ে যেত।

ঐ যে অঘ্রাণে মা ঘরের লক্ষ্মী বাইরের লক্ষ্মী পুজো করে। গোয়ালঘরের ধারে গোরুর গোবরে তৈরি বাইরের লক্ষ্মী—যাকে কিনা বাবুরা অলক্ষ্মীও বলে, তৈরি করে ভাঙা কুলো বাজিয়ে বাজিয়ে মুকে প্যাঁকাটির তির গুঁজে বিদেয় করা হয় ঘর, বাড়ি, উঠোনের বাইরে। তখন কালিপুজোর বাজি আকাশে নতুন নতুন তারা, নয়ত আলোর ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চায়। আর আমরা সরস্বতীর বোন লক্ষ্মীর আলো করা মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটা ফল, নারকেল নাড়ু খাই। তো দুই বোনে চেহারায় অ্যাতো মিল! কিন্তু বাহনে—না বাপু, কোনো মিলই নেই। আহা, সরস্বতীর রাজহাঁসটি—সে তো রাজাই। সত্যিকারের রাজা।

উঠোনে আবারও গম্ভীর হংসধ্বনি।

আমার হাতের কাছে কুঁড়ো নেই। ধান নেই। যা ছড়িয়ে আমি ডাকব—আ—চই চই। চই চই। আ, আ। চই চই—

আকাশে চাঁদের ফিকে আলো। বেড়ার দেয়ালে তার পড়ে থাকায় আলো-অন্ধকারে খানিকটা যেন নকশি কাঁথা বোনা হয়ে গেছে।

কামদেব দেখতে পাচ্ছিল উঠোনে একটি নয়, ছ-ছটি রাজহাঁস।

তোরা সবাই ফেরত এলি! কেমন করে এলি রে, আহা, তোরা যে সব আমার বাপের আমলের। বাবা তখন বেঁচে। তোদের কত আদর!

আমি তকন খুব ছোট। মা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে দিয়ে ধান ভাঙে। আমাদের বাড়ি ঢেঁকি ছিল। তাল গাছের গুঁড়ির ওপর লম্বা, ভারী বাবলা কাঠ। তার মুখে শাল কাঠের লম্বাটে, ওজনদার ভাঙার জিনিসটি। সেই শাল কাঠের ভাঙাই করা জিনিসের মাথায় লোহার চাকা একখানা। তাকে কি যেন বলে? কি যেন বলে—ভাবতে ভাবতে কামদেব মাথা চুলকোল। ও, মনে পড়েছে, গুলো।

মাটির গর্তের ভেতর খোয়া ভাঙার চৌকো পাথর পাতা একখানা। তার ওপর চাল নয়ত ধান। সেই ধান বা চালের গায়ে গুলো লাগান কাঠ পড়ছে পায়ের চাপে। ঢেঁকিতে পারা দিতে দিতে মা গুন গুন করে গান গাইচে।

ছটা হাঁস কামদেবকে ঘিরে নাচছে। তাদের হলদে ঠোঁট, শাদা গলা, ডানা, হলুদ হলুদ

পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছে কামদেব। গলা উঁচু করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাঁসেরা ডাকছে—কোঁ-য়াক। কোঁ-য়াক।

ওরে, তোরা ফিরে এলি কি করে রে বাবা! বাবা মারা যাওয়ার পর ছেরাদ্দ মিটতে না মিটতেই বড়দা বলল, বাবার কেনা হাঁস—সমান ভাগ হবে। আমার তখন আরও কম বয়েস। অত কতা জানি না। বলতে পারলুম না, বাবা তো আমায় একজোড়া রাজহাঁস কেনার টাকা দিয়েছিল। আমি তো নর-মাদা ভালো করে জোড় খাইয়ে, বাচ্চা তুলে এক জোড়া থেকে তিন জোড়া করলাম। একন তোরা বলচিস ভাগ চাই। যখন ভাত, কুঁড়ো খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলাম, তকন তোরা ছিলি কোতায়? একন বড় মালিকানা মারাচ্চিস। ভাম, শ্যাল, কটাশ—সবার হাত ঠেঙে বাঁচাতে হয়েচে। খোঁড় করিচি। রোজ ভোরে খোঁড়ের দরজা খোলা। পুকুরে নামান। হাঁস তোলা—সে তো বাপু তোরা করে দেকলি না। আর একন ভাগ চাইচিস! এ তো আমার ভ্যান-চালান বড়দা—জয়দেব শিউলির বুদ্ধি নয়কো। এ তো সেই ন্যাপালির বউয়ের বেরেন।

ছটি রাজহাঁস তুমুল জ্যোৎস্নায় কামদেব শিউলিকে ঘিরে নাচছে।

আহা! যদি ছবি তুলে রাকা যেত এদের। ক্যামেরা থাকলে—না, সে হবার নয়। গরিবের কিচুই হয় না। কিন্তু বড়দার সেই তাল তো আমি ধরে ফেলেচিলাম। ভেতরে ভেতরে খপর নিয়ে জেনিচি বিবেক ভারতী ইস্কুলে একটা ছোট চিড়িয়াখানা হবে বাচ্চাদের জন্যি। সেকেনে খরগোশ, গিনিপিগ, শাদা ইঁদুর, টিয়া, বদরি, চুনিয়া-মুনিয়ার সঙ্গে রাজহাঁসও থাকবে এক জোড়া।

সেই চিড়িয়াখানা থেকে বড়দা দর পেয়েচে। দুটো হাঁস আড়াইশো।

আমি বড়দাকে বললাম—তুই খোঁড় কর, হাঁস দেব।

বড়দা খপর দিল একদিন—খোঁড় হয়ে গেচে। হাঁস দে যা। হাঁসা হাঁসি মিলিয়ে দিবি।

আমি তো বড় ব্যাগে হাঁস ভরি সাইকেল নে গিচি। বলি, খোঁড় কই তোমার, দেকি!

বড়দা বলে, সে হবে। তুই হাঁস দে যা তো আগে।

আমি বললুম, আগে খোঁড় করে খপর দিস। তারপর—বলেই সাইকেল নে পোঁ পাঁ। বাড়ি এসি মনটা অ্যাতো খারাপ হয়ে গেল, মায়েরে বলে দিদিদের বোনদের ডেকে সব হাঁস দে দিলুম। একেবারে রাতারাতি।

কিন্তু সেই সব হাঁসেরা একন একেনে কেন?

ও বাবারা, কি মতলব তোদের বল তো!

কামদেবের কথার উত্তরে ছটা হাঁসই ডান ঝাপটে শক্ত পায়ের ও্পর ভর দিয়ে নেচে উঠল। তাদের গলায় গান।

কামদেব বলল—বাবারা, আমার পালা লেকা আচে। কাল ভোরে উটে মশলা নে ব্রহ্মপুর বটতলা বাজারে বসতি হবে। একন কি নাচ-গানের সময়?

রাজহাঁসের মধ্যে যার চেহারা সব চে ভালো, তার ঠোঁটে লম্বা মতো লাল কাপড় জড়ানো কি একটা বই মতো।

মুখ থেকে সেই লাল কাপড় জড়ানো পুঁথি নামিয়ে রাজহাঁস বলল, এই পুঁথি তোমার

মা পাঠিয়েছে।

মা! মা কে?

কেন! মা-সরস্বতী—বলেই সেই সুন্দর মতো হাঁসটি লাল কাপড়ের মোড়ক হলুদ ঠোঁট দিয়ে খুলে ফেলল।

ফিকে জ্যোৎস্নায় কামদেব দেখতে পেল সেই লম্বাটে বইয়ের গায়ে গোটা গোটা অক্ষরে পষ্ট লেখা আছে—কামদেব-পুরাণ।

সাবধানে বইটি হাতে তুলে নিল কামদেব। পাতা ওলটাল।

প্রথম পাতায় লেখা—আমি শ্রী কামদেব শিউলি, পিতা ৺কৃষ্ণ শিউলি, গ্রাম বলরামপুর, নতুনহাট, নাড়ুপাড়া। অদ্য আষাঢ় মাসের তিন তারিখে নিজের জীবন কাহিনী ও তৎসঙ্গে মহিষাসুরমর্দ্দিনী পালা লিখিতে বসিয়াছি......।

জ্যোৎস্নায় রাজহাঁসেরা খুব আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে যাচ্ছিল।

বসুধারার স্মৃতি

মানকুণ্ডুর ব্যানার্জি পাড়ার নতুন নাম হয়েছে শম্ভুর মোড়। মানকুণ্ডু স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় শম্ভুর মোড় পেরিয়ে ব্যানার্জি পাড়ার বেশ ভেতরে উদয়ন সংঘ ক্লাবের কাছে যেতে ভাড়া পাঁচ টাকা। কখনও কখনও ছ টাকাও দিতে হয। নতুন মুখ দেখলে রিকশা চালান মানুষটি হঠাৎই আট টাকাও চেয়ে বসতে পারে। তখন দর করতে হয়। শুদ্ধেন্দু হিসেব করে দেখেছে নাকতলা থেকে মানকুণ্ডু আসতে পাক্কা তিন ঘণ্টা লাগে। তাও পর পর সব কিছু পেয়ে গেলে। নয়ত সোয়া তিন বা সাড়ে তিন ঘণ্টা।

অমিত ফোনে বলেছিল গল্পের আসরের কথা। খুবই ঘরোয়া করে হবে। মনীশদা এসেছেন আমেরিকা থেকে। উনি একটা নতুন গল্প লিখেছেন। সেটা পড়ে শোনাবেন। তার সঙ্গে অন্যরাও কেউ কেউ পড়বে। এ ছাড়া গান, আবৃত্তি। আড্ডা।

কোনখানে হবে বল তো ?

ঐ বেশোহাটায়, বসাকবাড়িতে। কাছেই গঙ্গা। তুমি এসেছিলে তো আমাদের পিকনিকে ?

না, আসিনি। তখন কলকাতা বইমেলা চলছিল না।

ও হ্যাঁ। তুমি তো বলেই ছিলে। বইমেলা, তাই পারবে না। টেলিফোনের ওপার থেকে অমিত মারিকের ভরাট গলা ভেসে এল।

শুদ্ধেন্দুর মনে পড়ল অমিত আমার থেকে বছর ছ'সাতের বড়। তা হবে বাহান্ন তিপান্ন। তবু তাকে নাম ধরে ডাকি। অথচ নিযম মতো তাকে দাদা বলা উচিত।

তা হলে আমরা শিওর রইলাম তুমি আসছ। ফোনের ওপার থেকে উড়ে আসা অমিতের গলায় মিছরির দানা ভাঙল।

হ্যাঁ যাব। তবে জায়গাটা একটু বল।

ঐ তো বললাম, বেশোহাটা। বসাকবাড়ি। পাশেই তেলিঘাট। গঙ্গা। আর আছে 'আকাশগঙ্গা' নামে একটা বাড়ি। ঐ বাড়িটা বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতেতে ভাড়া দেয। জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। তুমি তো হেঁটেই আসবে ব্যানার্জিপাড়া থেকে ?

হ্যাঁ। আসলে শাশুড়ি এখন আছেন এখানে। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে তারপর যাব। কটা থেকে আসর ?

বারোটায় চলে এস না। ওখানেই খাবে দুপুরে। মনীশদাই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করিয়েছেন।

শুদ্ধেন্দুর মনে পড়ল বছর সাতেক আগে চন্দননগরের অমিতরাই ওদের গল্পসভার পক্ষ থেকে সভা ডেকে তাকে প্রথম পুরস্কার দেয়। সেই আনন্দ ভোলা যাবে না। তারপর অনেক পুরস্কার সংবর্ধনার ঢেউ সেই আনন্দের ফেনাকে একটুও দূরে ঠেলে দিতে পারেনি।

মনীশদাকে আমি কখনও দেখিনি। আলাপও নেই। অথচ উনি তো তোমাদের দুটো বাকি পুরস্কারের একটা নিয়মিত দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

খুব ভালো মানুষ। সাহিত্যপ্রাণ। আসছ তো! আলাপ হয়ে যাবে।

যাব।

তাহলে ছাড়ি!

আচ্ছা।

ভালো থেক।

তুমিও।

শাশুড়ি স্নেহলতাকে নিয়ে শুদ্ধেন্দু ভাদুড়ি পৌনে নটায় বেরিয়েছিল তার বাড়ি থেকে। মানকুণ্ডুর উদয়ন সংঘের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে বারোটা বাজতে পাঁচ।

দুই শালা বছর তিনেক হল নতুন বাড়ি করেছে মানকুণ্ডুতে। ব্যানার্জিপাড়ার এদিকটা এখনও বেশ ফাঁকা। সামনেই বড় একটা পুকুর। সেখানে এখনও পানকৌড়ি নামে। সন্দেশ, রসগোল্লা, গ্লাসের জল, হরলিক্স, বিস্কুট—পর পর সব ভেতরে নিতে নিতে ঘড়ি দেখল শুদ্ধেন্দু। অমিত বলেছিল, বারোটায় আরম্ভ করে দেব। আর দেরি করা যাবে না।

বাইরে রোদ একটু একটু করে চড়ে যাচ্ছে। সবে মার্চের বারো। কিন্তু কি রকম গরম পড়ে গেল এখনই।

আপনি কি রিকশায় যাবেন বেশোহাটার তেলিঘাট? বড়শালার বউ সোনালী জানতে চাইল।

না। না। হাঁটব।

এই রোদ্দুরে হাঁটবেন। ছাতাও তো আনেননি। একটা ছাতা নিয়ে যান।

না ছাতা লাগবে না। রোজই নিয়ে বেরোই। আজ ভেবেছিলাম ছায়া থাকবে। সকালের দিকে তো মেঘলা ছিল।

তা হলে টুপি নিন।

না, না, টুপি কী হবে!

ছাতা না নিলে কষ্ট হবে বাবা। খুব আস্তে আস্তে বললেন স্নেহলতা।

না, চলে যাব ঠিক। বলেই শুদ্ধেন্দু উঠে দাঁড়াল।

বিকেলে আসবে তো বাবা! এখানে রাতে থেকে কাল যাবে।

না, থাকা হবে না। রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছি। তাছাড়া অনিমা অফিস বেরিয়ে গেলে পুপু একা একা থাকবে। সবে উঠেছে ম্যালেরিয়া থেকে।

বিকেলে আসবেন না তা-লে।

নারে, আবার আসব। বলতে বলতে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল শুদ্ধেন্দু।

পারবেন তো যেতে? সোনালী জানতে চাইল।

এই তো সোজা রাস্তা। খানিকটা গেলে সামনে ছোট মন্দির পড়বে একটা। একটু এগোলে ডান দিকে ঘটকবাড়ি। তারপর জি টি রোড। সূর্য মোদকের মিষ্টির দোকান। বাঁ দিকে গেলেই জ্যোতির মোড়। তারপর আবার ডানদিক। সেদিকেই তো বেশোহাটা। গঙ্গা। তেলিঘাট।

বাবা, সব মুখস্ত আপনার!

ঐ হেঁটে দেখে দেখে হয়েছে। আচ্ছা, এবার তা-লে যাই।

এস বাবা।

আসবেন আবার।

আবার এস মশাই। শুদ্ধেন্দু দেখল বড় সম্বন্ধীর ছেলে টুবাই। এতক্ষণ ও ঘরে বসে পড়ছিল। সামনে অ্যানুয়াল। বড় শ্যালক তার অফিসে। রোববারেও ছুটি নেই। ছোট শালা ফ্যামিলি সহ খড়্গপুরে পোস্টেড।

আসব—বলতে বলতে শুদ্ধেন্দু রাস্তায়।

সোজা রাস্তা ধরে খানিকটা এগোলেই ঘটকবাড়ি। বিশাল বাড়ি। পর পর বন্ধ দরজা। বউ দেউড়ি। ঢাউস ঢাউস জানলা। বেশিরভাগই বন্ধ। জানলার মাথায় চুনবালির ডিজাইন। এ পাশে ও পাশে গজিয়ে ওঠা বট-অশ্বত্থের চারা। তাদের কচি পাতায় রোদ্দুর। হঠাৎ দেখলে কেমন যেন গা শিরশির করে।

এ বাড়ি তো এক দিন জেগে ছিল। লোকজন আলো হাসিতে গমগম গমগম করত। নিশ্চয়ই বড় গাড়ি এসে দাঁড়াত। পুজো। উৎসব। খাওয়াদাওয়া। আজ কিছু নেই। শুধু বাড়িটা আছে। আর কিছু স্মৃতি।

ঘটকবাড়ির উল্টোদিকে পুকুর। তার বুকে রোদের আঁচল। কত লোক ছিল এ বাড়িতে। আজ কেউ নেই। এমন করেই সব মুছে যায় সময়ের চাপে। আমিও একদিন থাকব না। অথচ চারপাশ প্রায় একই থাকবে—ভাবতে ভাবতে ছেচল্লিশ ছোঁয়া শুদ্ধেন্দু ভাদুড়ি কপালের গায়ে জেগে ওঠা ফিনফিনে ঘাম মুছল।

রাস্তা তেমন চওড়া নয়। তার ওপর ধুলো। সেই ধুলোর গায়ে কারা যেন এলোমেলো খই ছড়িয়ে চলে গেছে। রাস্তার গুঁড়ো মেখে সেই সব পলকা শাদা খই অনেকটাই ময়লাটে। ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়া এমন খই দেখলেই শুদ্ধেন্দু 'বল হরি হরি বোল' শব্দটি পরিষ্কার শুনতে পায়। তারপর এক সময় মনে হয় তার সারা গা থেকে খই উড়ে উড়ে মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়। উড়তে উড়তে খইয়েরা বলছে, টুকি। টুকি। ধরতে পারে না। ধরতে পারে না—

শুদ্ধেন্দুর মনে পড়ল ছেলেবেলায় থালায় করে কোনো কিছু নিয়ে খেতে বসার পর বাড়ির বাতাসে 'বল হরি হরি বোল' ঢুকে পড়লেই মা বলতেন, থালার নীচে জল ঢাল।

কেন বলতেন?

মাকে তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। আজও জানা হল না এই রহস্য। কেন 'বল হরি হরি বোল' বলে মড়া নিয়ে গেলে পাতের নীচে জল দেয়!

কোনোরকমে ব্যানার্জি পাড়ায় শ্বশুরবাড়ি ছুঁয়ে এই যে বেশোহাটার বসাকবাড়ি যাওয়া—গল্প শুনতে সাহিত্যের আঁচ নিতে, এও কি সেই ধুলো পায়ে ঠাকুর দর্শনের মতো? সেই কোন ছোটবেলায়, পুরী, কাশী বা তারকেশ্বর গেলে মা বলতেন, চলো সবাই। ধুলো পায়ে দর্শন সেরে আসব।

তখনও পায়ে রাস্তা, ট্রেনের ধুলো। কোনোরকমে ধর্মশালায় মালপত্র, বেডিং, বোঁচকা নামিয়ে মা দৌড়তেন দেব-দর্শনে। এতে নাকি পুণ্য বেশি। বাবা অনেক সময় বিরক্ত হতেন। কিন্তু মা নাছোড়। থাক, পথের ক্লান্তি। ধুলো পায়ে বিগ্রহ, মন্দির দেখার ব্যাপারটাই নাকি অন্যরকম। তারপর যদি সেই তীর্থে তে-রাত্রি বাস করা যায়, তাহলে তো কথাই নেই।

জ্যোতির মোড়ে পৌঁছে ডান দিকে ঘুরতেই বেশোহাটার রাস্তা। বারোই মার্চের সূর্য মাথার ওপর থেকে অনেকটা আগুন এক সঙ্গে ছুঁড়ে দিচ্ছে পৃথিবীর দিকে। হাঁটলে ঘাম হয়। দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করতেই বসাকবাড়ির রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল।

ফোনে অমিত মারিক বলেছিল, বাড়িটাতে স্কুল ছিল এক সময়। অনেকটা জায়গা। শেষে কি এক গোলমালে উঠে গেল স্কুল। তারপর এক সময় বিয়ে-পৈতেতেও ভাড়া খাটত। এখন তাও বন্ধ।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটা গলি। ডান দিকে মোড় নিয়ে কিছুটা গেলেই গঙ্গায় যাওয়ার রাস্তা। আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকে এগোলে বসাকবাড়ি। ঐ তো নীলের ওপর হলুদে লেখা গল্পসভা। যেমন প্রত্যেকটা আসরে হয়। যে বাড়িতে বসে, তার বাইরে টাঙানো থাকে।

এই তো শুদ্ধেন্দু, এস। অমিতের গলা পরিষ্কার শুনতে পেল শুদ্ধেন্দু।

শুদ্ধেন্দু তার বাঁ হাতের তিরিশ-একত্রিশ বছরের পুরনো এইচ এম টি-তে সময় দেখল। বারোটা পঁয়ত্রিশ। দম দেয়া অর্ডিনারি ঘড়ি। শাদা বড় ডায়াল। ১৯৬৯ সালে পৈতেতে পাওয়া। তখন বোধহয় নব্বই টাকার মতো দাম ছিল। পিসিমা দিয়েছিলেন।

অমল মারিক বসেছিল শতরঞ্জির ওপর। পাশে সুভাষ, বিজিত। অন্যন্যা, সাগর, সুদর্শন, সাধনা, কুন্তল, শিবপ্রিয়, পারমিতা, কাবেরী।

শুদ্ধেন্দু দেখতে পেল দেয়ালের দিকে বেশ ফরসা, ভারী মুখের একজন মানুষ বসে আছেন। চোখে সোনা রঙের সরু ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখ। মাথার চুল বেশ কমে এসেছে। শাদা পাঞ্জাবির বুকের ওপর অনেকটা কাজ, ঐ শাদাতেই। আর পায়জামাটি সরু পায়ের, শাদা টেরিকটের।

আসুন ভাই, নমস্কার।

শুদ্ধেন্দু দু হাত জোড় করে মাথা সামান্য নোয়াল। তা হলে ইনিই মনীশ চৌধুরি। আমেরিকায় থাকেন। খুব আড্ডাবাজ, সাহিত্যপ্রাণ মানুষ। যেমন অমিত বলেছে।

বসুন ভাই। মনীশ চৌধুরি শুদ্ধেন্দুকে শতরঞ্জি দেখিয়ে দিলেন।

সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। ডান দিকে গঙ্গা। ওপারে গাছপালা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার দেখা যায়। নদীর জল ছুঁয়ে নৌকো চলেছে একটা দুটো। বাড়িটা বেশ। অনেকদিন রঙ, চুনকাম হয়নি। তাতে কী! এখনও বেশ শক্তপোক্ত। কত জায়গা।

আচ্ছা, এখানে যদি থাকতে পারতাম একমাস। বেশি কিছু না, একটা তক্তপোশ, মশারি আর একটা কেরোসিন স্টোভ। আর কী লাগবে! এক মাস থাকলে কত যে লেখা দাঁড়িয়ে যেত। নাকতলায় ভাড়া ঘরে জায়গা কই! একটা ঘরে সবটাই বইয়ে ঠাসা। এমনকি লেখার টেবিলও। ক্লাস নাইনের পুপুরই ভালো করে ছড়িয়ে বসে পড়ার জায়গা নেই।

মেয়ে বড় হচ্ছে, তার বন্ধুরা এলে বসতে দেয়ার জায়গাও নেই—অনিমা মাঝে মাঝে গজগজ করে।

কিছু করার নেই আমার। পুরো সময়ের লেখক হয়ে বেশিরভাগ লেখাই যে সব কাগজে লিখতে হয়, তারা পয়সা দিতে পারে না। আর সব চেয়ে বেশি টাকা যে কাগজটি দেয়,

তাতে আমি লিখি না। গত দশ বছরে সব জিনিসের দাম কয়েক গুণ বেড়েছে, কিন্তু লেখার পারিশ্রমিক, দক্ষিণা সে তুলনায় প্রায় কিছুই বাড়েনি। তাও পেতে কত দেরি। অপেক্ষাই শুধু।

আমার পাশাপাশি সমবয়েসের প্রায় সব লেখকদেরই মাস গেলে মোটা মাইনে। প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনক্রিমেন্ট, ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স। আমার ওসব কিছু নেই। শুধু লিখে যেতে হয়। কোদাল দিয়ে পথ কেটে কেটে একা একা এগানো। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো। কেউ কি পড়ে এসব লেখা! আমি মরে যাওয়ার পরও কেউ কি আমার লেখা পড়বে! রাস্তায় লুটিযে থাকা শ্মশানযাত্রার মলিন খই নিজের গা থেকে মাঝে মাঝেই ঝরে পড়তে দেখে শুদ্ধেন্দু ভাদুড়ি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে।

এ তো তোমার স্বেচ্ছা-আত্মপীড়ন। চাকরি তো তুমি পেয়েছিল শুদ্ধেন্দু। করলে না। জোর করে ফিরিয়ে দিলে। মুখের ওপর না বলে দিলে অনেককে। খবরের কাগজের মাইনে এখন বাচোয়াত, পালেকার হয়ে যাওয়ার পর বেশ ভালো। খবরের কাগজে চাকরি করে অনেকেই তো দিব্যি লেখে। তাছাড়া খবরের কাগজ মানেই যোগাযোগ, মিডিয়ার আলো। কত রকম সুযোগ সুবিধে। হাউস-এর লেখক হতে পারলে প্রতিভা থাক আর না থাক, শারদীয় সংখ্যায় বাঁধা ঔপন্যাসিক। তাতেও অনেক টাকা।

এ সব তো চাইনি আমি। চেয়েছিলাম ভালো লিখতে। এসব নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে বসাকবাড়ির চুন ওঠা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল শুদ্ধেন্দু। হারমোনিযাম বাজিয়ে গান গাইছে সুদর্শন। 'সার্থক জনম আমার...' .

কী সুন্দর গলা। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা হাওযা সুদর্শনের গানের বাণী, সুরে জয়মালা পরিয়ে দিচ্ছে। দেয়ালের গায়ে যেখানে তেল-সিঁদুরের মাঙ্গলিক চিহ্ন—বসুধারা মুছে গিয়ে ফ্যাকফ্যাকে শাদা দাগ শুধু, সেখানেও গঙ্গার হাওয়া বুঝি উলু দিযে গেল।

বাইরে একটা তিন বাঁকা নারকেল গাছের পেটে রোদ্দুরের ডোরাদার ডিজাইন। দূরে কোথায় একটা পাখি ডাকছে। এর মধ্যেই চা এল। সঙ্গে বিস্কুট। হাতে হাতে ধোঁকা ভাজা।

পলিথিনের বেঁটে কাপে চা। মাটির ভাঁড় কি ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি দেশ থেকে! ভাঁড়ের চায়ে অন্যরকম একটা গন্ধ জড়িয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে শুদ্ধেন্দু টের পায গঙ্গার বুকের হাওয়া আবার ছুটে এল বসাকবাড়ির বারান্দায়।

প্রথম গান ফুরিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়ের সুর সাধা হচ্ছে হারমোনিয়ামে। '—একি লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ...'

সুদর্শনের গলা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে জনা কুড়ি-বাইশ হবে। এই গল্পসভার যারা নিকটজন, তারাই। নিজেকে নিয়ে গল্পসভা পুরস্কার পাওয়া তিন গল্পকারকে দেখতে পেল শুদ্ধেন্দু। আমি ছাড়াও শিবপ্রিয় আছে। আর কুন্তল। কুন্তল তো বউ নিয়েই এসেছে।

একটা শাদা লঞ্চ বড় রাজহাঁস হয়ে দুলতে দুলতে গঙ্গার বুক বেয়ে চলে গেল।

শিবপ্রিয় বলল, পিকনিক পার্টি। আজ রবিবার তো। লঞ্চে বেরিয়েছে।

আমরাও বোধ হয় সাহিত্যের পিকনিকে। মনে মনে নিজেকে বলেই চুপ করে গেল

শুদ্ধেন্দু। এই যে আজ নাকতলা থেকে মানকুণ্ডু। তারপর বেশোহাটার বসাকবাড়ি, যাওয়া আসা মিলিয়ে প্রায় তিরিশ-বত্রিশ টাকা খরচ। কত যে হিসেব করে চলতে হয়।

দই, দই চাই—ভালো দই—

ডাকঘর নাটক থেকে পড়ছে অমিতের মেয়ে তৃণা।

ছবি দেখবেন শুদ্ধেন্দুদা?

কিসের ছবি কাবেরী?

ঐ যে গল্পসভার পিকনিক। আপনি তো আসতে পারলেন না। বইমেলার জন্যে।

কাবেরীর শ্যাম্পু করা আবছা খয়েরি চুল হাওয়ায় উড়ছে। চল্লিশ পেরনোর পর সামনের দিকের ঘন থাক পাতলা হযে এসেছে। সেখানে দু একটা দু একটা শাদার জেগে ওঠা। ফর্সার ওপর মুখখানা সুন্দর।

দেখি, দেখি অ্যালবাম—বলতে বলতে শিবপ্রিয় ছোট চৌকো পকেট-অ্যালবাম নিজের কোলের ওপর টেনে নিল।

পিকনিক হযেছিল এই বাড়িতেই—কাবেরী গঙ্গার চোরা হাওয়ায় কপালে উড়ে বসা চুল সরাতে সরাতে দেয়ালের দিকে তাকাল।

'দইঅলা, অ দইঅলা'—তৃণা একই সঙ্গে অমলের গলাতে কথা বলছে। দইঅলার গলাতেও। একটু মন দিযে শুনলেই চোখে জল এসে যায়। গোটা নাটকটা জুড়েই কী এক মৃত্যুঘোর। মৃত্যুই কি সব জীবনের, নাকি জীবনই আসল—কী ভাবে উত্তর পাব। শুদ্ধেন্দু ঘোরে ছিল।

কত কুকুর রে বাবা। অ্যালবামের প্লাস্টিক খাপে ঢুকিয়ে রাখা ছবি ওলটাতে ওলটাতে শিবপ্রিয় বলল।

খাবার-দাবারের জাযগায কুকুর তো থাকবেই।

আচ্ছা শুদ্ধেন্দু—এই যে তুমি যেদিন যেদিন বাড়ি থেকে বেরও—সেদিন তো অনেক রাত হয়ে যায়, তখন কুকুর তাড়াও কেমন করে?

কেমন করে আবার! রোজ তো বেরই না। যেদিন বেরই তখন হাতে বড় ছাতা থাকে, সেই ছাতা হাতে দেখলে রাস্তার কুকুর খুব একটা কাছাকাছি ভেড়ে না। তবু এরপরও যারা ছুটে আসে, ঘাউ ঘাউ করে, তাদের বলি—আমি! আমি রে—

মানে!

মানে আর কী শিবপ্রিয়! আমি আমি রে বলার মানে আমি—আমিও কুকুর। ওরা এই সত্যি কথাটা শুনলে চুপ করে। আর চিৎকার করে না।

ফ্যানটাসটিক—এটা কিন্তু আমি আমার একটা লেখায় লাগাব। বলে অ্যালবাম ভাঁজ করে রাখল শিবপ্রিয়।

লাগাও। বলে শুদ্ধেন্দু অমল আর দইঅলার কথাবার্তায় মন দিল।

অমল মিটলেই খাওয়া-দাওয়া। একটা বেজে গেছে। অমিত বলল।

মনীশদার গল্প কি ভাত খাওয়ার পর? জানতে চাইল কুন্তল।

অ্যাই কুন্তল, সিগারেট দে তো একটা। হাত বাড়াল শিবপ্রিয়।

সেই শাদা লঞ্চ আবারও রাজহাঁস হয়ে গঙ্গা দিয়ে সাঁতরে চলে গেল।

বসাকবাড়ির এক তলাতেই শতরঞ্চি পেতে খাওয়া। ঠাকুর আনিয়ে রান্না করান হয়েছে। এক ব্যাচেই সব হয়ে যাবে। চান করে উঠলেই শুদ্ধেন্দুর মনটা 'ডালভাত ডালভাত' করতে থাকে। স্টিলের থালার ওপর ধোঁয়া ওড়ান ভাত, সজনে ডাঁটা বড়ি কাঁচকলার শুক্তো, ফুলকপি দিয়ে মুগডাল, তাতে আবার কিশমিশ, গরম গরম বেগুনি, ধোঁকার ডালনা, এঁচোড়ের তরকারি, চাটনি।

শুদ্ধেন্দু মোটা হয়ে যাওযার ভয়ে বছর দুই হল মেপে ভাত খায়। বড়জোর দেড় কাপ। ভাত পাতে জল খায় না শুদ্ধেন্দু। স্টিলের গ্লাস থেকে জল ফেলে দিয়ে তাতে বেশ খানিকটা ডাল নিল। সেই ডাল চুমুক দিয়ে খাবে।

লাল রঙের মিষ্টি-দই, পানতুয়া, সন্দেশ—সবই ছিল পর পর। তারপর পানমশলা।

খেতে খেতে নানা কথার ফাঁকে মনীশ চৌধুরি বলছিলেন পুরনো মুদ্রার কথা। মোহর দেখে তার সোনার কোয়ালিটি বিচার করে তখনকার দেশের অর্থ ব্যবস্থা খানিকটা বুঝে নেয়া যায়, যেমন আকবরি মোহর—

বহুদিন পর লাল দই খেলাম। বিয়ে বাড়িতে দই তো প্রায় উঠেই গেছে। কিনেও খাওয়া হয় না। নাও, এটা তুমি খাও—বলে শিবপ্রিয় তার থালার পানতুযা তুলে শুদ্ধেন্দুর পাতে নামিয়ে দিল।

নিজে স্লিম থাকবে। আর আমায় পিপে বানাতে চাও, তাই না—বলে রোগাসোগা শিবপ্রিয়র দিকে তাকাল শুদ্ধেন্দু।

খাও ভাই। বড় গল্পকার তুমি। অতগুলো বই বেরিযেছে।

প্রভিডেন্ড ফান্ড নেই যে। বলেই পানতুয়া চিবোতে চিবোতে শুদ্ধেন্দু উঠে পড়ল।

উঠোনে হাত ধুতে গিয়ে কাঠচাঁপার গন্ধ পেল শুদ্ধেন্দু। কোনো পাতার আড়ালে বসে যেন গলা সাধছে কোকিল। তার মানে বসন্ত। সামনেই একটা বড় কাঁঠাল গাছ। তার সবুজ, ভারী পাতায় রোদের চকমকি। গাছটার পা থেকে মাথা অব্দি মুচি এসেছে। আর একটু বড় হলেই তারা খাওয়ার মতো এঁচোড় হয়ে উঠবে। হাওয়া আবারও কাঠচাঁপার গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে এল। পাশাপাশি মাধবীলতারও।

খাওয়ার পর এমন সভায় একটু গা-ছাড়া ভাব আসেই। কিন্তু গল্পসভার ব্যাপারটা অন্য।

শুদ্ধেন্দু দেখতে পেল চুন মুছে যাওয়া দেয়ালে সিঁদুর উঠে যাওয়া ফ্যাকফ্যাকে বসুধারার গায়ে কোত্থেকে যেন চোরা আলো এসে পড়েছে। তার নীচেই মনীশদা। তাঁর সামনে মাউথপিস, হারমোনিয়াম।

গল্পটা কোলাঘাটে, রূপনারায়ণের কাছাকাছি একটা পুরনো বাড়ির লনে শুরু হয়েছে। এমনই এক পিকনিকের সকাল। সময়টা শীত। কিছু সফল মানুষ, যাঁরা মধ্য বয়স পেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা কয়েকজন এসেছেন এখানে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররাও আছেন।

প্রেম, পুরনো প্রেম, ইউনিভার্সিটি, ডাক্তারি ক্লাস, যৌবনের ভালোলাগা, ডাক্তারি ক্লাসে বড়ি ডিসেকশন, আরকে ভেজানো শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ডাক্তারি মর্গের

শ্বেতপাথর মোড়া মেঝে, কালো বড় টেবিল—

শিবপ্রিয় বুক পকেট থেকে বিড়ির প্লাস্টিক প্যাকেট বের করে বিড়ি টেনে আনল।

গল্পটা খুব জমেছে না। নেহাৎই কোনো মধ্যবয়সীদের পাওয়া না-পাওয়া প্রেম-অপ্রেমের গল্প হবে হয়ত।

শুদ্ধেন্দু নিজের ভেতর যুক্তি গোছাতে গোছাতে দেয়ালে ফুটে থাকা বসুধারার শাদা স্মৃতির দিকে তাকিয়েছিল।

আসলে রাধিকা—

মনীশদা পড়ে যাচ্ছিলেন, আমি তার নাম দিয়েছিলাম রাধিকা। গ্রাম থেকে ডিসেক্ট হতে আসা কোনো বডি। তার গলায় কণ্ঠী। কালো একহারা চেহারা। মাথা ভর্তি এক ঢাল চুল। মুখ চোখ বেশ কাটা কাটা।

মনীশদার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসাকবাড়ির সমস্ত বারান্দা জুড়ে ফরমালিনের ঝাঁঝাল গন্ধ পেল শুদ্ধেন্দু। ডাক্তারি আরকের ঝাঁঝ জড়িয়ে বসে যাচ্ছে মাথার ভেতর।

নাহ্, ঠিক ঐরকম সফল মধ্যবয়সীদের পাওয়া না পাওয়ার হা-হুতাশ নয়ত। এটুকু ভেবে নিয়ে শুদ্ধেন্দু নড়ে বসল।

সারাদিনের পিকনিকের পর চার জন রয়ে গেল রূপনারায়ণের কাছে বিশাল বাড়ির দোতলায়। প্রাণেশ, শীলা, সমীর-অপর্ণা।

প্রাণেশ কৃতি ডাক্তার। বিয়ে করেনি।

শীলা বারবার বিয়ে করেছে। ছেড়েছে। এদেশে। আমেরিকায়। সেও ডাক্তার।

শীলা তো একসময় সমীরকে ভালোবাসত। সমীরও শীলাকে। এসব জানে অপর্ণা।

খুব কুয়াশা পড়েছে চারদিকে। টর্চের আলো কুয়াশার মশারি পেরিয়ে বেশি দূর যেতে পারছে না।

শুনতে শুনতে শুদ্ধেন্দু একটা আস্ত ছবি দেখতে পেল।

কুন্তল ভাবছিল প্রাণেশ লোকটা আশ্চর্য তো। ডিসেকশন টেবিলে গ্রাম থেকে আসা তুলসিমালা গলায় এক যুবতী বৈষ্ণবীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল। সে আর বিয়ে, ভালোবাসায় এগোতে পারে না। এগোলেই সামনেই সেই কৃষ্ণা নারী। প্রাণেশ যার নাম দিয়েছে রাধিকা।

মনীশ চৌধুরি পড়ে যাচ্ছেন, রূপনারায়ণের পাড়ে সমীরদের পৈতৃক বাড়ির দোতলায় ড্রিংকস চলছে। চিয়ার্স। ঘরে খাবার দিয়ে গেছে মালী। বাইরে শীত নেমে এসেছে। আর কুয়াশা। প্রাণেশ মদ খায় না। সে একটা সফট ড্রিংক নিয়ে বলে যাচ্ছে রাধিকার কথা।

কথা বলছে শীলা।

কখনও অপর্ণা, সমীর।

শিবপ্রিয় আবার একটা বিড়ি ধরাল। গালে হাত দিয়ে একটু কুঁজো হয়ে বসে অমিত। কাবেরী দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা টান করে দিয়েছে। বারবার শাড়ি টেনে পায়ের ফরসা বুড়ো আঙুল ঢাকতে চাইছে। তৃণা একেবারে চুপ। কুন্তলের বউ পারমিতা অমিতের বউ সাধনা—সকলেই গল্পের ভেতর গলা ডুবিয়ে বসে।

বাইরে রোদ একটু একটু করে মুছে আসছে। গঙ্গার পাড়ে খানিকটা চড়া মতো জায়গায় ছেলেদের বৈকালিক ফুটবল পেটাপেটি। সুদর্শন মনীশ চৌধুরির গল্প শুনতে শুনতে ভাবছিল এর যদি একটা আবহ তৈরি করা যেত।

গল্প পড়তে পড়তে মনীশদা 'নেক্রোফেলিয়া' শব্দটি ব্যবহার করলেন, প্রাণেশের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে। নেক্রোফেলিয়া মানে শুদ্ধেন্দুর জানা নেই। তবে বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছিল মৃত শরীরের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। টান। অমোঘ এক সম্মোহন। এমনকি মরা মানুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কও হয়ত করে ফেলতে পারে এরা।

মনীশ চৌধুরি পড়ছেন। হাওয়ায় কুয়াশা ভাসছে। উড়ে আসছে ফরমালিন-গন্ধ।

গল্পের রাত বাড়ছে।

অপর্ণা আর সমীর ঘুমিয়ে পড়েছে এক ঘরে। অন্য ঘরে প্রাণেশ। পাশের ঘরে শীলা। বিছানায় শুয়ে কী জানি কেন বালিশ বুকে নিয়ে প্রাণেশ অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর খানিক পরে তার আবছা ঘুম এসে গেলে দরজায় খটখট। খটখট।

দরজা খুলতেই বিছানায় নারী-শরীর।

শীলা! তুমি! কেন? এখানে কেন? শীলার গায়ে পারফিউম প্রাণেশকে সজাগ করল।

তুমি যাও শীলা।

না প্রাণেশ। না।

শীলা প্রাণেশের ক্যারোটিভ আর্টারিতে—গলার দুপাশে চাপ দিচ্ছে।

কী হচ্ছে, কী হচ্ছে শীলা! পড়তে পড়তে কেশে ফেলেন মনীশ চৌধুরি। বেশ জোরে।

জল খাবেন? অমিত জানতে চায়।

নাহ্। থাক। বলে গলার এক পাশে হাত বোলাতে বোলাতে গল্পে ফেরেন মনীশ।

কিছু নয় প্রাণেশ। জাস্ট রিল্যাক্স। রিল্যাক্স। আমরা দুজনেই অ্যাডাল্ট। সেখানে প্রাণেশ তোমার এই ট্যাবু—

তারপর তো শরীর নিজের কাজ করে। নিঃশ্বাসের শব্দ ঘন হয়।

চটাস করে বড় মশা মারে কুন্তল। বাবু হওয়া পা ভেঙে একপাশে তেরছা করে ছড়িয়ে দেয় শিবপ্রিয়। নদীর বুকে অন্ধকারের আঁচল ছড়িয়ে পড়ব পড়ব করছে। গঙ্গার চড়ার কাছাকাছি তখনও ফুটবলের দাপাদাপি। মাজাবাঁকা নারকেল গাছে বেলা শেষের রোদ্দুর।

আর তখনই ডাক্তারি আরকের গন্ধে বসাকবাড়ির বাতাস আরও পাথর পাথর হয়ে ওঠে। শুদ্ধেন্দু দেখতে পায় চুল খোলা এক নারী ধীরে বসুধারার মুছে আসা ছাপের পাশে দাঁড়ায়। তার গলায় তুলসীকাঠের মালা। হাওয়ায় ঢাল দেয়া ঘন কালো চুল ওড়ে। সেই কালো মেয়ের দুচোখ আগুন আগুন। শাদা সাজানো দাঁতের পাটিতে যে আলো তাকেই কি নিষ্ঠুরতা বলে! শুদ্ধেন্দু দেখতে পেল রাধিকার গা থেকে খানিকটা নীল মেঘ উড়ে গিয়ে গঙ্গার গেরুয়া বুকে ছায়া হয়ে ছড়িয়ে গেল। ফরমালিনের তীব্র গন্ধ আবারও ছড়িয়ে যায় বসাকবাড়ির বাতাসে।

নাহ্, গল্পটা আর পড়ব না। হঠাৎই বলে ওঠেন মনীশ চৌধুরি। তারপর কপালের ঘাম মোছেন পকেট থেকে রুমাল এনে। চোখ থেকে চশমা টেনে এনে আবার পরেন।

কেন! কেন! কী হয়েছে! বেশ তো হচ্ছিল। খুব ইন্টারেস্টিং। বলে উঠল কুন্তল, শিবপ্রিয়, অমিত, কাবেরী, পারমিতা, সাধনা, তৃণা, আর কেউ কেউ। শুদ্ধেন্দু দেখতে পেল ফ্যাকাশে শাদা বসুধারা চিহ্ন থেকে খই ঝরে ঝরে পড়ছে।

গল্পের ফিনিশিংটা—শেষটুকু ভালো লাগছে না। ওটা রি রাইট করব আবার। তারপর শোনাব তোমাদের। এ বয়েসে এমন আলগা লেখা ঠিক নয়। এখন পড়তে গিয়ে একেবারে ভালো লাগছে না। কেমন যেন ছেলেমানুষি।

লেখাটা কিন্তু এতক্ষণ এতটুকু লুজ মনে হয়নি। শেষটুকু পড়ুন না আপনি। কুন্তল, অমিত, শিবপ্রিয়, কাবেরী গলায় অনেকটা আন্তরিকতা এনে বলে ওঠে। সাধনাও।

শুদ্ধেন্দু দেখতে পেল বসুধারার সিঁদুর মুছে যাওয়া শাদা দাগের পাশে মনীশ চৌধুরির গল্পের রাধিকা তখনও দাঁড়িয়ে। তার সমস্ত শরীরে কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠল।

ক্যারোটিভ আর্টারি—বুঝলেন তো, শরীরের খুব ভাইটাল পার্ট। ঠিকমতো চাপ দিতে পারলে মাথায় ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে গিয়ে খানিকটা সেক্স ইমপ্রোভাইজ করে। এটা বেশি বয়সের প্রবলেম আর কি! ও দেশে হোমো সেকসুয়ালস গে-রা খুব করে। কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হলেই দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে, সেই লোকটি, যার ক্যারোটিভ আর্টারিতে চাপ দেয়া হচ্ছে। বলতে গিয়ে আবারও জোরাল কাশির দমকে কথা হারিয়ে যায় মনীশ চৌধুরির।

একটু জল খান। গলাটা শুকিয়ে গেছে। বলতে বলতে অমিত বোতল এগিয়ে দেয়।

শুদ্ধেন্দু দেখতে পায় চুন খসে যাওয়া দেয়ালে সিঁদুর মোছা বসুধারা চিহ্নের শাদা ছোপের পাশে তখনও রাধিকা দাঁড়িয়ে।

হাওয়ায় আরক-ঘ্রাণ ভাসে।

কামধেনু

নদীর জল যতটা ফরসা, খাঁড়ির বুক তেমন নয়। তবু ভোরের সূর্য সেখানে নিজের মতো আলো নিয়ে ঝাঁপ দিলে খাঁড়ির গায়ে একটা পারখসা আয়না তৈরি হয়ে যায়। আর তাতে কখনও কখনও মুখ দেখতে চায় ফুলি।

তেমন উঁচু নয়। চার পা। ঘাড়ের উঁচু, ভরাট ককুদ অনেকটা ষাঁড়ের যেমন হয়, তেমনই। এমন কি পেছন থেকে তাকে দেখলে পা, পাছার গড়নে ষাঁড়ই মনে হয়। মাথার শিঙ জোড়া পুরষ্টু নয়। রোগা রোগা। ছোট। তেমন ভারী নয় দুধের পালান। গভীর টানা কালো এক জোড়া চোখ।

শীতে আমার গায়ের পশম একেবারে ধবধবে শাদা হয়ে ওঠে। গরমে খানিকটা ময়লা মতো। আর মাসে একবার পূর্ণিমার চাঁদে আকাশ সেজে উঠলে, সেই আলোয় পৃথিবীর রঙ অন্যরকম হয়ে যায়। আর তখনই আমার গা থেকে উঠে আসে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ।

আত্রেয়ী নদীর মূল শাখা এখান থেকে অনেকটা দূর। সেই নদী বয়ে গেছে চকভৃগুর গা ঘেঁষে। বিকেল নেমে এলে সেই নদীতে কাক, দাঁড়কাকেরা দল বেঁধে চান করে। ডাকে। তারপর উড়ে যায়।

কাক, দাঁড়কাকেরা যেখানে চান সারে, তার একটু দূরেই নদীটা সামান্য বাঁক নিয়েছে। আর বাঁকের ও পারেই বাংলাদেশ।

এই পৌষের হিমে সারা রাত বাংলাদেশের দিক থেকে নৌকোরা খুব জোরে ইনডিয়ার দিকে আসে। আবার চলে যায়। কিসের এত যাওয়া-আসা, তার সবটাই নদী জানে। কিন্তু জেনেও বলে না কিছু। বরং এ সব নিয়ে কথা বলতে গেলে গলা শুকিয়ে আসে নদীর।

চকভৃগুকে পাশে রেখে নদী যেমন আপন খেয়ালে এগিয়েছে, তেমনই তার বুকে নিজেদের মর্জিমতো নৌকো ভেসে থাকে। একটা। দুটো। তিনটে। অনেকগুলো।

নতুন তৈরি হওয়া ব্রিজ থেকে অনেকখানি নেমে এলে বাঁ দিকে আত্রেয়ী নদীর পাড়ে উঁচু করে মাটি ফেলা। সেই পাড়ের গা দিয়ে ইট-সিমেন্টে বাঁধান ধাপ একেবারে নদীর বুক পর্যন্ত নেমে গেছে।

যে সব নৌকোরা জলে ভেসে, তাদের ওপর বসে ছিপ ফেলছে অনেকে। রাইকত মাছ যদি পাওয়া যায়। নয়ত সুন্দরী বা বউ মাছ। এসবই বালুরঘাটের নিজস্ব।

নদীর পাড়ে, বাঁকের আগে, যেখানে কাকেরা রোজ গা ধোয়, সেখানে শ্মশান। গোটা ছয় লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি প্রায় এক মানুষ উঁচু চিতা। কাছাকাছি মহাবট, অশ্বত্থ। দুজনেরই ঝুড়ি নেমেছে মাটিতে। আর আছে জিগা গাছ।

শীত তেমন করে পড়েনি। হাওয়ায় শীতলতা নেই। তবু আত্রেয়ীর পাড়ে দাঁড়ান দুটি জিগা গাছ ফিস ফিস করে মাঝে মাঝে কথা বলে নিজেদের ভেতর।

অ গাছ, তোর ডাল তো আগুনে জ্বলে না।

তোরও তো জ্বলে না রে।

জ্বলবে কি করে! আমরা দুজনে তো একই—

কি এক?

এক না!

না।

কেন?

তুই লম্বা। আমি বেঁটে।

তাতে কি হল!

তোর পাতায় ধুলোর পাউডার বেশি।

তাতেই বা কি আসে যায়! আমরা দুজনেই তো জিগা। মড়া পোড়ানর আগে চিতা সাজাবার কাজে লাগি। আমাদের কাঁচা ডাল আগুনে পোড়ে না।

নদীর হাওয়ায় দুই জিগা গাছের কথা খানিকটা ছিঁড়ে যায় বুঝি। বাতাসে পাড়ের আম গাছগুলির পাতায় কলরোল। দুই কিশোরী নিজেদের ভেতর কথা বলতে বলতে নদীতে নামার জন্যে সিঁড়ি ভাঙে। তাদের শাড়ি পেঁচান বুকের ওপর রঙিন গামছা ফেলা। সেই রঙ সাবান-সোডায় বেশ খানিকটা ফ্যাকাশে।

কি একটা কথা খুব নিচু গলায় বলতে বলতে তারা গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। তারপর কখন যেন চিমটি কেটে একজন আর এক জনকে সামান্য যাতনা দিলে খুব চাপা গলায় উফ্, তারপরই আরও চাপা কণ্ঠে কোনো কুকথা ভেসে আসে। তার শেষটুকু এরকম—'মরণ হয় না কেন তোর!' কিংবা অন্যরকম কিছু। তারপর দুই কিশোরীর হাসি, গা ঠেলাঠেলিতে নদীর পাড় ও জল ভেঙে ভেঙে যায়।

পৌষের হাওয়া আমগাছের পাতা, দীর্ঘ শিমুল, প্রাচীন বট ও অশ্বত্থদের ছুঁতে ছুঁতে শ্মশান যাত্রীদের বসার ইট-সিমেন্টের বাড়ির গায়ে আছাড় খায়। একতলা সেই বাড়ির ছাদে তখন বেলা শেষের আলো। দরজা-জানলা নেই। অথচ চৌকো চৌকো খোপ আছে অনেকগুলো। তাতে কি এক আড়াল তৈরি হয় কি হয় না।

রোদ গড়িয়ে পড়ে নিজের মতো। নৌকোরা ভেসে থাকে। শেষ বেলার রোদ নদীর বুকে অনেক অনেক আলোর ফুল ছুড়ে ছুড়ে দেয়। আর তখনই আমবাগানের আড়াল থেকে যে লালচে ষাঁড়টি বেরিয়ে আসে, তার ককুদ, গলকম্বল, শিঙ, অণ্ডকোষে সূর্যের লাল একটি রক্তাভ কার্পেট হয়ে জড়িয়ে যায়।

ষাঁড়ের সামান্য কালচে নাকের মাথায় কি এক পিচ্ছিল ফেনা। দু চোখের মনিতে ঘূর্ণি। ষাঁড় তার বিশাল শিঙ সমেত মাথাটি পিঠ অর ককুদের দিকে সামান্য গুটিয়ে এনে গলকম্বলে অনেকটা ঢেউ তুলে ডেকে ওঠে—গাঁ-হাঁ-হাঁ-আঁ—গাঁ।

তার চেরা খুরে বলশালী পা ও পাছায়, ল্যাজে রোদ্দুরের আশ্চর্য দেয়ালি। সমস্ত নদীর পাড় ঝমঝম করে ওঠে তার ডাকে। তার আম গাছের ছায়াদের পেছনে বড় দেউড়ি, গেটঅলা দোতলা বাড়িটি, তার গায়ের বিষণ্ণ হলুদে, সেই হলুদ তো বহু বছর আগে পোতাই হয়েছিল, তার গায়ে—রোদের শেষ আলাপটুকু মেখে নিতে নিতে একা দাঁড়িয়ে থাকে।

মাসের হিসেবে পৌষ এসে গেলেও হাওয়ায় তেমন হিম নেই। সেই দুই কিশোরী ঘাটে

এসে নদীতে গামছা ভাসিয়ে গল্প করে। এ গল্প সে গল্প। ফিটফাট ছেলেদের গল্প। শাহরুখ খান, সলমন খান, আমির খান। কিংবা এইসব খানেরা কেউই হয়ত নয়। তারা তাদের পাড়ার প্রাচীন বিধবা সোহাগবালার মৃত্যু ও শ্মশানে তার শেষ কাজের বিবরণ দিতে থকে।

শ্মশানে ছেলেদের শোয়ায় উপুড় করে।

মেয়েদের চিৎ।

জলে ডোবা মড়াও এরকমই ভাসে। ছেলেরা উপুড়। মেয়েরা চিৎ।

মরে গেলেও আবার ছেলেমেয়ে থাকে নাকি? দূর মরি! বলে এক কিশোরী অন্য কিশোরীর গায়ে নদীর জল আলতো করে ছুঁয়ে দেয়।

শীতে গায়ে জল দিলে কেঁচো হয়।

একজন—যার গায়ে জল লাগে সে এসব বলতে বলতে খানিকটা কুঁকড়ে যায়। তার পর শাড়ির আঁচল মুখে টেনে নিয়ে, দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে হালকা হালকা হাসিতে নিজেই আত্রেয়ী হয়ে ওঠে।

ধরা যাক, এই এক কিশোরীর নাম ফুলটু। অন্য জনে কুমু।

কুমু ফুলটুর গায়ে আবারও আলগা করে আত্রেয়ীর জল ছুঁড়ে মারে।

ফুলটু তার দু হাতে সেই জল-আঁচড় আটকাতে আটকাতে একটু নিচু হয়ে যায়। কুমু ততক্ষণে তার বুকের গামছা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কাক, দাঁড়কাকেরা তখনই চান সেরে শ্মশানের বটগাছে ফিরছিল। তাদের সঙ্গে একটি, দুটি ঘুঘু।

প্রায় রঙ মুছে আসা হলুদ বাড়িটির সামনে থেকে বেরিয়ে আসা ষাঁড় আবারও ডাক ছাড়ল—গাঁ-হাঁ-আঁ—। তার ককুদে, খুরে শেষ বেলার আলো প্রণামের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল।

আত্রেয়ীর বুকে নৌকোর ওপর বসা দুজন বেশ মোটা সোটা হাতছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল, তাদেরই একজন হঠাৎ বাঁ হাতের আঙুলে প্রবলভাবে নাক খুঁটতে থাকলে ঘেন্নায়, বিরক্তিতে মুখ কুঁচকোল ফুলটু। তাদের বাঁ দিকে খানিকটা দূরে, অনেকটা উঁচুতে ঢালাই ব্রিজের ওপর দিয়ে ভারী চাকারা গড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই সব শব্দ আকাশের গা থেকে উড়তে উড়তে উড়তে আছড়ে পড়ছিল নদীর জলে।

ষাঁড় আবারও ডাক দিল।

রঙ চটে যাওয়া খাঁয়েদের পুরনো বাড়ির দেউড়ি খিলান থাম মোটা মোটা দেযালে তখন সূর্যাস্তের হোলি।

ফুলটু বলল, সোহাগ ঠাকুমাকে পোড়ানর সময় কেমন ভাবে লোহার ফ্রেমে সেঁটে দিয়ে কাঠ সাজিয়েছিল, বলছিল নীতিনদা।

ও নীতিনদা মানে, সেই তোর নীতিনদা—বলেই কুমু তার গামছা ধরতে চাইল নদীর বুক থেকে।

ফুলটু কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে রইল। তখনই নদীর বুকে নীতিনকে স্পষ্ট দেখতে পেল ফুলটু। বেশ লম্বা। রোগা। হাড় হাড় চেহারা। গালের ঝিক খানিকটা উঁচু। তুলনায় নাক তেমন খাড়া নয়। দু চোখও বেশ ছোট ছোট। গায়ের রঙ কালোর দিকে।

মাথা ভর্তি কালো চুল। হাসলে চিকমিক করে ওঠে শাদা দাঁতের সারি। চক চক করে দু চোখ।

ফুলটু হাত থাবড়ে নদীতে নীতিনের ছায়া ভাঙল।

সোহাগ ঠাকুমাকে পুড়িয়ে ফিরল নীতিনদারা—এই তো সেদিন। বাবুদা ছিল। প্রদীপদা, শান্তনুদা। নীতিনদা পরের পরের দিন পড়াতে এসে মুখটুখ ভেটকে দেখাচ্ছিল সোহাগ-ঠাকুমাকে কেমন করে লোহার ফ্রেমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো ভেঙে লোহার ফ্রেমের গায়ে বেড়িয়ে রাখা। পেছনমোড়া করে বাঁধা দু হাত। শুধু মুখটুকু বেরিয়ে আছে চিতার বাইরে।

কাশীর ঠাকুর দেখিস নি। শুধু মুখখানাই সার। বাকিটুকু সারা গায়ে কাপড় জড়ান। সোহাগঠাকুমার সারা গায়ে কাঠ। মুখটুকুই বেরিয়ে আছে বাইরে। বলতে বলতে নীতিনদা চোখ বুজে সোহাগঠাকুমার মুখের ভাবটি দেখায়। আর সেদিকে তাকিয়ে হাসির বদলে হু-হু কান্নায় ভেতরটা দুলে উঠতে থাকে ফুলটুর।

তখনই খাঁ বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে প্রায় পঁয়ষট্টি ছোঁয়া বলরাম খাঁ বেলা মুছে যাওয়া আলোর দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মনেই বলে উঠল, আরও একটা দিন চলে গেল। আর কত দিন বাঁচা! আরও কতদিন! ফার্স্ট সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর দেড় বছর হয়ে গেল। এখনও পায়ে জোর পাইনা। মাসাজ, ওষুধ, ফিজিওথেরাপি—সব চলছে। তেমন উন্নতি কোথায়! বয়েস হলে যা হয় আর কি! তবু তো বাঁচতে হয়। ওষুধ খেতে হয়। কিছু ভালো লাগে না।

আত্রেয়ীর পাড়ে শুয়ে থাকা শ্মশানের দিক থেকে হাওয়া ছুটে এসে হাতছানি দেয়। আমি টের পাই। বয়েস হলে সব মানুষই বোধহয় টের পায় এমন। জিগা গাছের ডাল ছোঁয়া হাওয়া এসে আছড়ে পড়ে খাঁয়েদের প্রাচীন বাড়ির গায়ে। বলে যায়, ওষুধ, মাসাজ, নিয়ম-নিষ্ঠায় কতকাল আর আটকে রাখবে!

আমরা সাত পুরুষের জমিদার। এক সময় এ তল্লাটের প্রায় সবটাই ছিল আমাদের। তারপর যেমন হয়। কালে দিনে সময় খেয়ে নেয় সব কিছু। শুধু কিছু স্মৃতি জেগে থাকে।

ছাদের কার্নিশে পায়রারা একটু আগেও গলা ফুলিয়ে নিজেদের মতো করে নামতা পড়ছিল। একে কে এক / খাঁয়েদের হাল দ্যাখ। দুয়েকে দু / উই ধরেছে উই ....।

কি জানি কেন, পায়রাদের বকবকম বা এরকম কোনো স্বর শুনতে শুনতে সুনীল খাঁয়ের মনে হয় ওরা ধারাপাত উল্টে উল্টে নামতা পড়ছে।

তিনেক্কে তিন / খাঁয়েরা এখন দীন ...

এমন সব আশ্চর্য গাণিতিক হিসেব শুনতে শুনতে বলরামের শীত করতে লাগল। আর তখনই আবারও গাঁ-হাঁ-হাঁ-আঁ বলতে বলতে ষাঁড়টি নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ফুলির বাড়িতেও তখন আশ্চর্য সন্ধ্যা নামছে। আত্রেয়ীর খাঁড়ির বুকে খাবলা খাবলা সূর্যাস্ত। গোয়ালের ভেতর মশা যাতে না হয়, তার জন্যে ঘুঁটে জ্বেলে দিয়ে গেছে এ বাড়ির গিন্নি।

গিন্নিটির বয়েস বেশি নয়। এই বছর চল্লিশের ভেতরেই হবে। দু দুবার অপারেশন

হয়েছে পেটে। সে হবে প্রায় বছর পনের আগে। আমি তখনও এ বাড়িতে আসি নি। আমি এলাম তো এ বাড়িতে বছর খানেক। খাঁড়ির ওপার থেকে পিলুর মা আমায় দড়ি ধরে হাঁটিয়ে দিয়ে গেল।

এ কামধেনু। সবার সহ্য হয় না বাপু। বাচ্চা বিয়োবে না। কিন্তু যত্ন করে বাঁটে হাত দিলেই দুধ দেবে। তার আগে মাকে প্রণাম করে নেবে। ভগবতী-মা। এযে কামধেনু। পিলুর মা বলছিল।

এতই যখন আয়পয় গোরুর, তা তুমি ছেড়ে দিচ্ছ কেন?

এ বাড়ির গিন্নির জিভে ধার খুব। হবে না, রোগাাভোগা মানুষ। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দুবার পেট কেটেছে। খুব বড় অপারেশন। লোকে বলে কেনসার। কি জানি কি! বলতে পারব না বাপু। তবে প্রায় চল্লিশ গিন্নিটি বেশ বাচ্চা বাচ্চা। লম্বা নয়। ফরসা। গালে মেচেতার হালকা ছোপ। নাক-চোখ ভালো। এসব দেখতে দেখতে পিলুর মা বলল, পিলুর অসুখ তাই—নইলে ফুলিরে আমি থোড়াই দিতাম। বলেই ফুলির পিঠে হাত রাখল পিলুর মা।

এ বাড়ির কর্তাটি বেশ কচি মতন। ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশেও মাথা ভরা চুল। একটাও পাকে নি। চোখে চশমা। মুখে হাসি। শ্যামলা রঙ। তেমন লম্বা নয় কিন্তু মনটা বড়। বাড়ির কর্তা কবিতা লেখে। তার ডান হাতের চার আঙুলে চারটে আঙটি। গলার স্বরটি ভারী সুন্দর।

কবিতা লিখলে কি হবে, কর্তার আবার মোটরগাড়ির কল-কবজার ব্যবসা। রাগ করে—নাকি বাপের সঙ্গে কি বিষয়ে একটা মিল হয়নি, তাতে বাড়িঘর ছেড়ে আলাদা বাসা করল। লেদ বসাল। কারখানা করল। লোক রাখল। মোটরের ইঞ্জিন বাঁধার কাজ করে। খুব পয়সা। এসবই পিলুর মা জানে। এই শহরের অন্যরা জানে। কর্তার ছেলে ছোট। মেয়ে বড়। মেয়ে এম.এ পড়ে। কবিতা লেখে। দেখে বয়েস বোঝা যায় না। মনে হয এই সবে ক্লাস টেন ইলেভেন।

গিন্নি যাই বলুক, কর্তা রেখে দিল কামধেনু। তারপর থেকে ফুলি এ বাড়িতে। রোদ উঠলেই খাঁড়ির জলে নিজের মুখ, গা, শিঙ দেখতে ইচ্ছে করে ফুলির। গলায় দড়ির আঁটসাঁট। যাবে কি ভাবে! বাড়ির কর্তা প্রায়ই লোকজন নিয়ে আসে কামধেনু দেখাতে। বিশেষ করে কলকাতা থেকে আসা বন্ধুদের। তখন কর্তার পায়ে, প্যান্ট ঢাকা হাঁটুতে শিঙ দিয়ে অল্প অল্প করে ঠেলা দেয় ফুলি। তার টানা চোখের গোল গোল মণি ঘোরে। ঘুরপাক খায়। ছোট ছোট শিঙে তখন হালকা হালকা রোদ। ফুলির গায়ের পশম থির থির থির থির করে কাঁপে।

কর্তা তার পিঠে আলতো আলতো করে হাত চাপড়ে দেয়। গলার কম্বলে আঙুল ছোঁয়ায়। ফুলির আরাম লাগে। আরামে গলা তুলে দেয় ফুলি। আরও ঘেঁষে আসে কাছে।

তবু শেষ রাতে আকাশে ভরা চাঁদ উঠে এলে ফুলির গা থেকে সুগন্ধী চালের গন্ধ জেগে ওঠে। সেই গন্ধে গোয়ালঘরে থাকা টিকটিকিও অবাক হয়ে যায়।

ঘুমের ভেতর পা ঠুকে মশা তাড়াতে তাড়াতে ফুলি দেখতে পায় আত্রেয়ীর খাঁড়ির

ওপার থেকে দুজন দাড়িঅলা বলিষ্ঠ মানুষ তার নাম ধরে ডাক দেয়।

বশিষ্ঠ, এ কামধেনু আমার।

অসম্ভব! বিশ্বামিত্র, এ কামধেনুর জন্যে আমরা দুজনে যুদ্ধ করেছি। তির ধনুক, পরশু, গদা, কার্মুক, খেটক, খর্পর ব্যবহার করেছি। সৈন্য ক্ষয় হয়েছে।

আরও হবে।

আরও হবে! কি বলছ বিশ্বামিত্র! বশিষ্ঠের গলায় অসহায়তা।

ঠিকই বলছি। তুমি তো এখনও ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠো নি বিশ্বামিত্র।

আমি ব্রাহ্মণত্ব চাই না। কে চায় তোমার ব্রাহ্মণত্ব! আমি কামধেনু চাই। সেই মায়া-ধেনুর কাছে আমি যা চাইব তা-ই পাব। এ পৃথিবীর সব সম্পদ আমার হবে। সব কিছু আমার।

এসব শুনতে শুনতে কেমন যেন ভয় করতে লাগল ফুলির। আবার যুদ্ধ! আবার লোকক্ষয়! আমি কি পারব সত্যযুগের মতো নিজেকে নিজে রক্ষে করতে। সশস্ত্র সৈন্যরা বেরিয়ে আসবে আমার হাঁ-মুখ থেকে। এমন কি যবন সেনারাও।

ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া বিশ্বামিত্র যখন আমায় জোর করে নিয়ে যেতে চাইল বশিষ্ঠদেবের আশ্রম থেকে, তখন বশিষ্ঠদেব বললেন, মা আমি অপারগ। তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না। তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা কর। ভাবতে ভাবতে ফুলি আবারও পা ঠুকল অন্ধকার গোয়ালে। তার পা নাড়ানাড়িতে গোটা তিনেক মশা উড়ে গিয়ে খানিকটা দূরে বসল।

আকাশে আশ্চর্য চাঁদ। তার গায়ে ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপনী-আলো।

সেই লালচে ষাঁড়টি খাঁয়েদের দেউড়ির সামনে তখনই খানিকটা আড়মোড়া ভেঙে পা নাড়াল। তার খুরে নদীর পাড়ের কাদা। আত্রেয়ীর কাদার সঙ্গে আত্রেয়ীর খাঁড়ির শাদা বালিও কিছু কিছু মিশেছে।

পরশু শেষ বিকেলে সূর্য মুছে যাওয়ার আগে, সিমেন্টের ঢালাই ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি গিয়েছিলাম আত্রেয়ীর খাঁড়ির পাড়ে। খুব জোরে ডাক দিয়েছিলাম—গাঁ-হাঁ-আঁ-গাঁ-হাঁ-আঁ—

ওপারে উঁচু জমির ওপর গোয়ালে সেই কামধেনু। আহা! কি তার গায়ের গন্ধ।

আমি কামধেনু। আমি দৈবী-ধেনু। তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারব না। আমার বৎস হয় না। কিন্তু দুধ হয়। এটাই আমার নিয়তি। খুব ধীরে উত্তর দিচ্ছিল ফুলি। তুমি ফিরে যাও। ফিরে যাও। গোয়ালের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বলে উঠল ফুলি।

একবার বাইরে এস তুমি। তোমায় দেখেই চলে যাব।

না, তা হয় না। হয় না গো। বললাম না, আমি দৈবী-ধেনু।

ঘুমের মধ্যে এসব মনে পড়তেই লালচে ষাঁড়টির চোখে জল এল। তার ককুদে, শিঙে গায়ের চামড়ার শেষ রাতের হিম টুপিয়ে নামছিল।

শেষ রাতে কর্তাটির ঘুম কখনও কখনও কবিতার চাপে আলগা হয়ে আসে।

কি হল লেখালেখি! কিছুই হল না! কলকাতা থেকে এত দূরে বসে সাহিত্যচর্চা হয়! তার ওপর কবিতা! কে পড়ে! কে-ই বা বই কেনে! নিজের টাকা খরচ করে কত বই ছাপা যায়? তারপর শুধু ছাপলেই হবে না। বিনা পযসায় বিলি কর! যদি কেউ পড়ে। পড়ে ভালো বলে।

ও কামধেনু! ফুলির মা, মল্লিকা যেন ভালো থাকে।

মল্লিকা মানে আমার বউ। ১৯৯৪-তে ঠাকুরপুকুরে দু দুটো অপারেশন। পেটে কার্সিনোমা। রে। কেমোথেরাপি। ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরল এবাড়ির কর্তা—কবি সিদ্ধব্রত।

আত্রেয়ীর খাঁড়ির ঘোলাটে জলে চাঁদ নেমে আসছে একটু একটু করে।

ওপারে দাঁড়ান দুই ঋষি ফুলির নাম ধরে ডাকছিল।—সুরভি! সুরভি!

সুরভি! কে সুরভি! আমি ফুলি।

না, তুমি সুরভি! তুমি থাকলে খাদ্য পানীয—পুরোডাশ, গোধূম, সোমরসের কোনো অভাব থাকবে না। আমরা মন দিয়ে যজ্ঞ করতে পারব। নিশ্চিন্তে সামগান।

তুমি আমার।

তুমি আমার।

ভারতীয় পুরাণের দুই প্রাচীন ঋষি এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল।

তাদের সেই হুংকারে চমকে উঠল সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, লুব্ধক, রোহিণী, শতভিষা, বিশাখা—সঙ্গে অন্যরাও।

হে মা ফুলি, মল্লিকা যেন সুস্থ থাকে। আমার কবিতাটা যেন হয়। ছেলেমেয়ে দুটো যেন ভালো হয়। ব্যবসাটা যেন ঠিক মতো চলে। টাকা হলে একটা টাটা সুমো যেন কিনতে পারি। ঘুমের মধ্যে এসব বিড়বিড় করতে করতে পাশ ফিরল সিদ্ধব্রত। তার গালের এক পাশে জানলা দিয়ে আসা চাঁদের চোরা আলো জড়িয়ে গেল।

খাঁ বাড়ির বড় দেউড়ির সামনে উড়ে আসা বাতাসে আত্রেযীর পাড়ে জেগে থাকা শ্মশানের পোড়া মাংসের গন্ধ। বুড়ো বটের ডালে দাঁড়কাকেরা জেগে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাকেরাও জেগে উঠবে এবার।

তুমি আমার হলে না। দেখতেও পেলাম না তোমায় ভালো করে। আত্রেযী নদীর পাড় থেকে বড় ঢালাই ব্রিজ পেরিয়ে পিচ রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে খাঁড়ির এপারে এসে কত দিন তোমায় ডাকি। কতবার। তুমি আস না। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সেই মহাবৃষর।

তার লালচে গায়ের চামড়ায় শেষ রাতের হিম নিজেদের মতো করে নেমে আসছিল।

যাই

জনার্দন দেয়া—গায়ে জনার্দন দেয়া কথাটার মানে জানা আছে? বলেই নবেন্দু ভট্টাচার্য ঘরভর্তি লোকজনের দিকে তাকালেন। খাটে, সোফায় সবাই ঠাসাঠাসি হয়ে বসে। যারা সকালে আসতে পারেনি, তারা এখন এই বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেতেও আসছে। বসছে। আসা মাত্রই তাদের হাতে মিষ্টির প্লেট। চিনি, স্কোয়াশ আর বরফে তৈরি শরবতের রঙিন গ্লাস। একটা শোনপাপড়ি, বাদামবরফি একটা, বরফির গায়ে রুপোলি তবক। কড়া পাকের সন্দেশ দুটো। মোট চারটে মিষ্টি। এক একটা চার টাকা করে। মা বাদামবরফি খুব পছন্দ করতেন। বড়বাজার থেকে বাদামবরফি আনিয়েছে, শোভন, মায়ের ছোটজামাই।

পাঁচ ভাই আমরা। তার মধ্যে তিনজন আছি। দু জন নেই। এসব মনে করতে করতে সদ্য ন্যাড়া হওয়া মাথায় অভ্যাসে হাত দিয়ে ফেলল নবেন্দু। কনুই ছাড়ান র-সিল্কের হাফ হাতা পাঞ্জাবি। পাড় ছাড়া মিলের ফাইন ধুতি। ঘরে পরার পাতলা কালো স্লিপার পায়ের কাছে।

ইজিচেয়ারে নিজেকে অনেকটা ছড়িয়ে দিয়ে সবে চৌষট্টি ছাড়ান নবেন্দু র-সিল্কের পাঞ্জাবির হাতা আবারও কনুই ছুঁয়ে গেলে নতুন করে বলে উঠল, বল, বল, জনার্দন দেয়া কাকে বলে?

বোনেরা—তিন বোনই এসেছে। তাদের স্বামীরা। ছেলে-মেয়েরা। নাতি-নাতনি। ছেলের বউ। জামাই। মায়ের পাঁচ ছেলে তিন মেয়ের ভেতর বড়দা আছে। আমি আছি। মেজদা নেই, মারা গেছে। হ্যাঁ, কুড়ি বছর হয়ে গেল। আর একদম ছোট পুলু—পুলক—পুলকেন্দু নেই। তিন বছর আগে পুলকেন্দু অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ এক সঙ্গে নিয়ে তার মালদার কোয়ার্টার্সে—

আমাদের চার ভাইয়ের মাথাতেই গজ্জান চুল। ঠাসা, মাথা ভর্তি। টাকের বংশমাত্র নেই। এটা পাওয়া মায়ের দিক—মামাবাড়ির থেকে। মামারা, মাসিরা, দাদামশাই—সকলের মাথাতেই চুলের বাহার। মায়েরও তাই। এই তিরাশি পার করার পরও তেমন করে পাকেনি। আর বাবা একেবারে উল্টো। পুরো মাথাটাই প্রায় কপাল। খুব পাতলা হয়ে আসা লালচে চুল ছিল তাঁর মাথায়। সেটুকু বড়দাই বোধহয় দেখেছেন খালি। গোঁফও ঐরকমই, লালচে মতো। আমাদের পুলু বাবার ঐ পাতলা চুলের ব্যাপারটা পেয়েছিল। এমন কি রঙেও তো সেই বাবাকে মনে পড়ত। আর তিন বোনই বাবার ধারা। সবারই মাথা কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

কি, পাওয়া গেল জনার্দন দেয়া!

না রে সেজদা! কোন জেলার কথা এটা? বলেই বড় বোন বাণী সোফায় বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। তিন তলার ওপর নশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে তিনটে বেডরুম। দুটো টয়লেট কাম বাথরুম। সেখানে কমোড, ইন্ডিয়ান স্টাইল—সবই আছে। কিচেন একটা। ডায়েনিংটা বেশ বড়। একটা লিভিং রুম। সামনে চওড়া ব্যালকনি। চারতলা এই ফ্ল্যাট কো-অপারেটিভ ফর্ম করে করাতে খরচা বেশ কম পড়েছে। বিশেষ

করে রেজিস্ট্রেশন খরচ।

দমদম বিমান বন্দর যাওয়ার রাস্তায় সোজা না গিয়ে বাগুইহাটি পেরিয়ে বাঁ দিকে খানিকটা ঢুকে এলে পর পর বাজার, ঘর-বাড়ি, খাটাল, কাঁচা নর্দমা, বেড়া-দরমার দোকনা, কাঁচা রাস্তা—এসব দেখে ঘুরপাক খেতে খেতে ডাইনে বাঁয়ে করতে করতে একটা সিনেমা হল। খুবই সাবেক। ময়লা মতো। একাত্তর-বাহাত্তরে এসব জায়গায় খুন—পাল্টা খুন—খতম হত। এমন কি সিনেমা হলের ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এসে একবার দুবার গলা কাটাকাটি, কোপান—এসবই তখন ধু-ধু, ফাঁকা। আর এখন খালি জমি থাকা মানে তো সোনারও বাড়া।

এই যে সিনেমা হল, তার নাম 'বাসন্তী' হতে পারে কিংবা 'শ্যামলী'। অথবা 'বিভা'। উল্টো দিকে নতুন মাথাচাড়া দেয়া ফ্ল্যাটের নাম 'সৌহার্দ্য'। তার একতলার ফাঁকা জায়গাটিতে, সেখানে সিমেন্ট রঙ মেঝের ওপর জিঙ্ক অক্সাইডের আলপনা। মেহগনির হাতলঅলা কালো চেয়ারের ওপর মায়ের ছবি—এই সত্তর পেরনোর পর। কপালে—কাচের ওপর চন্দনের টিপ। মুখে, কপালে চন্দনের শাদা ডিজাইন। গলায় অনেক মালা। সবই শাদা। রজনীগন্ধা, যুঁই। তার ওপর কালো কালো মাছি। কেন যে অ্যাত মাছি আসে! ভাবতে ভাবতে নবেন্দু দেখতে পায় বাইরের শেষ চৈত্রের রোদ তার অভ্যেস মতো গরম স্প্রে করে দিচ্ছে। গা চিড়বিড় ঘাম।

গোছা ধরা শ্বেতপদ্ম। ফুলের মালা। একসঙ্গে বাঁধা রজনীগন্ধা। সব বেশ সাজিয়ে রাখা চেয়ারের আশেপাশে। মায়ের ছবি ঘিরে। যাঁরা সকালে এসেছিলেন, শ্রাদ্ধবাসরে—তাঁদের চলাফেরা, হাসি, রুটিন-বিষাদ, শরবত মিষ্টি খাওয়া বা না খাওয়ার স্মৃতি ভিডিও ফিল্মে যেভাবে আটকান হয়েছিল, তা এখন চালিয়ে দেখে নেয়া যাচ্ছে রঙিন টিভি-র স্ক্রিনে॥ শোক, বিষাদ, যোগাযোগ—কি, কেমন আছেন? ভালো তো! সবাই সেই ছবি থেকে খানিকটা খানিকটা দেখতে পাচ্ছে এই ঘরে বসে।

কি বলতে পারছ কেউ, জনার্দন দেয়া?

না, সেজমামা। তুমি না লিঙ্গুইস্টিকের ওপর কাজ করতে করতে—

লিঙ্গুইস্টিক নয় রে পাগল, কথাটা আমার শিকড়ের। জনার্দন দেয়া মানে হল—কি বলতে পারবি না—এটুকু বলেই নবেন্দুর চোখে কৌতুক নাচে।

না—পারব না। এমন ইশারায় ঘাড় নাড়ে বোনেরা। বোনেদের স্বামীরা, ছেলেরা, তারাও না বলে দেয়। বড়দা এখন এখানে নেই। আজকের দৈনিক কাগজগুলো খুঁটিয়ে পড়ে নিচ্ছে। মা-ও তাই করতেন। বাড়িতে অনেকগুলো কাগজ আসে। পাঁচটা বাংলা ডেইলি। দুটো ক্যালকাটা-বেসড ইংরেজি দৈনিক। এখন তো 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-ও কলকাতা সংস্করণ করছে। তাও আসে।

শিখর যে কোম্পানিতে পি আর ও, তারাই অ্যাতগুলো কাগজের পয়সা দেয়। এর সঙ্গে আবার ফিনানসিয়াল ডেইলি আছে একটা।

বাবা, রঙটা ঠিক আছে? লাউড হয় নি তো! শিখর সকালের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডিং দেখাতে দেখাতে জানতে চায়।

না, ঠিকই আছে। রঙটা চড়া হয়ে গেলে বাজে লাগে। বলতে বলতে নবেন্দু টিভি স্ক্রিনে ফুটো ওঠা তার খালি গা, ন্যাড়ামাথাঅলা ছবির দিকে তাকাল। বেশ লম্বা টান টান শিরদাঁড়া। শরীরে বাড়তি মেদ একেবারে নিই।

ট র রং ট র রং—শিখরের মোবাইল বাজছে।

হ্যালো—শিখর হিয়ার—বলতে বলতে কানে মোবাইল লাগান বছর পঁয়ত্রিশের শিখর ভট্টাচার্য ব্যালকনির দিকে চলে গেল। ওরও মাথার চুল পুলু, নয়ত আমার বাবার মতোই লালচে অর পাতলা হবে। সেই জিনের খেলা। বংশগতি। কিছু করার নেই। ভাবতে ভাবতে নবেন্দু বলে উঠল, কি পাওয়া গেল—জনার্দন দেয়া?

কোনো উত্তর নেই। খালি মেজ বোন শীলা বলে উঠল, সেজদা বোধহয় জামাই ঠকান প্রশ্ন শুরু করল এবার।

কথাটা ঢাকার। জনার্দন দেয়া মানে হল—গায়ে কাঁটা দেয়া। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা।

ঢাকার কথা তুমি জানলে কি করে?

বাঃ, বড় মাসির বিয়ে হয়েছিল না ঢাকায়। সেই মেসোমশাই এই শব্দটা ব্যবহার করতেন। খুব শীত করলে বলতেন, গায়ে জনার্দন দিতাসে। এই মাসির নাম ছিল ভিক্টোরিয়া। ইনি মায়ের বড়দি। আড়াই বছরের বড় মায়ের থেকে। দাদামশাই ছিলেন নাটোরের জমিদারের দ্বারপণ্ডিত।

নাটোর মানে বনলতা সেন—জীবনানন্দ দাশ।

হ্যাঁ—খুব জীবনানন্দ ফলাচ্ছ! সেন্টিনারি ইয়ার গেল তাই—না কি! বলতে বলতে নবেন্দু তার সেজ বোনের মেজোমেয়ে সোনাঝুরির দিকে তাকাল।

বছর সাতাশের সোনাঝুরি বয়েজ কাট মাথাটি নিচু করে বলল, নাটোরের আরও কি একটা যেন ডিলিশাস—সামথিং—

তোমাদের মায়ের দাদু নাটোর জমিদারের দ্বারপণ্ডিত আর তুমি বনলতা সেন ছাড়া নাটোরের আর কি সামথিং ডিলিশাস খুঁজছ!

কি যেন ছিল সেজমামা?

ছিল কেন! এখনও হযত আছে। নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

ও ইয়েস। মা যেন বলেছিল একবার। বলতে বলতে সোনাঝুরি মাথা তুলল।

তো হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই ভিক্টোরিয়া মাসিমার পরের বোন এলিজাবেথ। তারপর মা। বিভাবতী।

পরপর দুটো সায়েবি নাম। তারপর একেবারে পাতিবাঙালি দিদা। বলে সরু ফ্রেমের চশমা সমেত চোখ নাচিয়ে হাসল বিচ্ছু।

সোনাঝুরি তার প্রায় সমান বয়েসী মাসতুতো ভাইয়ের আরও গা ঘেঁষে বসে বলল, কি সব পাতি ফাতি বলছিস! মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ ইয়ার। সেজোমামা, তুমি বল—

সেই এলিজাবেথ মাসিমা—তাঁর বিয়ে হয়েছিল চন্দননগরে। মেসোমশাই ফরাসি পুলিশে বড় চাকরি করতেন। তাঁর মুখে—মানে সেই এলিজাবেথ মাসিমার মুখে আমি 'জোঁদা টক' শব্দটি প্রথম শুনি।

কি বললে কথাটা! সোনাঝুরি কান খাড়া করল।

জোঁদা টক। এর মানে বলতে পারবি?

কি হবে আবার! খুব টক বা একরম কিছু।

ঠিকই ধরেছিস। কড়া টক। যে টকে দাঁত টকে যায়।

ক্যামেরা এখানে ঠিক ধরতে পারেনি। দিদাকে আউট অফ ফোকাস করে দিয়ে—

তুমি চুপ কর তো তিন্নি। ফিল্মের একটা ল্যাঙ্গোয়েজ আছে। দিদাকে ফেড আউট করে গীতা, কালো তিল, তুলসি গাছ, দানের কাঁসার বাটি, কলসি, কাপড়, গামছা—এসবের ওপর ক্যামেরা চার্জ করে আসলে আমাদের হেরিটেজ, কালচারকে কিছুটা প্রোজেক্ট করা আর কি—বলতে বলতে বিচ্ছু তার জিনসের বারমুডার পকেটে হাত রাখল।

তিন্নি তার পিসতুতো ভাইয়ের কথা তখনই মেনে নিল না। খানিকটা তর্ক-বিতর্ক তো চলতেই থাকল।

নবেন্দু দেখল টিভি-র পর্দায় 'শাণ্ডিল্য গোত্রস্য প্রেতস্য' বিভাবতী ভট্টাচার্যের রঙিন ছবি দৌড়ে যাচ্ছে। সেই জামা-কাপড়, চা-কফির কাপ, শরবতের গ্লাস, মিষ্টির ডিশের আড়ালে তিরাশি পার করা কাচে বাঁধানো বিভাবতী ভট্টাচার্য ক্রমশ জেট বিমানের ধোঁয়া। আবছা, কুণ্ডলী পাকান।

এস সুদীপ্ত, পিনাকী—বলতে বলতে ইজিচেযার থেকে নিজেকে যেন একটু তুলে ধরল নবেন্দু। তারপর বলল, বোস তোমরা।

আসতে দেরি হয়ে গেল।

আরে না না। ছুটিছাটা থাকলে না হয় কথা ছিল। কাজের দিন না। সবারই তো অফিস-কাছারি, কলেজ নয়ত অন্য কর্মস্থল আছে।

সেজমামা কাল যে পিণ্ডদানের অধিকার—এসব নিয়ে তুমি বলছিলে না। গল্পটা শেষ হয়নি। লোডশেডিং হয়ে গেল। জেনারেটর চলল। তুমি আর বললে না। শুধু মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ন্যাড়া হওয়ার কি আরাম রে। মাথাটা কেমন হালকা আর ফুরফুরে লাগে। চুল আঁচড়ান, তেল মাখা, শ্যাম্পু করার ঝামেলা নেই। চুল কাটাতে গিযে সেলুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট—তাও করতে হয় না।

আমার চুল অবশ্য তোর সেজমামি কেটে দেয়। বহু বছর সেলুনে যাই না। বলে নবেন্দু একটু যেন পাশ ফিরেই বলল, পিনাকী সুদীপ্তকে মিষ্টি দাও।

না, না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

আরে খাও। খাও। বলে নবেন্দু আবারও নিজেকে এলিয়ে দিল ইজিচেযারে।—বিচ্ছু, কি যেন শুনতে চাইছিলি তুই!

সেই তোমার ঠাকুর্দার পিণ্ড দেয়ার লোক বাঁচিয়ে রাখার গল্প।

সেটা বলব এখন? শুনবে সবাই! নাকি বোর হবে! আচ্ছা, বিচ্ছু, সোনা—আমি কি একটু বেশি কথা বলছি। যাকে বলে বকবকানি। বুড়ো হলে মানুষ যা করে?

তুমি আবার বুড়ো কোথায় হলে সেজোমামা! দাঁত পড়েনি। চুলও তেমন পাকে নি। মাথা ভর্তি ঢেউ খেলানো চুল। চোখে খালি যা চশমা। সে তো মায়ের কাছে শুনেছি

তোমার চশমা বহুদিনের।

ঐ ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই চোখে চশমা। এও সেই বংশগতি। জিনের খেলা। কিছু করার নেই। তবে এখন তো জিন বদল টদল করে নানারকম কাজ টাজ হচ্ছে। রোগ সারান হচ্ছে। সে সব অন্য ব্যাপার। তবে একটা কথা কি জানিস, বয়েস হলে কিছু ইচ্ছে করে না।

কি ইচ্ছে করে না সেজোমামা?

এই ধর বেশি নড়াচড়া করতে। ইজেচেয়ারে শুয়ে আছি তো শুয়েই আছি।

নবু, ওগুলো ফেলার ব্যবস্থা—

গঙ্গা তো আর কাছাকাছি নেই বড়দা। তবে খাটাল আছে পাড়াতেই। নতুন কয়েকটা হয়েছেও। সেখানে গোরু বা মোষের ডাবাতে দিয়ে দেবে। ইজিচেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে বলল নবেন্দু।

কে দেবে?

কেন মালতির মা। তোমার বৌমা সব ব্যবস্থা করেছে।

তা-লে ঠিক আছে। আসলে আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যের আগেই তো ওগুলো জলে বা বাইরে দিয়ে আসতে হবে। কুশ তো জলে ফেলা যাবে না। পাড়ে ফেলতে হবে। পিণ্ড সব জলে। এনিয়ে একটু চিন্তা ছিল।

দাদা, তোমার মনে আছে দেশের বাড়িতে ঘুড়ি ওড়ান?

পিণ্ডদানের লোককে আটকে রাখার ব্যাপারটা কিন্তু গুলিয়ে যাচ্ছে। সোনাঝুরির গলায় ঢেউ উঠল।

আরে দাদার ঘুড়ি ওড়ানর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।

কি রকম! বলতে বলতে সোফায় নড়ে বসল তিন্নি।

তাহলে বলি?

বলতেই তো বলছি।

আমার ঠাকুর্দা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন তখনকার গ্র্যাজুয়েট। চাকরি করতেন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। অবিভক্ত ভারত। বাংলা ভাগেরও তাই প্রশ্ন নেই। সেটা উনিশশো উনচল্লিশ-টল্লিশ হবে। সম্ভবত লিনলিথগো তখন বাংলার গভর্নর। নাকি আর কেউ হবে! সে সব চুলোয় যাক। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তখন রিটায়ার্ড পার্সন। লাটসাহেব স্টিমারে চড়ে পদ্মা দিয়ে যাবেন। উদ্দেশ্য দু পাশের গ্রাম পরিদর্শন।

খবরটা শুনেই ঠাকুর্দা আমার আর দাদার হাত ধরে নদীর পাড়ে। তাঁর পরনে বহু পুরনো ঢিলে প্যান্ট, গলা বন্ধ চিনে কোট। মাথায় শোলার হ্যাট। পায়ে শু্য। সবই যে খুব ঝকঝকে, তা নয়। তবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য বড় লাটের স্টিমার দেখার আশায় পদ্মার পাড়ে তাঁর দুই নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পাইলট-স্টিমার ভোঁ দিতে দিতে আকাশে ধোঁয়া বুলিয়ে জল তোলপাড় করে চলে গেল প্রথমে। তারপর লাটসাহেবের বিশাল স্টিমার। তাকে তো জাহাজই বলা যায় প্রায়। সেটা চলে গেল। খুব ঢেউ উঠছে জলে।

স্টিমারের ভোঁ না শোনা পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তো রীতিমত অস্থির। বার বার দাদাকে জিজ্ঞেস করছেন, কিরে দেখতে পাচ্ছিস, এল, এল স্টিমার? তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। একেবারে দেখতে পান না। কোথাও বেরলে সঙ্গে বাড়ির কাজের লোক জুড়ান-ভাই থাকে আর দাদা। দাদার হাত তিনি কখনও ছাড়েন না। পাছে পিণ্ডদানের প্রকৃত অধিকারী ফসকে যায়।

ঐ যে, ঐ যে দেখতে পেলি। সোনাঝুরি বেশ একটু জোরেই বলে উঠল।

কি দেখব! কাকে! জানতে চেয়ে বিচ্ছু ঘাড় তুলল।

দেখলি না, কবি তথাগত সান্যাল। এই বয়েসেও কি স্মার্ট। এখনও কি দারুণ প্রেমের কবিতা লেখেন। অসম্ভব রোমান্টিক। যেমন চেহারা। তেমনি গলার স্বর। আর শব্দের ব্যবহার। আমার তো ফিদা হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। বলতে বলতে সোনাঝুরি তার বয়েজকাটে আঙুল ছোঁযাল।

শেষে ঐ বুড়োর সঙ্গে ফিদা! মনে মনে ভেবে শব্দ না করে হাসল বিচ্ছু।

টি ভি-র পর্দায় সকালে শ্রাদ্ধবাসরে তোলা ছবি নিয়ম করে দৌড়ে যাচ্ছে। কোনো কথা নেই। শব্দ নেই।

কি, তোমাদের টিভি অ্যানালিসিস শেষ হল? এবার বন্ধ কর তো ওটা। সবাই কথা বলছে। সেখানে আমি কি বলব!

থাক না সেজদা। কে বলল বাণী, নাকি জযা? বযেস হলে সকলের গলাই কেমন যেন প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। যেমন থাকে শৈশবে। আমরা সবাই এক সময় একই বাড়িতে থাকতাম। একসঙ্গে খেতে বসতাম। লম্বা লেপের নিচে ঘুম দিতাম শীতে। পুজোয় একই রঙের কেনা ছিটের জামা। সেই আমরা সবাই এখন কত দূরে দূরে। কত কম দেখা হয়।

কয়েকটা শাদা পদ্ম টিভি-র পর্দায় ভেসে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

বেশ করেছে। ফিনিশিংটাও আর্টিস্টিক। বলেই তিন্নি সোজা হল সোফার ওপর।

ও, সে লাটসাহেব আসার আগে ঠাকুর্দা তো ভয়ানক অস্থির। বারবার দাদাকে জিজ্ঞেস করছেন, চারপাশে কি, কে? স্টিমার দেখা যাচ্ছে! দেখতে পাচ্ছিস? ধোঁয়া দেখা গেল?

দাদা বলছে, না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি দাদা, তাইত?

সুখেন্দু ভট্টাচার্য ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ।

তারপর এক সময় জলে ঢেউ তুলে ভোঁ দিতে দিতে পাইলট-স্টিমার চলে গেল। পেছনে পেছনে লাটসাহেবের স্টিমার।

দাদা চেঁচিয়ে উঠল, এসে গেছে। এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে স্যালুট দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

ঠাকুর্দা আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি মনে হয়, লাটসাহেব দেখলেন?

দাদা বলল, হ্যাঁ।

দাদার মুখ থেকে হ্যাঁ শুনে নিশ্চিত হলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। বললেন, এবার বাড়ি চল।

এর সঙ্গে পিণ্ডদানের অধিকারীর কি সম্পর্ক?

আছে। আছে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর বড় নাতিটিকে এ জন্যেই বেশি আগলে রাখতেন।

ছেলের পর তো বড় নাতিই জলপিণ্ড দেবে তাঁর নামে। তাতে পরিষ্কার হবে পরলোকের রাস্তা।

তিনি রেগে গেলে বলতেন, আভি নিকালো। আভি নিকালো। দেশের বাড়িতে 'স্টেটসম্যান' আনাতেন ডাকে। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নিজে তো পড়তে পারতেন না। দাদা পড়ে দিত। চিৎকার করে সারা বাড়ি শুনিয়ে পড়ত। সেই থেকেই দাদার খবরের কাগজের অভ্যেস।

আর সেই প্লেনের গল্পটা?

কোনটা বল তো। বলে সুখেন্দু বিচ্ছুর দিকে তাকাল।

সেই যে তুমি খুব ছোটবেলায় আকাশে উড়ে যাওয়া প্লেন দেখলেই বাড়ির উঠোন থেকে চিৎকার করে বলে উঠতে, গুলি করে গা। গুলি করে গা।

কেন যে ওরকম বলতাম জানি না। বলে সুখেন্দু তার ন্যাড়া মাথায় হাত দিল।

তাতো আমরাও জানি না। তবে তুমি বলতে। আর তা শুনে ঠাকুর্দা বলতেন, এইবার আমার সরকারি পেনশন কাটা যাবে। পেনশন কেটে গেলে বাড়ির অ্যাতজনকে খাওয়াব কি! বলতে নবেন্দু আবারও ইজিচেয়ারে টান হতে চাইল।

কেন, এরকম ভাবতেন কেন?

তিন্নির কথার উত্তরে নবেন্দু বলল, ঠাকুর্দার ধারণা ছিল প্লেনের পাইলট সরকারি চাকুরে। তিনিও সরকারি চাকুরিয়া ছিলেন। তো সরকারি চাকুরে আর এক সরকারি চাকুরের উঠোন থেকে বলে ওঠা 'গুলি করে গা'র ব্যাপারটা রিপোর্ট করবে। ব্যস, হয়ে গেল। সরকার ক্ষেপে গিয়ে পেনশন বন্ধ করে দেবে। সবাই মিলে তখন না খেয়ে মরা। মজাটি টের পাওয়া যাবে।

কিন্তু পিণ্ডদানের অধিকারীর ব্যাপারটা এখনও ক্লিয়ার হল না।

আরে সে তো আর এক গল্প।

তো সেটাই বল সেজোমামা।

একবার দাদা খুব বায়না করল ঘুড়ি ওড়াবে বলে। ভয়ানক বায়না। ঠাকুর্দা তো প্রথমে শুনে কিছুতেই রাজি হয় না। কিন্তু দাদা তো ঠাকুর্দার বড় নাতি, সে থামবে কেন? তখন ঠাকুর্দা আর কোনো উপায় না দেখে আমাদের বাড়ির রাজবংশী কাজের লোক জুড়ানভাইয়ের শরণাপন্ন হলেন।

জুড়ানভাই বাবাকে বাবু আর ঠাকুর্দাকে কর্তা ডাকে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য জুড়ানভাইকে মানুষই মনে করতেন না। কারণ জুড়ানভাই ইংরেজি জানে না। ঠাকুর্দা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যারা ইংরেজি বলতে বুঝতে বা লিখতে পারে না, তারা সবাই মনুষ্যেতর জীব। যেমন জুড়ানভাই। মুনিষ রমজান। আমাদের যিনি ভাত ভেঙে খাওয়া শিখিয়েছিলেন, বাড়ির যে দাসী, তাঁর নাম নইমা—সেই নইমা। ঐ নইমা আমাদের শিখিয়েছিলেন বামনের পোলা, বাত আস্তে আস্তে ভাঙ। ভালো কইর‍্যা দেইখ্যা দেইখ্যা অল্প অল্প কইর‍্যা বাত মাখো। খাও। পাতের সব বাত বামনের খাইতে নাই। কিছু রাখতে হয়। নইলে কুত্তা, বিলোই, ছোটজাত কি খাইব! সে সব অন্য গল্প। এখন দাদার ঘুড়ি ওড়ানর কথায় ফিরি।

ঠাকুর্দা দাদার ঘুড়ি ওড়ানর শখ মেটানর দায়িত্ব দিলেন জুড়ানভাইকে। ব্যস, জুড়ানভাইকে তারপর আর কে পায়! সে তো হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করে তুলল। কর্তার হুকুম। ঘুড়ি তৈরি করতে হবে। আর কোনো কাজে তাকে পাওয়া যায় না। এলাকার ঘুড়ি তৈরির সেরা কারিগরকে বাড়ি নিয়ে এল জুড়ান।

তারপর এক বালতি আঠা তৈরি হল। মাপ করে কাগজ কাটা হল ঘুড়ির। কাঁবকাঠি বুককাঠি। সে এক যুদ্ধপ্রস্তুতি যেন।

বাইরে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। যদিও চৈত্রের বেলা ফুরোতে দেরি হয়। কিন্তু দিন তো এক সময় চলেই যায়। হাওয়ায় জড়ান গরম ছ্যাঁকা দিয়ে যায় গায়ে।

নিচে থেকে ছবি, চেয়ার, মালা ফুলটুলগুলো—এসব নিয়ে আসা দরকার।

কথাটা শুনে দেশের বাড়িতে ঘুড়িলাটাইয়ের জগৎ থেকে ছিটকে এসে নবেন্দু দেখল সামনে লতিকা। প্রায় চল্লিশ বছরের বিয়ে করা অর্ধেক-জীবন।

তুমি একটু বল না কাউকে। ছবিটা যেন সাবধানে আনে। নবেন্দুর গলায় অনুরোধ।

আমরা তা-লে উঠি এবার। অনেক দূর যাব।

সুদীপ্ত, পিনাকী—তোমরা দুজনেই তো সাউথে যাবে। না, আর আটকাব না। এস। দুজনের মুখ দেখে ভালো লাগল। পরে সময় পেলে আবার এস।

ছবিটা আনবে কে? লতিকার গলায় তাড়া।

বল না বাবুইকে।

বাবুই ওর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে।

লতিকার কথা শুনে নবেন্দু বুঝতে পারল শিখরের আরও কয়েকজন বন্ধু এই বিকেল বিকেল এসেছে।

বাবুই কোথায়?

ওর ঘরে। ডাকব?

এখন থাক না হয়। একটু পরে ডেক।

সেজোমামা, তোমার ফোন। তিন্নি ফোন ধরে কর্ডলেস রিসিভার এগিয়ে দিল।

হ্যা-লো, হ্যাঁ। ভালোভাবে মিটে গেছে। না। না। বুড়ো হয়েছি তো। সহ্য করে নিতে হয়। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক আছে। পরশু রবিবার। পরশু মৎস্যমুখী। জ্ঞাতিদের পাতে মাছ দিয়ে তারপর আবার সব নর্মাল। মঙ্গলবার যাব ইনস্টিটিউসটে। হ্যালো। হ্যাঁ। সেমিনারের বিষয়টা সেদিন ঠিক করে নেব। তিন চারটে বিষয় একটু ভাববেন। যাঁরা রিসার্চার আছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটু কথা বলবেন। হ্যালো, রিপিট করছি। রিসার্চারদের সঙ্গে কথা বলে রাখবেন অবশ্যই। বুড়ো হয়েছি তো। রিপিটের অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা। আচ্ছা। আ-আ-চ্ছা। মঙ্গলবার দেখা হবে। ঐ সাড়ে এগারোটায় গাড়ি পাঠাবেন। যেমন পাঠান। আপনি তো আসতে পারলেন না। কি করবেন! নিজের মেসোমশাই। তাঁর ঘাট-কাজে আজকে। এতো কিছু করার নেই। মৃত্যু তো আর কাউকে বলে-কয়ে তিথি-নক্ষত্র দেখে আসে না। আপনার সব মিটে গেল তো ভালোয় ভালোয়? আচ্ছা, আ-আ-আ-চ্ছা। মঙ্গলবার। হ্যাঁ, মঙ্গলবার। ঠিক আছে।

বোতাম টিপে কর্ডলেসকে চুপ করিয়ে দিয়ে নবেন্দু বলল, কোথায় যেন ছিলাম?

ঐ যে তোমাদের জুড়ানভাই এক বালতি আঠা তৈরি করেছে, ময়দা দিয়ে। ঘুড়ির কাগজ কাটা হচ্ছে।

হ্যাঁ। লাটাই কেনা হল। সে বেশ বড় লাটাই। সুতো, বেলের আঠা, কাচগুঁড়ো। সে একেবারে যজ্ঞিবাড়ি।

এর মধ্যেই কয়েকদিন কেটে গেল। বড় নাতি যে ঘুড়ি ওড়াবে তার সাইজ জানতে চাইলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জুড়ানভাইয়ের কাছে।

এমন একটা মাপ বলল জুড়ানভাই যা কানে যাওয়ার পর রীতিমত ভয় পেলেন ঠাকুর্দা।

কেন, ভয় পেলেন কেন? বিচ্ছু জানতে চাইল।

জুড়ানভাই ঘুড়ির এমন একটা সাইজ বলেছিল ঠাকুর্দাকে, যাতে ঠাকুর্দার মনে হয়েছিল সেই ঘুড়ির টানে দাদা আকাশে উড়ে যেতে পারে।

সেজোমামা তোমার ফোন।

কে?

বলছে 'দৈনিক যুগের ডাক' থেকে। হ্যালো, কে শিবেন। বল ভাই। ভালোই আছি। আজ সকালেই তো দেখা হল। বাড়ি পৌঁছলে কটায়? স্ট্রেট অফিস চলে গেলে? দুপুরে খেলে কোথায়? কেন, ক্যানটিনে খেলে কেন! দুটো ভাত কি আমার বাড়ি খাওয়া যেত না! আরে অন্যদের জন্যে তো রান্না হচ্ছেই। হ্যাঁ, বল। ও লেখাটা! হ্যাঁ, দিয়ে দেব। দুটো বিষয় আমার মাথায় আছে। আমি লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভালো থেক। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—পরশু লোক পাঠিয়ে দিও। না, না, কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক আছে—

ওফ্! দাদার ঘুড়ি ওড়ান আর হচ্ছে না। হাতের ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল নবেন্দু।

শেষ অব্দি হলটা কি? ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল সোনাঝুরি।

ততক্ষণে চা এসে গেছে একরাউন্ড। সবাই পর পর চায়ের কাপ তুলে নিচ্ছে। বাইরের আকাশটা কালো হয়ে গেল নিয়মমতো। ঝকঝকের তারারা তার গায়ে বুটি হয়ে ফুটে উঠতে লাগল এক এক করে। শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমে দিতে হল মা-কে। কি যে এক ব্যবসা চলেছে নার্সিং হোমের নামে। এই টেস্ট সেই টেস্ট তাই টেস্ট। পর পর বিল। বিলের পরে বিল। তা আমরা ভাইয়েরা সকলেই খরচ করার মতো রোজগার করি। কিন্তু জোচ্চুরি দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না, চা নিতে নিতে এসবই মনে পড়ল নবেন্দুর। দামি চায়ের হালকা লিকার। সেদিকে তাকিয়ে নবেন্দুর মনে পড়ল মা যেদিন চলে গেলেন, তার দিন ছয় সাত আগে, মায়ের তো আর কোনো জ্ঞান নেই, বাড়ি ফিরে আমি লতিকাকে বলেছিলাম, এবার ওরা মায়ের অ্যাপেনডিকসটাও কেটে বাদ দেবে। একটা অপারেশন মানেই অনেক ডিসপোজেবল কিটস, ওষুধ, সার্জেন, নার্স, অ্যানাসথেসিস্ট—সব মিলিয়ে মোটা বিল। এসব বলতে বলতে নিজের এলোমেলো, অসহায় চেহারা আয়নায়

ফুটে উঠলে নবেন্দু আরও কেমন ভোম মেরে যায়। মা আমাকে ডাকতেন ব্যোমভোলা বলে। ছেলেবেলায় একবার বড় একটা বালতির মধ্যে পড়ে গিয়ে আমি একদম চুপ করে ছিলাম। সেই থেকে এই নাম আমার।

বলতে বলতে মনে পড়ে অনেক ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে কোন জ্যোতিষী নাকি নবেন্দুর হাত দেখে বলেছিলেন, তার হাতে এমন রেখা আছে যা বলে দেয়, তার সন্ন্যাস নেয়ার যোগ আছে।

বাবাও জ্যোতিষ চর্চা করতেন। তিনিও আমার হাত দেখে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন। আনন্দময়ী-মা একবার দেশের বাড়ির কাছাকাছি এসেছিলেন। বাবা গেছিলেন তাঁকে দেখতে। সঙ্গে আমি। আনন্দময়ী-মা নাকি অনেকক্ষণ আমায় কোলে নিয়ে বসেছিলেন। তাতে বাবার ধারণা আরও পাকা হয়েছিল এ ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তো সেই ছেলেই এখন সেমিনার অর্গানাইজ করে। খবরের কাগজে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। লিঙ্গুইস্টিক নিয়ে নানান তত্ত্ব খাড়া করে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথার ভেতর কি একটা সুরের বেজে ওঠা টের পেল নবেন্দু। কি রাগ! কি রাগ! হাতড়াতে হাতড়াতে মনে পড়ল নায়কি কানাড়া। গোপাল নায়ক তৈরি করেছিলেন এই রাগ। তিনি দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময়ের মানুষ। দিল্লিতে তখন সুলতানি শাসন চলছে।

ঘুড়িটা শেষ অব্দি কি ওড়াতে পারল বড়মামা?

না, তিন্নি। বড়দা শেষ অব্দি ঘুড়ি ওড়াতে পারল না। কিন্তু এই পেরে না ওঠাটাও একটা ইতিহাস। নায়কি কানাড়ার আলাপ, বিস্তার থেকে বেরিয়ে এসে বলল নবেন্দু।

কি, কিসের ইতিহাস?

তোমার মায়ের ঠাকুর্দা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য—বুঝলে বিচ্ছু, তিনি হাতলঅলা মেহগিনির ভারী চেয়ার পাততে বললেন উঠোনে। সেই চেয়ারে ঠাকুর্দা বসলেন গ্যাঁট হয়ে। জুড়ানভাই ঠাকুর্দার কথা মতো দাদাকে ঘুড়ি-লাটাই সমেত তাঁর কোলে এনে বসিয়ে দিল।

তারপর?

তারপর আর কি? ঘুড়ি সুতো সবই তো জুড়ানভাইয়ের হাতে। ঠাকুর্দাকে মুখে মুখে পুরো ঘুড়ি-পর্বটা রিলে করে শুনিয়ে যাচ্ছে জুড়ানভাই। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দু হাতে বেড় দিয়ে তাঁর নাতিকে চেপে ধরে বসে আছেন।

কেন, চেপে ধরে আছেন কেন?

এই তো বিচ্ছু, এটুকুও বুঝতে পারছিস না, গল্পটা যেখানে শুরু করেছিলাম—সেই পয়েন্টটা—অর্থাৎ পিণ্ডদানের অধিকারী, সে যদি উড়ে যায় ঘুড়ির সঙ্গে। তাহলে তো পিণ্ডপ্রাপ্তি হবে না পরকালে। গতিগঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবে। অনন্তকাল কাটাতে হবে রৌরব নরকে।

শেষ অব্দি ঘুড়ি কি আকাশে উঠল? সোনাঝুরি খানিকটা যেন অধৈর্যই হয়ে উঠেছে।

না, রে। জুড়ানভাই তার তত্ত্বাবধানে কারিগর ডেকে তৈরি করান ঘুড়ি কিছুতেই আকাশে তুলতে পারল না। এভাবে খানিকক্ষণ চলার পর দাদা বিরক্ত হয়ে—কি দাদা, কি

করলে তুমি? নবেন্দু তার বড় ভাইয়ের কাছে জানতে চাইল।

কি আর করব। ঠাকুর্দার কোল থেকে হ্যাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে পড়ে টেনে ছিঁড়ে দিলাম ঘুড়ি। জুড়ানভাই বলল, কত্তা ঘুড্ডি গেসে।

ঠাকুর্দা কিছু বললেন না। অল্প হাসলেন শুধু। এখন বুঝতে পারি তিনি মনে মনে বললেন, আপদ গেছে।

বাইরে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে।

লতিকা এসে বলল, কি আনবে না মায়ের ছবিটা? ওপরে আনার পর একটু ধূপ দেব। জল-মিষ্টি।

কে যাবি আমার সঙ্গে? নবেন্দু ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়েই বলল।

তুমি বোসো সেজমামা। আমরা আনছি—বিচ্ছু তিন্নি সোনাঝুরিরা এক কথায় তৈরি। দাদা, আমাদের চার নম্বর ভাই প্রণবেন্দু, বোনেরা—এখন কেউ আর এই ঘরে আশেপাশে নেই। মাথার ভেতর নায়কি কানাড়ার চাপা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে নবেন্দু। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই কাক তিনটে কোথা থেকে যেন উড়ে এসেছিল বাবুঘাটের কাদার ওপর। তিনটে কাক, নাকি চারটে? কিংবা আরও বেশি। টুকরো পাঁকাটির ঠেকনোর ওপর নতুন মাটির সরায় বেশ খানিকটা কাঁচা দুধ। গুটি গুটি পায়ে কাকেরা এগোচ্ছে। একটু আগে আমরা তিন ভাই পাশাপাশি বসে ন্যাড়া হয়েছি। খুব সাবধানে ক্ষুর চালাচ্ছিল নরসুন্দর। সাবধান এই জন্যে, ক্ষুরে কেটেকুটে গেলে শ্রাদ্ধে বসা যাবে না।

মস্তক মুণ্ডনের পর আমরা এক এক করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলাম। ভিজে কাপড়ে ভাত রাঁধতে হবে।

কাকেরা এগিয়ে আসছিল সরায় রাখা কাঁচা দুধের দিকে। তাদের ধারাল লম্বা ঠোঁটে চৈত্রের রোদ আটকে আছে। ঘাট-পুরোহিত প্রদীপ জ্বেলে সেই আগুনটুকুকে বাঁচানর চেষ্টা করছিল হাওয়া থেকে। তিনটে ইট সাজিয়ে পাঁকাটির আগুনে নতুন মাটির মালসায় জল চাল ফুটে ওঠানর চেষ্টা চলছিল। পাঁকাটির আগুন বড় জোরে জ্বলে। ধোঁয়া হয় বড্ড। তাতে চোখ জ্বালা করে। দম আটকে কাশি আসে।

নবেন্দু দেখতে পেল তার সামনে ভাত ফুটে উঠছে। সুগন্ধী চালের ভাত হয়ে ওঠার গন্ধ একেবারে অন্যরকম।

কি তুমি উঠলে ন'? মায়ের ছবিটা আনতে হবে যে। সন্ধে হয়ে গেল। লতিকা আবারও তাড়া দিল।

নবেন্দু বলল, যাই।

বরফের গায়ে আগুন

মাননীয় সম্পাদকমহাশয়,
ইয়ুথ অর্গানাইজেশন
সমাজ কল্যাণ সমিতি
ব্রহ্মপুর (বাদামতলা)
পো : গড়িয়া
কলকাতা ৭০০ ০৮৪
সবিনয় নিবেদন,

আমি আনারবানু বেওয়া (স্বামী-মরহুম শেখ আবদুল সর্তার, ঠিকানা- সাং-ব্রহ্মপুর, পোঃ ব্রহ্মপুর, থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৯৬, পশ্চিমবঙ্গ) এই মর্মে আবেদন করিতেছি যে, আমার পুত্র শেখ সুরাজের হার্টের দুইটি ভাল্‌ভই খারাপ এবং দুইটি ভাল্‌ভ এখনই বদল করা দরকার। এই অপারেশনের জন্যে বিপুল পরিমাণ টাকাকড়ি দরকার—তাহা আমার ন্যায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই জোগাড় করা সম্ভব নয়। আমার স্বামী আজ হইতে চৌদ্দ-পনেরো বৎসর আগে গত হইয়াছেন। আমি তিন বাড়ি বাসন মাজিয়া কোনোভাবে দিন চালাই। শেখ সুরাজের হার্ট অপারেশনের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দৈনিক ভোরের কাগজ-এ ৭ মে নিখিল সিদ্ধান্তর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই লেখার ভিত্তিতে ডাক মারফত বিভিন্ন জনের পাঠানো আর্থিক সাহায্য আসিতেছে। আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানে, কাহারও দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া এই আবেদন করিতেছি যে, আমার পুত্রের অপারেশনের আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব ব্রহ্মপুর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন (সমাজ কল্যাণ সমিতি) নিক। শেখ সুরাজের অপারেশনের জন্যে যে অর্থ মানি অর্ডার যোগে আসিতেছে, তাহার সবটাই ক্লাবের সম্পাদক জাহাঙ্গীর হালদার ও আমার নামে যৌথভাবে জমা থাকিবে। আমি কোনোভাবেই এই অর্থ অন্য কোনো খাতে খরচ করিব না। যদি আমার ছেলে শেখ সুরাজের অপারেশনের পর সাহায্য বাবদ আসা কিছু টাকা উদ্বৃত্তও থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার পরিবারের কেহ উক্ত টাকার উপর কোনো রূপ দাবি জানাইবে না। ঐ অর্থ অন্য কোনো দুঃস্থ ও দরিদ্রের চিকিৎসার নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে।

নমস্কারান্তে
ইতি
আনারবানু বেওয়া
(টিপ সই)

ব্রহ্মপুর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, সমাজ কল্যাণ সমিতির ক্লাবঘর পাকা হয়েছে বছর চারেক হয়ে গেল। একবার ভোটও হয়ে গেল ক্লাবের পাকা ঘরে।

একতলায় রাস্তার দিকে গোটা ছয়-সাত দোকানঘর। সব ভাড়া হয়ে গেছে। টিভি, লেডিজ টেলার্স, বালি সিমেন্ট লোহার রড, টেপ ক্যাসেট, রেডিমেড জামা-কাপড়—পাশাপাশি। মাস ভাড়া ছ'শো। অ্যাডভান্স হাজার পনেরো। একটা বড় ঘর আছে ক্লাবের। সেখানে দুটো

টিভি। একটা রঙিন—একুশ ইঞ্চি। শাদা-কালো চোদ্দ ইঞ্চি।

ক্লাবঘরের উলটো দিকে পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং। প্রোমোটার, ডেভেলপার। হালকা হলুদের ওপর কালোয় লেখা। সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে অফিস।

নিখিলদা, আপনি চিটিটা একটু দেকে দিন। হাশেম মাস্টারকে দিয়ে লিকিয়েচি। সব ঠিক আচে তো—বলতে বলতে ইসলাম আলি মোল্লা শাদা ফুলস্কেপ কাগজে লেখা দরখাস্তটি আমার সামনে বাড়িয়ে দিল।

বাইরে মে মাসের ছ্যাঁকা লাগা পৃথিবী। রোদের দিকে বেশিক্ষণ তাকান যায় না। পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং-এর অফিসের চেয়ারে বসে আছি। টেবিলের ওপারে ইসলাম আলি মোল্লা, সোফিয়েল পুরকাইত, বাদল চট্টোপাধ্যায়। তিনজনে পার্টনারশিপে জমি কিনে—ঠিক কিনে নয়, কিছু টাকা বায়না দিয়ে মালিকের কাছ থেকে ধরে রেখে মাটি ফেলে উঁচু করে, ড্রেসিং করার পর বেচে দিচ্ছে। বিঘের পর বিঘে জমি। শালি জমি বাস্তু হয়ে যাচ্ছে। পুকুরে রাবিশ ফেলে বুজিয়ে দিয়ে দিব্যি বাস্তু জমি। এসব খুব চলছে। এর নাম ডেভেলপিং।

হাশেম লিখেছে, ঠিকই তো আছে ইসলাম।

না, তাও আপনি একটু দেকে দিন নিখিলদা। আপনি পেপারে লিকলেন বলেই না টাকা আসচে।

সে আসুক টাকা। কিন্তু এক লাখ তিরিশ হাজার জোগাড় করতে হবে ইসলাম। অপারেশনের মিনিমাম খরচ। বলে নিখিল শাদা কাগজের ওপর হাশেম আলি ঘরামির লেখা দরখাস্ত দেখতে লাগল।

পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং-এর অফিস তেমন বড় নয়। কত হবে! ছয় বাই আট ফুট। লম্বাটে ঘর। বড় টেবিল একটা। গোটা পাঁচেক কাঠের চেয়ার। গোটা তিন প্লাস্টিকের টুল। একটা বড় সোফা। খুব ঠাসাঠাসি সব। দেয়ালে ইলেকট্রনিক কোয়ার্জ।

সেই পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং-এর পার্টনার ইসলাম আলি মোল্লা একদিন এসে হাজির নিখিল সিদ্ধান্তর কাছে। বছর আটচল্লিশের নিখিল 'ভোরের কাগজ'-এর সিনিয়ার রিপোর্টার। তা প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল তার এই লাইনে। কেরিয়ার শুরু সাপ্তাহিক 'বিহঙ্গ'তে। তারপর 'দৈনিক ভারত'। শেষে 'ভোরের কাগজ'। সেসব কথা বলতে গেলে পেল্লায় কিছু একটা লিখে ফেলতে হবে। নিখিলের দুই মেয়ে—ক্লাস টেন, ক্লাস সেভেন। দু'জনেই সকাল পৌনে আটটার মধ্যে স্কুল বাস ধরার জন্যে নিখিলের স্কুটারের পেছনে চেপে বসে।

ন'টা বাজতে পাঁচে বেরোয় গার্গী। তার চার্টার্ড বাস সওয়া নটায়। দিশি ব্যাঙ্কেও ইদানীং হাজিরার খুব কড়াকড়ি। বেরনো নিখিলেরই যা একটু দেরিতে। আবার ওদিকে ফিরতে অনেক রাত। কোনো কোনো দিন রাত বারোটাও। এখানে—এই ব্রহ্মপুর বাদামতলায় এগারো বছর হল বাড়ি করে এসেছে নিখিল সিদ্ধান্ত। চোখের সামনে দেখতে দেখতে কত কী বদলে গেল। রাস্তার ওপর এস টি ডি বুথ, রোলের দোকান, ঘড়ির দোকান, একটার পর একটা বড় স্টেশনারি, মুদিখানা, জলযোগ, বড়সড় মিষ্টির দোকান, শেয়ারের ফর্ম

দেয়ার ঠেক, বিউটি পার্লার, লেডিজ টেলারিং শপ। এস টি ডি বুথ হল অনেকগুলো। মেয়েদের চুল কাটান বিউটি পার্লারও বেশ কয়েকটা। কিন্তু গার্গী আর আমার দুই মেয়ে—কেউই এই পাড়াতুতো বিউটি পার্লারে চুল, ভুরু, গাল ঠিকঠাক করে না, মাজায় না। সে যাকগে। তো একদিন বুড়াই আর টুকাই—দুই মেয়েকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে স্কুটারে ফিরছি, রাস্তায় ইসলামের সঙ্গে দেখা।

ইসলাম রাস্তার পাশে নর্দমা-ঢাকা ঢালাই কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে। পেছনে জাকিরের ইমিটেশন গয়নার দোকান—বান্ধবী। শিবু নস্করের সবজির ঠেক। উলটো দিকে 'ফিরোজা স্টোর্স'। এ রাস্তার নাম ঋষি রাজনারায়ণ বসু রোড। রাস্তার যা অবস্থা, তাতে তাকে নাগরদোলা সরণি বা দোদুলদোলা অ্যাভিনিউ বললে বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হয়। পিন কোডে কলকাতার ভেতর—কলকাতা ৭০০ ০৯৬। আগে ছিলাম কলকাতা ৭০০ ০৮৪। পুরসভার একশো এগারো নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার আমরা। বিধানসভা, লোকসভা, পুরসভা—সবেতেই খুব উৎসাহ দেখিয়ে, লাইন দিয়ে ভোট দিই। কাছেই লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, নয়ত ইয়ুথ অর্গানাইজেশন-এর ক্লাব-ঘরে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা।

রাস্তা কিন্তু যেমনটি খারাপ, তেমনই থাকে। এবং ছোটখাট প্যাচ-ওয়ার্কের পর আরও খারাপ হয়। সকাল সাতটায় পর থেকে দশটা সাড়ে দশটা অব্দি বাদামতলা বা বালক সংঘের মাঠ থেকে উষা বাস স্টপ অব্দি পৌঁছন, এক জটিল অঙ্ক। রাস্তার দু'পাশে বাজার। অটো, সাইকেল রিকশা, সাইকেল, টু হুইলার, স্কুল ভ্যান, মারুতি, অ্যামবাসাডার, টাটা সুমো, আর্মাডা—সব মিলিয়ে বাস রে বাস! কী জ্যাম! কী জ্যাম! তার ওপর উষার কাঠের ব্রিজের কাঠ-ফাট খুলে টালির নালার বুকের ওপর ঢালাই পোল হচ্ছে। শুরু হয়েছে ১৯১৯-এর জানুয়ারি, নয়ত আটানব্বইয়ের শেষে। জল কাদা সরিয়ে সবে ঢালাইয়ের পাঁয়তারা চলছে এই মে মাসে। এরপর পিলার, আর কতদিনে এই ব্রিজ-পর্ব শেষ হবে কে জানে!

টালির নালা, তার ওপর ঢালাই ব্রিজ না হওয়া, টালির নালার দু'পাশে ঝুপড়ি, একেবারে বলতে গেলে বাঁশদ্রোণী থেকে গড়িয়া অব্দি—তাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় বসানর সমস্যা, সেইসব ঝুপড়ির লোকজন কোন কোন পার্টির ভোট ব্যাঙ্ক—এসব নিয়ে পাঁচ কিস্তির একটা নিউজ স্টোরি করেছিলাম 'ভোরের কাগজ'-এ। প্রথম দুটো ইনস্টলমেন্ট বেরোল পয়লা পাতায়—অ্যাঙ্কার হিসেবে। তারপর পাঁচের পাতায় আরও তিন দফায়। সে হয়ে গেল মাস এগার প্রায়—গেল বর্ষায়। আবার রাস্তাটা—আমাদের এই একশো এগারো নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি রাজনারায়ণ বসু রোড নিয়ে কিছু করা যায় কি না—এসব ভাবতে ভাবতেই ইসলামের ডাকে ব্রেক চাপল নিখিল।

নিখিলদা, সুরাজ আমাদের বাড়ির পাশে থাকে। হার্টের দুটো ভাল্‌ভই খারাপ। এখনই অপারেশন করতে পারলে ভালো হয়। বলতে বলতে ইসলাম তার পাশে একটু ঝুঁকে দাঁড়ান খুব রোগা লম্বা আর কালো একটি ছেলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সকাল আটটা বাজতে না-বাজতেই মে মাসের গা-পোড়ান রোদ জাকিরের ইমিটেশন গয়না আর কসমেটিক্‌স-এর দোকানের সামনে নর্দমার ওপর ঢালাই সিমেন্টের কালভার্ট

ছুঁয়ে ফেলেছে। বেশ জ্বালাপোড়া গরম যাকে বলে।

এই সব কাগজ নিখিলদা। এরপর আপনি যা করার করবেন।

আসলে এর আগে শেখপাড়া আর নতুনহাটের দু'টি কৃষক পরিবারের—একজনের বাড়ির বউয়ের কিডনি অপারেশন, অন্য জনের হার্ট অপারেশন ব্রহ্মপুর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন করিয়েছিল। একটা বাদ দিয়ে সবগুলো বাংলা কাগজে এই দুই পরিবারের কর্তার নামে চিঠি লেখান, তা পৌঁছে দিয়ে এসে তদবির-তদারক করে ছাপানর ব্যবস্থা করা—সবই করতে হয়েছিল নিখিলকে। সে আজ থেকে বছর নয়েক আগে। তখন ক্লাবের টালির চাল। পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেয়াল। দুটোই ঘর। একটা শাদা-কালো টিভি অবশ্য ছিল। সন্ধ্যে থেকেই মুর্শিদাবাদ থেকে আসা রাজমিস্তিরি আর জোগাড়েরা, 'হরেক মাল, সাড়ে ছ'টাকা' বলে বলে বিক্রি করা লোকজন—সবাই ক্লাবে টিভি দরশন লাগি।

ক্লাবঘরের সামনেটায় একটা ছোট ডোবা। সেখানে পাশের সবজির ঠেক থেকে যাবতীয় বাতিল সবজি, পাড়ার নানান আবর্জনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হত।

সে সময়টায় নিখিলও কখনও কখনও সকাল সকাল ফিরলে ক্লাবে খানিকটা বসে যাওয়া। আড্ডা। এই ক'বছরে সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আগেকার সেক্রেটারি বদল হল ভোটে। আইয়ুবের বদলে সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর হালদার। কালচারাল সেক্রেটারি ইসলাম আলি মোল্লা। এসব লাফঝাঁপের কাজ ইসলাম করে। জাহাঙ্গীর করে।

প্লাস্টিকের একটা ফোল্ডারের ভেতর শেখ সুরাজের হার্টের ভাল্‌ভ বদলানর ব্যাপারে কিছু কাগজপত্র। লোকাল কাউন্সিলারের সার্টিফিকেটের জেরক্স—সুরাজের মা আনারবানু বেওয়া ও সুরাজের মাসিক আয় পাঁচশো টাকার কম। এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পাওয়া শেখ সুরাজের মেডিকেল সার্টিফিকেট, প্রেসক্রিপশন, এখনই ভাল্‌ভ বদল করতে হবে—এমন ফরমান।

প্লাস্টিকের ফোল্ডারটি সুন্দর দেখতে। জলরঙের মলাট। ওপর দিয়ে সব দিব্যি দেখতে পাওয়া যায়। শিরদাঁড়ার কাছে সুন্দর নীল রঙ।

এটা আপনি রাখুন। যা করার করবেন। সব দায়িত্ব আপনার। বলে আমার হাতে প্লাস্টিকের সেই ফোল্ডার ধরিয়ে দিল ইসলাম।

প্লাস্টিকের পাতলা চৌকো জিনিসটি হাতে নিয়ে মনে মনে নিখিল বলল, এসব খবর এখন কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ইসলাম। খুবই কঠিন। দুটি বাংলা কাগজ তো কিডনি হার্ট কিংবা অন্য যে কোনো অসুখের ব্যাপারে চিঠি ছাপানো বন্ধ করেছে বহুদিন। তারা এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন ছাপে। বাকিরা চিঠি ছাপে! কিন্তু শুধু চিঠিতে কাজ হবে না। হরিপালে আমার বন্ধু মুজিবর রহমানদের 'অবলম্বন' বলে একটি সংগঠন আছে। তারা এ রকম হার্ট অপারেশন করায়, থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা করায়। ওরা সুদীপ কোলে নামে ভাণ্ডারহাটির এক খেতমজুরের বছর আড়াই-তিনের ছেলের হার্ট অপারেশন করাবে। আমার কাছে এসেছিল। কাগজপত্তর সব দিয়ে গেছে। দেখি, দুটো মিলিয়ে যদি—

সুরাজের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, আপনি একবার বাড়ি আসবেন তো।

সুরাজ ঘাড় নাড়ল।

ইসলাম বলল, কী ওকে আপনি আপনি বলছেন নিখিলদা! ও আমার থেকেও অনেক ছোট। বাচ্চা ছেলে।

কত আর বয়েস হবে! চব্বিশ-পঁচিশ বড় জোর।

সেদিন নয়। সুরাজ এল পরদিন সকাল দশটা নাগাদ।

দরজায় বেল টিপতেই খুলে দিল নিখিল।

লম্বা পাতলা পাতলা চেহারা। বেশ রোগা আর কালো। একপাশে ঘাড় সামান্য হেলিয়ে খুব আস্তে আস্তে কথা বলে।

ভাইবোন ক'জন?

এখন আমি এক ভাই। একলা। দিদি দু'জন।

দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

জামাইবাবুরা কী করে?

বড়-বু দুলারির সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সে কাঠ-মিস্তিরি। ছুতোরের কাজ করে। এই তো বাদামতলায় দেখতে পাবেন তাকে। ছোট-বু মরিযম—সেই দিদির বর কাচের কাজ করে। এখন বসা। দুই দিদি বাবুবাড়ি বাসন মাজে। মা-ও বাসন মাজে। আমি অটো চালাই।

শরীর খারাপ লাগে না অটো চালাতে?

লাগে তো। মাঝে মাঝেই লাগে। বেশি খাটনি করতে পারি না। দোতলায় উটলে হাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু ওষুধ তো লাগে। ইনজেকশান লাগে মাঝে মাঝে। অত টাকা কে দেবে? তাই সকালের দিকটা চালাই।

বাবা কী করতেন?

আব্বা টালিগঞ্জে গলফ কেলাবের কে ডি ছিল। সাযেবদের বল বইত। ইনকাম খারাপ ছিল না। রোজ চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা কামাত। যেমন দিত সাযেবরা খুশি হয়ে।

বাবা মাল-টাল খেতেন—মানে নেশা করতেন কি?

ঐ সায়েবরা খেত। তাদের ছেড়ে দেযা বোতল থেকেই খেয়ে বাড়ি ফিরত। নিজে কিনে খেত না। আব্বার খুব আদর ছিল সাহেবদের কাচে। ভালোবাসত। সেই আব্বা মরে গেল, তা হবে চোদ্দ বচর।

বাইরে মে মাসের গরম লাগা পৃথিবী। সকাল দশটা সাড়ে দশটাতেই রোদের দিকে তাকান যায় না। দরজা জানলা পেরিয়ে ছুটে আসা হাওয়ায় গায়ে ছ্যাঁকা লাগে।

কীভাবে মারা গেলেন বাবা?

ঐ যে দুশো পাঁচ-এ উটতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্, বাঁশধানি বাজারের কাচে। সঙ্গে দাদাও ছিল।

তোমার নিজের দাদা?

হ্যাঁ তো।

কী করত দাদা?

ফ্যানের কাজ করত। আমার থেকে তিন বছরের বড়। দুই দিদির পর আমরা দু'ভাই। তকন আমি ক্লোস ফাইবে পড়ি। দাদা ফ্যানের কাজ করে ভালো ইনকাম করে। আশির-এ বাস ওভারটেক করতে গেল দুশো পাঁচকে। দুশো পাঁচে উটতে যাচ্চিল আব্বা আর দাদা। দাদা সঙ্গে সঙ্গে শেষ। বাবার খুব চোট লাগল। রাস্তার পাবলিক খুব হইহই করল। বুজতে পারেনি দাদা শেষ হয়ে গেচে। হসপিটালে নিয়ে ঝেতে বলল, ফিনিশ হয়ে গেচে। আব্বা ভরতি রইল ছ'মাস। জ্ঞান আসার পর দাদাকে খুঁজত। খালি খুঁজত। মা চোকির পানি সামলে বলত, খালার বাড়ি গেচে। বাটানগর। আমার খালার বাটানগরে শাদি হয়েচে। খালু বাটা কোম্পানিতে চাকরি করে।

তারপর বাবা তো বাড়ি এল হসপিটাল থেকে, না কি?

এল তো। আব্বা বাড়ি এসেও মনমরা। খালি দাদার কতা জিজ্ঞেস করে। শেষে হার্টের গোলমাল। বুক ব্যতা। বুকের দোষ। মরে গেল। যে ক'দিন ছিল বাড়িতে শোয়াই থাকত আব্বা।

দিদিরা ক'বাড়ি বাসন মাজে?

দু'বাড়ি করে।

মা?

বোধহয় তিন বাড়ি। ঠিক বলতে পারব না। আমি তো দুপুরে বড়-বুর কাচে থাকি।

মানে দুলারির বাড়ি?

হ্যাঁ।

তাদের বাড়ি কোথায়?

ঐ যে কুমোরপুকুরের উলটো দিকে। সেখানেই তো থাকি আমি সারাদিন।

দিদির ছেলেপুলে?

দুই ছেলে, দুই মেয়ে।

দিদি তোমায় খুব ভালোবাসে, তা-ই না?

বড়-বু খুব ভালোবাসে আমারে। এই যে হার্ট্ অপরেশনের জন্য দৌড়োদৌড়ি সে তো দিদিই সব করচে। বাড়িতে খালি রাতে শুই। বলতে বলতে সুরাজ বাইরের আকাশ দেখল। তারপর বলল, এবার আমি যাই।

একটা রেজিস্টার্ড উইথ এডি করতে মিনিমাম চার্জ উনিশ টাকা। বটতলা পোস্ট অফিস থেকে শেখ সুরাজের হার্ট অপারেশনের জন্যে যেসব সংস্থার কাছে সব কাগজপত্র দিয়ে রেজিস্টার্ড উইথ এডি চিঠি পাঠানো হল, তাদের নাম একটা আট নম্বর বাঁধানো খাতায় পর পর লিখে রাখল নিখিল সিদ্ধান্ত।

১। প্রধানমন্ত্রী/ভারত সরকার।

২। মুখ্যমন্ত্রী/পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩। মেয়র/কলকাতা পুরসভা

৪। রাজ্যপাল/পশ্চিমবঙ্গ

৫। সাধারণ সম্পাদক/আমরা

৬। সাধারণ সম্পাদক/রামেশ্বর তাঁতিয়া স্মৃতি ন্যাস

৭। ট্রাস্টি নিরোল্যাক পেইন্টস

৮। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী/ভারত সরকার

৯। সম্পাদক/ওয়াটমূল ফাইন্ডেশন

১০। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী/পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১১। ফিরোজ শা গোদরেজ ফাউন্ডেশন

১২। চেয়ারম্যান/ভোল্টাস অর্গানাইজেশন অব উওমেন

১৩। রঘুনাথপ্রসাদ নাপানি ওয়েলফেয়ার ফান্ড

১৪। ডি. কে. শরাফ/আনন্দলোক

১৫। মেসার্স রামজীবন সারোগি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

১৬। সেক্রেটারি/ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর রিহ্যাবিলিটেশন ফর চিলড্রেন

১৭। শ্রী এল এন দাগা (জুসলা) চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

১৮। সেক্রেটারি/ইনটারন্যাশনাল মিশন অফ হোপ (ইন্ডিয়া) সোসাইটি

১৯। ট্রাস্টি/বাগাড়িয়া এডুকেশন ট্রাস্ট

২০। রাজন জৈন/অ্যাস্ট্রা ট্রাস্ট

বটতলা পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারটি বেশ। ব্যাচেলার। কথাবার্তা ভালো। কাগজে নিখিল সিদ্ধান্তর লেখাটি বেরোনোর কয়েকদিন পর থেকেই মানি অর্ডার আসতে শুরু করল। পঞ্চাশ, একশ, দেড়শ—এমনকি পাঁচশ টাকারও।

আনারবানু বেওয়া আর ক্লাব সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর হালদারের জয়েন্ট নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া হল বটতলা পোস্ট অফিসে।

মানি অর্ডার গোটা চারেক জমে গেলে নিখিলকে খবর দিয়ে যায় বিটের পিয়ন। তখন বেলা এগারটা সাড়ে এগারটায় পর আনারবানু বেওয়াকে নিয়ে নিখিলকে যেতে হয় পোস্ট অফিস। মানি অর্ডার ফর্মে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল স্ট্যাম্প প্যাডে ছুঁইয়ে টিপ দেয় আনারবানু। স্ট্যাম্প প্যাডের নীল কালি মাখা বুড়ো আঙুলের ধ্যাবড়া ছাপের তলায় নিখিল সিদ্ধান্তকে লিখতে হয়—দিস লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন অফ আনারবানু বেওয়া আইডেনটিফায়েড বাই মি—তলায় নিখিলের পুরো নাম।

মানি অর্ডারে আসা টাকা সঙ্গে সঙ্গে জমা পড়ে যায় পোস্ট অফিসে। নিখিল আর জাহাঙ্গীর বলে দিয়েছে পোস্ট মাস্টারকে—অভাবের সংসার তো। আসলে বুঝতেই পারছেন একেবারে দিন আনা দিন খাওয়া ব্যাপার। হার্ট অপারেশন বাবদ মানি অর্ডার এলে সেই টাকা খেয়ে নেবে। সবটাই পেটায় নমঃ।

প্রত্যেকটি মানি অর্ডার ফরমে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হয় নিখিল সিদ্ধান্তকে। এর মধ্যেই একদিন—এই জুন মাসের পনেরো-কুড়ি তারিখ হবে, আনারবানু বেওয়া আর সুরাজ—মায়ে ব্যাটায় এসে হাজির নিখিলের কাছে। তখন সকাল সাড়ে আটটা-টাটটা হবে। নিখিল রোজকার মতো সকালের কাগজ দেখছে। গার্গী অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি। মেয়েরা

স্কুলে চলে গেছে। রান্নাঘরে গনগন করে দুটো গ্যাস জ্বেলে রান্নার লোক প্রাণপণে তার দেরিতে আসার ফাঁকটুকু বোজাতে চাইছে।

সেই সময়েই দরজার বেল বাজিয়ে ভেতরে এল আনারবানু আর সুরাজ।

আনারবানুর রঙ বেশ কালো। চওড়া কাঁধ। হাত-পা-ও বেশ চওড়া। লম্বাও মন্দ নয়। মুখশ্রী অবশ্য বেশ খারাপ। দু'হাতে ঝকঝকে সোনালি চুড়ি। খাটো হাতার টাইট লাল ব্লাইজ। লাল-পাড় বেগুনি রঙের শাড়ি খুব টেনে পরা। হাতে ফোল্ডিং ছাতা।

অ দাদা, পোস্টাপিস থেকে বললে যেতে হবে—কী গণ্ডগোল হয়েচে টাকার।

সকালে এখন খুব ব্যস্ততার সময়। নিখিলকে গোটা দুই লেখা তৈরি করে অফিস যেতে হবে। তার সঙ্গে অন্য কাজ আছে।

বই নিয়ে যেতে বলেছে দাদা।

কে বলল ?

ঐ যে চিটি বিলি করে ছেলেটা—

নিখিল বুঝল বটতলা পোস্ট অফিসের ই ডি পিওন হারাধন ঘোষ আনারবানুকে খবরটি দিয়েছে।

বোস সুরাজ, আপনিও বসুন। বলতে বলতে নিখিল আনারবানুর দিকে চাইল।

পেটান স্বাস্থ্য। মাথার চুল টেনে আঁচড়ানর ফলে মযলাটে কপাল আরও চওড়া লাগছে। মাথার চুল কালোই। ঘোমটা কোনোরকমে খোঁপার ওপর ফেলা।

কই, রান্নাঘর কোতায়! বলেই আনারবানু রান্নাঘরের দিকে উঁকি দিল।

তারপর গার্গীকে দেখে—অ, এই বুজি বউদি—একে তো রাস্তাতেই দেকি। অটোর লাইনে—বলে আবারও ডাইনিং পেরিয়ে এসে ঘরে বসল।

সুরাজ তেমনি চুপচাপ বসে।

একটু যাবেন দাদা! টাকা নিয়ে আবার কী গণ্ডগোল হল!

নিখিল মনে মনে বলল, আচ্ছা ঝামেলা তো!

শোয়ার ঘরে বড় আযনার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির প্লিট ঠিক করতে করতে গার্গী বলে উঠল—মাসি, ভাত দাও।

অ বাবা, বউদির আবার আপিসের তাড়া আছে। তা দাদা, তোমায় তো একা একা ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে হয়। নাকি বল! কী ঝঞ্ঝাট! অ্যাতো নেকাপড়া। ব্যাটাছেলের এসব ঝামেলা পোষায়! আর খুকিরা তো সব ইস্কুলি, নাকি! সুরাজ বলছিল—এসলামও বলেছে তোমাদের দুটোই খুকি! বলতে বলতে কালচে মাড়ি বের করে হাসে আনারবানু। তার মাড়ির সঙ্গে সামান্য উঁচু দাঁতও বেরিয়ে আসে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কালচে ছোপ। নস্যি কিংবা তামাকের গুল দিয়ে মাজে কি! হতে পারে। ভাবতে ভাবতে নিখিল নিজের ভেতর গুছোচ্ছিল।

ঠিক আছে, আপনি চলে যান। সাড়ে এগারটা নাগাদ যাব পোস্ট অফিসে। আপনি থাকবেন।

বই কি সঙ্গে নিয়ে যাব দাদা ?

হ্যাঁ। পাস বই সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আমি কি সোনার দোকানে বসব?

না, আপনি পোস্ট অফিসে চলে যাবেন।

আচ্ছা দাদা। আমরা তালে আসি। চল সুরাজ। বউদি আমরা গেলাম। ভালোই হল, চিনেও যাওয়া হল দাদার বাড়ি।

লেখা তো মাথায় উঠল। পোস্ট অফিসে ডাকছে কেন? সেই ভাবনা নিখিলকে খোঁচাতে লাগল।

সাড়ে এগারটা নাগাদ পোস্ট অফিসে পৌঁছে নিখিল দেখল আনারবানু বাইরে দাঁড়িযে। হাতে ফোল্ডিং ছাতা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। শাড়ি ব্লাউজ সেই সকালেরই।

এই তো দাদা এসে গেচে—বলে হাসতে গিয়ে আবারও আনারবানুর কালচে মাড়ি, কালো ছোপ লাগা সামান্য উঁচু দাঁত বেরিয়ে এল। গলার আওয়াজও কেমন যেন খরখরে।

কী ব্যাপার বলুন তো—আমায় ডেকেছেন! বটতলা পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারের দিকে কথাটা যেন ছুঁড়েই দিল নিখিল।

ও কিছু না নিখিলবাবু। এঁরা দু'জন এনকোয়ারির জন্য এসেছেন বারুইপুর পোস্ট অফিস থেকে।

কেন, এনকোয়ারি কেন!

আপনি যেসব মানিঅর্ডার ফর্মে আনারবানু বেওযার টিপ ছাপ দেযার পর সই করেছেন, তার একটায় দেড়শ টাকার বদলে পঞ্চাশ টাকা পেযেছেন বলে লিখে সই করেছেন। যিনি টাকা পাঠিয়েছেন, তিনি জামশেদপুরের লোক। দেড়শ টাকা পাঠিযে তার কাছে যে মানি অর্ডার কুপন গেছে, তাতে পঞ্চাশ টাকা দেখে তিনি ঐ কুপনের জেরক্স দিয়ে সোজা এক কমপ্লেন লেটার ঝেড়েছেন। তাই এনারা এসেছেন—এই দু'জন—মিস্টার ভদ্র আর মিস্টার মজুমদার, এনকোযারিতে।

তা এখন কী করতে হবে আমায?

কিছুই না নিখিলবাবু। ওরা দু'জন পাস বইটা একটু চেক করবেন। তারপর আপনাকে দিয়ে একটা লিখিয়ে নেবেন যে, আপনি আসলে মানি অর্ডার বাবদ দেড়শ টাকাই রিসিভ করেছেন।

ওঁরা যে এসেছেন, ওঁদের তো আমার বাড়ি পাঠাতে পারতেন। আমার তো একটা ঠিকানা আছে না কি! নিখিল সিদ্ধান্তর গলা থেকে আরও খানিকটা তেতো বেরিয়ে এল।

আপনি এক্সাইটেড হবেন না নিখিলবাবু।

এক্সাইটেড হচ্ছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে আনারবানুর ছেলের চিকিৎসার জন্য আসা টাকার ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

আপনি একটু টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বুঝুন। আপনি, আনারবানু বেওয়া, পোস্ট অফিসের পাস বই, আমার ডেলিভারি পিওন—সবাইকে তো একসঙ্গে পেতে হবে মিস্টার ভদ্র আর মিস্টার মজুমদারের। যেহেতু ওঁরা এনকোয়ারিতে এসেছেন। প্লিজ, ব্যাপারটা একটু বুঝুন। বলতে বলতে ব্রহ্মপুর বটতলা পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার বেশ গলা

তুলেই ডাক দিলেন, গোপাল—অ্যাই গোপাল ! এই গোপালটা যে কোথায় থাকে না। যখনই ডাকি তখনই পাই না।

নিন, কী লিখতে হবে লিখে দিন, আমি তার তলায় সই করে দিচ্ছি।

এনকোয়ারিতে আসা ভদ্র রোগাসোগা। খাপটা গালে সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। মজুমদারের ভারি গাল। চোখে বেশ পাওয়ারঅলা চশমা। দাড়ি গোঁফ কামানো গাল। দু'জনেই প্যান্ট-শার্ট।

এনকোয়ারিতে আসা অফিসার দু'জন খুঁটিয়ে আনারবানুর টাকা জমা দেয়ার পাস বই দেখল। তারপর সে দিনের পোস্ট অফিসের টাকা জমা নেয়ার এনট্রি দেখল। বারবার আনারবানুকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ঐ দিন আর কোনো টাকা জমা দিয়েছেন ? তুলেছেন কিছু ! আনারবানু ঘাড় নাড়ল—না।

ভুল করে দেড়শ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা লিখে সই করেছি। এটা নেহাতই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে যেমন লিখতে হয়, তেমনি হাবিজাবি লিখে দিল তদন্তে আসা সরকারি অফিসার। তার নিচে সই দিল নিখিল সিদ্ধান্ত। আর আনারবানুর টিপ সই। তারপর তারিখ।

বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের কালি মাথার চুলে মুছতে মুছতে আনারবানু বলল—তাহলে দাদা, আমি যাই ?

নিখিল সিদ্ধান্ত ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, যান।

বইটা নিয়ে যাব তো ?

হ্যাঁ, নিয়ে যাবেন। বলে পোস্টমাস্টার হাঁক দিলেন—অ্যাই গোপাল। গোপাল রে। যা, চা নিয়ে আয়।

আমি এখন চা খাব না মাস্টারমশাই। একগাদা কাজ পড়ে আছে টেবিলে। বলে নিখিল বাইরে ঝেঁঝে ওঠা রোদের দিকে তাকাল।

চা আনতে আর কতক্ষণ লাগবে !

না মাস্টারমশাই। আর একদিন হবে। আজ থাক। বলতে বলতে নিখিল পোস্ট অফিসের হাতা ছেড়ে রাস্তায়।

খুব সকালে উঠে লেখার জন্য নানা তথ্য গোছাচ্ছে নিখিল। পর পর এভাবে সেগুলো লেখা হচ্ছে:

ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান

১। স্পিট ফায়ার

২। হারিকেন

৩। টাইগার মথ

৪। টেমপেস্ট

৫। লিবারেটর

৬। হার্ভার্ড

৭। ডাকোটা

৮। ক্যানবেরা
৯। ভ্যাম্পায়ার
১০। হান্টার
১১। ন্যাট
১২। জাগুয়ার
১৩। মিগ-২১
১৪। মিগ-২৭
১৫। মিগ-২৯
১৬। মিরাজ ২০০০
১৭। সুখোই
১৮। চিতা হেলিকপ্টার
১৯। চপার হেলিকপ্টার

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বন্দুক কামান ও ট্যাঙ্ক

১। থ্রি নট থ্রি রাইফেল
২। এস এল আর (সেল্ফ লোডিং রাইফেল)
৩। স্টেনগান
৪। ব্রেনগান
৫। মর্টার
৬। এ কে ৪৭ রাইফেল (কালাশনিকভ)
৭। এ কে ৫৬ রাইফেল
৮। ইনস্যাস রাইফেল
৯। লাইট মেশিনগান (এল এম জি)
১০। মেশিনগান
১১। শেরম্যান ট্যাঙ্ক
১২। সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক
১৩। বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক
১৪। বফর্স কামান

নৌবাহিনী বিষয়ক

ইন্ডিয়ান নেভির আই এন এস বিক্রান্ত অবসর নিয়েছে। আই এন এস বিরাট আছে। পাকিস্তানের গাজি নামের সাবমেরিন ধ্বংস হয় ১৯৭১-এর যুদ্ধে।

পাকিস্তানের বিমান ও ট্যাঙ্ক

১। স্টার ফাইটার
২। স্যাবার জেট
৩। বি-৫২ বোমারু বিমান

৪। মিরাজ

৫। চীনা মিগ

৬। প্যাটন ট্যাঙ্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা বিমান

১। স্টুকা বম্বার (জার্মানি)

২। চেকা (সোভিয়েত ইউনিয়ন)

৩। জিরো ফাইটার (জাপান)

এসব গুছিয়ে লিখতে হবে। তথ্যগুলো আগে দরকার। এ রকম ভাবতে ভাবতেই নিখিলের দরজায় বেল বেজে উঠল। একবার। দু'বার।

কাগজ কলম চাপা দিয়ে দরজা খুলে নিখিল দেখতে পেল সুরাজ।

অ, সুরাজ। ভেতরে এস। তোমার দিদির সঙ্গে দিন পাঁচ সাত আগে দেখা হয়েছিল বটতলা বাজারে।

বড়-বুর সঙ্গে?

হ্যাঁ বড়দি। জিজ্ঞেস করছিলেন আর টাকা এসেছে কি না! টাকা তো আর আসেনি সুরাজ। তারপর যুদ্ধ লেগে গেল কারগিলে। এখন সব টাকাই যুদ্ধের ময়দানে। সরকার এসব ব্যাপারে আর বোধ হয় টাকা দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর টাকা কি বন্ধ হয়ে যাবে?

বলতে পারছি না ভাই। তবে দেখছ না, কাগজে তো খুব দিচ্ছে যুদ্ধের খবর। সৈনিকদের কল্যাণে—আর্মি ওয়েলফেয়ার ফান্ডে সবাইকে মুক্ত হস্তে দান করতে বলছে।

তাহলে কী হবে কাকু!

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসা সুরাজকে আরও ক্লান্ত আর ময়লাটে লাগে। লম্বাটে মুখ ভেঙে বসে যেন আরও ঢুকে গেছে। চোখের কোল বেশ বসা। চোখের ভেতর কেমন যেন হলদেটে ভাব।

তোমার চোখ হলদেটে কেন সুরাজ?

জন্ডিস হয়েছিল তো।

কবে?

এই যখন হাসপাতালে চেক-আপের জন্য ভরতি ছিলাম, তখনই।

এখনও কমেনি?

সে তো মাস পাঁচ-ছয় হয়ে গেল। তাও কমল না! ঐ ওষুদ খেলে ঠিক থাকি।

রেগুলার খাও না কেন?

টাকার জন্যি মাঝে মাঝে বাদ পড়ে।

খাও তো বড়দির বাড়ি?

হ্যাঁ। বড়-বু খুব ভালোবাসে আমায়। সকালে দুপুরে খাই সেকেনে।

টাকা দাও?

না। বড়-বু বলে, যা ইনকাম করচিস রেকে দে। ওষুদ কিনবি।

অটো চালাও রোজ ?

রোজ হয় না। যেদিন শরীর জুতের থাকে, চালাই। আমার হার্ট অপরেশনের কী হবে কাকু ? যদি টাকা না আসে ? এত যুদ্ধু কাশ্মীরে। কদ্দিন চলবে কাকু যুদ্ধু ?

যুদ্ধ কবে থামবে এ বলা খুব শক্ত সুরাজ। মাশকো, দ্রাস, বাটালিক—সব জায়গায় খুব লড়াই হচ্ছে। বজরং টপ, টলোলিং পিক, টাইগার হিল—

ইন্ডিয়ার হয়ে—দেশের হয়ে, মুসলমানরাও খুব লড়ছে কাকু ?

লড়ছে তো! লড়বে না কেন ? লেফটেন্যান্ট কর্নেল হানিফউদ্দিন, গুলাম মহম্মদ খান, আহাম্মদ দুন—এ রকম আরও অনেকে আছেন আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিতে। জম্মু কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রির বেশির ভাগ জওয়ানই তো মুসলমান। তাতে কী হল।

না কাকু, অটো চালাতে চালাতে নানা কথা শুনি তো। কেউ কেউ বলে, মুসলমানরা নাকি গদ্দার। দেশকে ভালোবাসে না। সব পাকিস্তানের এসপাই।

কারা বলে এসব কথা! ছাড় তো! তুমি তোমার অসুখ, হার্ট আর জন্ডিস সামলাও। ওসবে কান দিও না।

কাকু, আমার অপরেশনের—

হবে রে ভাই। টাকা আসতে থাকুক। সবে তো দু'শ একশ পঞ্চাশ করে আসতে আসতে হাজার তিনেক টাকা জমা পড়েছে পোস্টঅফিসে। এখন বড় বড় টাকা আসবে।

কিন্তু যুদ্ধ যে কাকু।

যুদ্ধ কি চিরকাল থাকবে রে ভাই! এক সময় তো থামবে।

বলতে বলতে নিখিল সুরাজের কোল-বসা হলদেটে চোখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, ঝাল মশলা খাবার বেশি খবে না। হালকা ঝোল, পেঁপে বেশি খাবে। তেলঅলা গোস নয়। পেটে গ্যাস হলে বিপদ হবে তোমার।

ও রকম তো খাই আমি। পরিজ্জিই খাই। বড়-বু করে দেয়।

পেট ঠেসে কখনও খাবে না। ওতে বুকে চাপ পড়ে। একে বুকের কষ্ট, তার ওপর জন্ডিস।

না, চাপ খাই না কাকু।

বড়-বুর ভাড়া ঘরের পাশে আকবর থাকে না! ট্যাসকি চালায়। ওর বউ—তারেও বুবু বলি—রোজ এক পো করে দুধ দেয় আমায় খেতে। নিজেদের গাইয়ের দুধ। বড়-বু গরম করে দেয়।

দুধ হজম হয় তোমার ?

খাই তো।

যদি হজম না হয় ছানা করে খাবে।

আমি আসি কাকু। একটু দেকবেন, আমার অপরেশনটা—

বড়দির বাড়ি আসতে সুরাজ বেশ ঘেমে গেল। বাইরে খুব রোদ। জুন মাস শেষ হয়ে

এল, তবু আকাশে তেমন মেঘের ওড়াউড়ি নেই। চারপাশ কেমন ভেপসে আছে। দিন দুই আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির জমা পানি উঠোনে ঘোলাটে একটা আয়না হয়ে পড়ে আছে। তার ভেতর আকবরদের পোষা হাঁসেরা নেমে কী যেন কী খুঁজছে। কত্ কত্ কত্ কত্ শব্দ করছে।

দুলারির টালির চালে রোদের কবাডি কবাডি। ফাঁক-ফোকর চুঁইয়ে ঘরের মেঝেয় তার টুকরোটাকরা।

ঘরের ভেতর কাঁথা মশারি বিছানা আরশোলা—সব মিলিয়ে কেমন একটা গুমসোনি গন্ধ।

উঠোনে মোরগ বাঙ দিচ্ছে। পায়ের নখে ময়লা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পোকা খুঁটছে মুরগিরা। হাঁসেরা উঠোনের জমা জলে পা ডুবিয়ে নিজেদের ভেতর গল্পগুজব করছে। তাদের ডানায় পিছলে যাচ্ছে জুনের রোদ।

যতদিন যুদ্ধ হবে আমার অপরেশনের টাকা আসবে না। কবে শেষ হবে যুদ্ধ? কবে! ভাবতে ভাবতে গায়ের জামা খুলে ঘরে টাঙান দড়িতে রাখল সুরাজ। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল চৌকিতে।

নিজের লেখা গোছাতে গোছাতে ঠিক তখনই নিখিল মনে করতে পারল খবরের কাগজে লিখেছে—আমাদের ভোরের কাগজেও—বোর্ফস কামানের গোলায় আগুন লেগে গেছে পাহাড় চুড়োর বরফে। বরফে আগুন! আমার লেখা যুদ্ধ, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে কভার স্টোরি বেরবে রবিবারের সাময়িকীতে, তার কি এই হেডিং দিতে পারি? 'বরফে অগ্নিকাণ্ড!' কিংবা 'বরফের গায়ে আগুন'—কিছুতেই মন ঠিক করতে পারছিল না নিখিল সিদ্ধান্ত।

কোজাগরীর নৌকো

সেই নৌকোটি অন্ধকারে দুলছিল।

কেমন নৌকো?

কলার পেটকো কেটে তৈরি। নৌকোর পেটের ভেতর কলাগাছের বাকল দিয়ে বানানো গোলা। গোলার ভেতর ধান, যব, সর্ষে, তিল। কড়ি, হরতকি। শাদা কড়িরা অন্ধকারে গড়িয়ে যায়। যেতে যেতে খল খল হাসে। খল খল। খল খল।

আমাদের ছোটবেলায় নারেঙ্গা হলে শাদা সুতো দিয়ে গলায় কড়ি বেঁধে দিতেন মা। পোড়া-নারেঙ্গার বড় কষ্ট। খুব জ্বালা। সারা শরীরে টাড়স, ফোস্কা। চুলকোয়। রস গড়ায়। গায়ে শাদা সুতোয় বাঁধা কড়ি হাড়-জিরজিরে বুকের ওপর দোল খায়। দোলে। দুলতে দুলতে কখন যেন সে উড়ে যায়। সে কড়ি ছোট। তার পিঠটি ঘষে ঘষে গর্ত করা। লক্ষ্মীর আসনে বসা কলাগাছের খোলার নৌকোয় যে কড়ি, তার পিঠ গোল—নিটোল।

'বক মামা বক মামা টিপ দিয়ে যা
তাল গাছে কড়ি আছে গুনে নিয়ে যা'

তাল গাছে কেন কড়ি থাকে? কবে শুনেছিলাম এই ছিকুলি? সে কি মহেন্দ্র বোস লেনে—বাগবাজারে? অমরনাথের সব মনে পড়ে না সত্তর পেরনোর পর।

গোস্বামী পাড়ায় জগন্নাথ মন্দির ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেই কৃষ্ণকালী। ঠাকুর নমস্কার করতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল। বসে পড়লাম। হাতে মোষের শিঙের বাঁটঅলা বড় ছাতা। ছাতায় ভর দিয়েও বাঁচান গেল না। তারপর সব কেমন যেন গোলমাল। গোটাটা গোলমাল। কি যেন বলেছিলাম? ও হ্যাঁ, কড়ির কথা। কড়ি দিয়ে গোলকধাম খেলতাম। তিন উপুড়—বৈকুণ্ঠধাম। সাত চিত্—

তখন কেন যেন কানের কাছে বলে যেত—

'ইটা ঘুট ঘুট ভিটা ছাড়া
কড়ি ঘুট ঘুট লক্ষ্মী ছাড়া'

মেঝের ওপর কড়ি ফেলে তার মাঝে ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে একটা অদৃশ্য দাগ দিয়ে সে এক খেলা। বাগবাজারে মহেন্দ্র বোস লেনের কালো সিমেন্ট বাঁধান দাওয়ায় আমরা খেলছি। সঙ্গে পতা, মেজদি, শৈল। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দু'হাতের তালুর ভেতর কড়ি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেঝেয় ফেলছি। ফেলার কায়দা আছে। খুব বেশি দূরে না চলে যায়। তা হলে খেলতে অসুবিধে। আর বড়রা—মানে মা, জ্যেঠিমা দেখলেই বকা। কড়ি নাড়ালে লক্ষ্মী ছাড়ে।

দূরে ট্রেন চলে গেল। ইলেকট্রিক ট্রেনের শব্দে ঝন ঝন করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি—আরোগ্য নিকেতন। কোথায় আছি আমি, অমরনাথ বুঝতে পারছিল না। এই তো রাস্তায় পড়ে গেলাম জুন মাসে। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা আবারও বমি। ভাতের টুকরো সমস্ত অ্যাম্বুলেন্সে।

অ্যাম্বুলেন্সে শুনতে পেয়েছিল অমরনাথ বলছে, অম্বল। অম্বল। জড়িয়ে যাওয়া কথায়

ক্লান্তি। অ্যাম্বুলেন্সের পেটের ভেতর হলদেটে আলোয় মরণের নাচ। মৃত্যু নাচে। তা তা থই থই। অমরনাথ কি যেন বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করে। আর একটা গোরুর গাড়িকে পাশ কাটাতে কাটাতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার বলে ওঠে, শালা—কানা নাকি? কানা!

অন্ধকারে নৌকো দোলে। কলার খোলার নৌকো। তার পেটের ভেতর ধান, যব, তিল, তিষি, সর্ষে, মাষকলাই। আর একটি গোলায় হরতকি, কড়ি। পাশেরটিতে সোনার চাকতি। হাফগিনি। ফুলগিনি পারি নি। হাফগিনি কিনে এনেছিলাম। গায়ত্রীর শখ। কত নিয়েছিল হাফগিনি? ষাট, আশি, কত? সে আমার বড় ছেলের জন্মের আগে। সেটা ১৯৫২ সাল-টাল হবে। সবে বিয়ে করেছি। রেলের চাকরি। খানা পানাগড়ে পোস্টেড। গায়ত্রী বলাতে সিগারেট ছেড়ে দিলাম। 'কাঁচি' সিগারেট খেতাম। খুব বকত আমায় সিগারেট খাওয়ার জন্যে। সিগারেট ধরেছিলাম চন্দৌসিতে ট্রেনিংয়ের সময়। প্রথম পোস্টিং ছিল মোগলসরাই। তখন ইস্টার্ন রেলওয়ের ট্রেনিং হত চন্দৌসিতে। এখন বেশ কয়েক বছর হল বোধহয় ধানবাদে হয়।

কি এক নেশা ছিল চন্দৌসির ট্রেনিংয়ের দিনগুলো। মেসের কুক রামস্বরূপকে বলতাম, রামস্বরূপ মিট্ হোগা?

নহি জি। মিট্ নহি হোগা। সুরুয়া লো। হাঁ হাঁ সুরুয়া লো। দাল লো। খাও খাও। খুব খাও।

রোটি হোগা রামস্বরূপ?

হাঁ হাঁ। হোগা কাহে নাহি? হোগা কাহে নহি, দোঠো লো। খাও খাও। খুব খাও। খুব খাও। রোটি লো। সুরুয়া লো। দাল লো। সবজি লো।

তখন খেতেও পারতাম। রাতে দশ-বারোটা রুটি। বিকেলে খাকী হাফ প্যান্ট করে ভলিবল খেলা। এত ভালো জল-হাওয়া। কি যে খিদে পেত। খিদে খিদে খিদে।

নার্সিংহোমের কড়িকাঠের দিকে চোখ তোলা অমরনাথের গাল বেয়ে জল গড়িয়ে আসছিল। অ্যাটেনডেন্ট মেয়েটি ঘরে নেই। চোখের জল গড়িয়ে বালিশে। সব ছবি ভেতরে। সব কথা ভেতর থেকে কিছুই বেরিয়ে আসে না। সেই যে রাস্তায় মাথা ঘুরে যাওয়ার দিন দশেক পর বালির শান্তিরাম রাস্তার বাড়িতে বমি করলাম, তারপর অ্যাম্বুলেন্সে উত্তরপাড়ার আরোগ্য নিকেতনে আনতে আনতে কথা বন্ধ। সব কথা বুকের ভেতর জমে বরফ।

যেদিন রাস্তায় পড়ে গেলাম, সেদিনই বড় ছেলে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে বালিতে। আমি একতলায় থাকি। দোতলায় ছোট ছেলে, ছোট ছেলের বউ, নাতি। ছোট ছেলের বউয়ের সঙ্গে কথা নেই অনেক দিন। নাতিটাকেও আসতে দেয় না আমার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ইস্কুলে যাওয়ার আগে আমার ঘরের দিকে টালুমালু করে তাকায়। হাসে। কিন্তু কথা বলে না। ওর মা বকবে।

সেদিন বড় ছেলে ঝুপু ছিল আমার বিছানায়। পেচ্ছাপের ব্যাপারটা কেমন আলগা হয়ে গেছিল রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর। বিছানাতেই হয়ে যায় প্রায়। বাইরে খুব কুকুর কাঁদছিল। পরপর কেঁদে যাচ্ছে। টানা কাঁদছে। ষোল বছর আগে গায়ত্রী মারা যাওয়ার সময় কালীঘাটের সেই আশ্রম-বাড়ির বাইরে খুব কুকুর কেঁদেছিল।

ও ঝুপু, কুকুর কাঁদে।

কাঁদুক। তুমি ঘুমোও।

খুব কাঁদছে।

কাঁদুক। তাতে তোমার কি! বললাম তো তুমি ঘুমোয়। ওদের এখন মেটিং সিজন। তাই হয়ত—

তাই! বলতে বলতে অমরনাথ বালির বাড়ির এক তলায় মেঝেতে পাতা বিছানায় পাশ ফিরেছিল। তা হলে তুই আমায় পেচ্ছাপের কৌটো দে। বলে অমরনাথ নীল ডুমের আলোয় ডোবা অন্ধকার মশারির দিকে তাকাল।

আবারও সেই কলাগাছের খোলায় তৈরি শাদা নৌকো ভেসে আসে আঁধারে। কোজাগরীর চাঁদে পৃথিবী ভেসে যায়। চারপাশে থই থই দুধ। নৌকোর ছইয়ের নিচে গোলা, হলুদ হাফগিনি গড়ায় গড়াতে গড়াতে কথা বলে—

অ অমরবাবু, কত কষ্ট করে তুমি কিনেছিলে আমায়। তোমার বিয়ের মিনে করা রুপোর সিঁদুর কৌটোর ভেতর রাখা থাকতাম। লক্ষ্মীপুজো—আশ্বিনে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সন্ধেয় সারাদিন উপোস থেকে তুমি আমায় নামিয়ে এনে নৌকোর গোলায় রাখতে।

আহা, গিনির কি রূপ! হোক না হাফগিনি। এক দিকে তার রানীর ছবি। অন্য দিকে ঘোড়ায় চড়া কেউ একজন। হাতে খোলা তলোয়ার। ঘোড়ার পিঠে সেই সওয়ারের মুখটি সামান্য ঝুঁকে নিচের দিকে নামান। ঘোড়সওয়ারের মাথায় কোনো টুপি ছিল কি? না কি তার সব চুল সাপের ফণা হয়ে দুলছিল গিনির পেটে—গোল আয়না যেন, তেমন সোনার পয়সার গায়ে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে অমরনাথ। —তখনও আমার মাথায় বেশ অনেক চুল। নাকের নিচে রবীন মজুমদার মার্কা কালো গোঁফ।

টুইলের ফুল শার্ট গায়ে অমরনাথ গাইছে—

'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম
তোমার চরণ স্মরণ করি
দাঁড়াও যুগল মুরতি ধরি
দেখি তোমায় নয়ন ভরি...'

'দেখি তোমায় নয়ন ভরি'—'দেখি তোমায় নয়ন ভরি'—পরের সব লাইন আর মনে পড়ে না। সব মুছে যায়। কাননবালার গলায় কি সুর।

'আমি বনফুল গো
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...'

এওতো কাননবালা। কি চোখ কাননের। সেখানে কি গায়ত্রী লুকিয়ে? অমরনাথের চোখ দিয়ে আবারও জল গড়িয়ে পড়ল।

কোজাগরী পূর্ণিমায় আমাদের বালির বাড়ির একতলায় লক্ষ্মীপুজো। সরায় আঁকা প্রতিমা। ১৯৫৮-৫৯ সালে একখানা সরা চার আনা। মাঝখানে লক্ষ্মী। দুপাশে জয়া-বিজয়া। পায়ের কাছে প্যাঁচা। চেতলায় দিদির বাড়িতে দুর্গা সমেত লক্ষ্মীনারায়ণ। কোনোটায় শুধু লক্ষ্মী। আমাদের তো তিন পুতুলা। দুপাশে জয়া-বিজয়া নামের সখী। মাঝে লক্ষ্মী।

হাতের ভঙ্গিতে আশীর্বাদ। অন্য মুঠোয় ধানের ছড়া।

সরার গা থেকে শাদা প্যাঁচা উড়তে উড়তে বেরিয়ে এসে হাফগিনিতে ছোঁ মারতে চায়।

হুস। হুস। এ গিনি আমি আমার নাতনিকে দিয়ে যাব। ঝুপুর মেয়ে। কি জানি কেন এমন হয়? দিদিভাইয়ের মুখখানা দেখে আমার কেন জানি না গায়ত্রীকে মনে পড়ে যায়। অমন কোঁচকানো কোঁচকানো চুল। চাপা নাক। ভাসা ভাসা চোখ। গায়ত্রী, তুমি কি আবার ফিরে এলে ঝুপুর ঘরে? তোমার কত সাধ—বোধহয় সব সাধই তো অপূর্ণ থেকে গেছে। তুমি কি আবার এলে? আবার!

হুস। হুস। যাঃ যাঃ। আবছা ঘোরের ভেতর গিনি তুলতে আসা প্যাঁচা তাড়াচ্ছে অমরনাথ। সারাদিন উপোসে আছে গায়ত্রী। আমিও। আগের দিন নারকেল নাড়ু হয়েছে বাড়িতে। তিলের নাড়ু। খই আর আখের গুড় দিয়ে মুড়কি। তাকে 'উপড়া' বলত আমাদের দেশে। আমাদের দেশ—আমাগো দ্যাশ—ঢাকা। মানিকগঞ্জ সাব ডিভিসনের পাটগ্রাম। স্টিমারে কাঞ্চনপুর। সেখান থেকে অনেক, অনেকটা পথ হেঁটে নয়ত ছোট দিশি ঘোড়ার পিঠে—কি উধাও ফাঁকা মাঠ। সঙ্গে কুইঞ্জা চাকর। আমরা আসব—এই খবর পেয়ে নিতে এসেছে। হাতে বড় লাঠি। স্টিমার থেকে নেমে আমরা নৌকোয় চড়ে ঘাটে আসতাম।

সারাদিন উপোসী থেকে গায়ত্রী খিচুড়ি করেছে। সাত রকম ভাজা—আলু, ঢ্যাঁড়শ, উচ্ছে, নারকেল, মিষ্টিআলু, মাখন-সিম, বড়ি। ভাত, সুক্তো, মুগ ডালের শুকনো খিচুড়ি, তাতে নারকেল কুচি। ফুলকপির তরকারি, আলু দিয়ে। কি গন্ধ আর সোয়াদ তখন ফুলকপিতে। পেঁপের চাটনি, তাতে আমাদা। সুন্দর একটা গন্ধ হয় তাতে। আমাদা দেখতে অনেকটা কাঁচা হলুদ যেন—যাকে আমরা বলতাম, কাচি হলুদ। এমনি মুখে দিলে কষা-তেতো স্বাদ। গাওয়া ঘিয়ের লুচি। চালের পায়েস। পায়েসে কিশমিশ, নয়ত মনাক্কা।

কাঠের জলচৌকিতে চাল বাটা পিটুলির আলপনা। লক্ষ্মীর পারা—জোড়া পায়ের ছাপ। ধানের ছড়া। পদ্ম। সব গায়ত্রী এঁকেছে। লক্ষ্মীর আসনের এক পাশে পাথরের বাটিতে নারকেল জলে ভেজানো চিঁড়ে—কোজাগরী। আধমালা নারকেল। পাকা কাঁঠালি কলা এক ছড়া। খিলি করে সাজা পান। গুয়া—সুপুরি। পানের মশলা। বড় লাল পদ্ম গোটা দুই।

জলচৌকির দু পাশে বড় পিলসুজে তেলের প্রদীপ। সেই জোড়া পিদিমের আলোয় সরায় আঁকা লাল কাপড় পরা হলুদ লক্ষ্মী জ্বলজ্বল করে ওঠে। হাসে। কথা বলে।

অ অমরনাথ, তোমার ঘরের পূজা বড় মনোরম। খুবই শুচি-স্নিগ্ধ। বলতে বলতে মাটির সরায় আঁকা দেবী আবারও হেসে ওঠে। কি তার রূপের বিভা। জোড়া পিদিম থেকে উড়ে আসা সরষের তেলের আলো সরার চকচকে তেলা গায়ে আবারও দুটি আলোর টিপ হয়ে ফুটে ওঠে।

ও ঠাকুর, আমার দুই ছেলে—ঝুপু, তপু যেন ভালো থাকে। তার শরীরটা যেন ঠিক থাকে। খুব কষ্ট করতে হয়। সপ্তাহে দুটো নাইট ডিউটি—শুক্র, শনি। খাটনি খুব। তারপর সংসারের যাবতীয় কাজ। কোনো তো বাজে আড্ডা নেই মানুষটার। একটা লক্ষ্মী পুজো করতে এখন পঞ্চাশ টাকা খরচ প্রায়। ও ঠাকুর, তুমি একটু দেখো। বলতে বলতে ঠোঁট নড়ে গায়ত্রীর। শব্দ হয় না।

লক্ষ্মী হাসল। ঘাড় নাড়ল। সে হাসির মানে কি সব হবে? সব ঠিক হয়ে যাবে?

ঠিক তখনই দুটো লালচে পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে চাইছিল সরার পায়ের কাছে। নাকি লক্ষ্মীর পায়ের ছোঁয়ায় ফুল ফুটল? গায়ত্রী বুঝতে পারছিল না। আর এখন 'আরোগ্য নিকেতন'-এর তিনতলায় অমরনাথ লাইজলের ঝাঁঝাল গন্ধ, নিজের বাঁ হাতে ফুটিয়ে রাখা ছুঁচের ভেতর দিয়ে একটু একটু করে মিশে যাওয়া স্যালাইনের ধাক্কায় ঢেউ তোলা রক্তের গভীরে ফুটে ওঠা কমল-গন্ধ টের পাচ্ছিল।

বালির বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো বন্ধ হয়ে গেল কত দিন। গায়ত্রী মারা যাওয়ার পর বছর দেড়েক বাদে বালির বাড়ি গিয়ে ছোট ছেলের বিয়ে দিলাম। তারপর ছোট-বৌমা আসার পর বাড়িতে আরও দু-এক বছর লক্ষ্মীপুজো। সে যাকগে। সেই হাফগিনি রাতের অন্ধকারে হাতের তেলোয় নিয়ে দেখেছি ঘোড়ার ছুটে যাওয়া। খুরে খুরে আগুন ছোটে। ঘোড়াসওয়ারের হাতে তলোয়ার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জায়গা পাল্টে পাল্টে কত বার না রেখেছি। পুরি থেকে আনা সুপুরি কাঠের সিঁদুর কৌটোয়, লোহার ট্রাঙ্কের নিচে। ঠাকুরের আসনে কাশী থেকে নিয়ে আসা পেতলের অন্নপূর্ণা মূর্তির পায়ের নিচে। ছোট বৌমার তো হাতটান স্বভাব। আলমারির চাবিও পাল্টে পাল্টে রাখতাম। যাতে না ছোট-বৌমার হাতে পড়ে। তা হলেই তো আমার টাকা গেল। টাকার তো হাত-পা, ডানা আছে। তাকে সামলে রাখতে হয়।

অন্ধকারে কলার পেটোর নৌকো ভেসে ভেসে আসছিল। নৌকোর ছইয়ের মাথায় তেলে গোলা সিঁদুরের লম্বাটে দাগ। সেই দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ল অমরনাথের। কলাগাছের খোলা দিয়ে তৈরি মাঝি বৈঠা হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার মাথাতেও গোলা সিঁদুরের ফোঁটা। নৌকো দুলছিল।

নৌকোর ভেতর গোলা। তার মধ্যে হাফগিনি। সেই হাফগিনি ছুটে বেরিয়ে এল গোলার বাইরে। অন্ধকারে গিনি গড়িয়ে যাচ্ছে। তার এক পাশে রানির মুখ। অন্যপাশে ঘোড়ার পিঠে সৈনিক।

গিনি গড়িয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে। অমরনাথ ধরতে পারছিল না। মাথার ভেতর জমে থাকা অনেকখানি চাপ চাপ কালো কাটতে কাটতে গিনি গড়াচ্ছিল।

অমরনাথ দেখতে পাচ্ছিল বেশ খানিকটা দূরে তার দুই ছেলে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে। একটা কাক উড়তে উড়তে এসে প্রথমে বড় ছেলের মাথায় বসল। বড় ছেলে নড়ল না। চড়ল না। কাক তার শক্ত ঠোঁট ঘষল বড়খোকার মাথায়। খোকা তেমনই দাঁড়িয়ে। এরপর কাক ঠোক্কর মারল আমার ছোটছেলের মাথায়। সে ছেলেও নড়ল না।

ও ঝুপু, তোরা দুভাই পাথর হয়ে গেলি নাকি বাবা?

কেউ কথা বলে না। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। শুধু কাক বলল, কা—কা—কা—কা—ক্ক—ক্ক।

ঝুপুর চোখে পাতা পড়ে না। কাক তখন বড় ছেলের মাথায় নিজের পেট পরিষ্কার হওয়ার চিহ্ন রাখল। তারপর উড়ে গিয়ে বসল ছোট ছেলের মাথায়।

ছোটখোকাও বড়খোকার মতনই! চুপচাপ। চোখের পাতা পড়ে না। হাত নড়ে না। পা নড়ে না।

কাক খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল তপুর মাথায় বসে।

ও তপু, দাদার মতো তুইও পাথর হয়ে গেলি! বলতে বলতে অমরনাথ দেখতে পেল অন্ধকারের রেশমি শাড়ি সোনার ছুরিতে কাটতে কাটতে গিনি এগোচ্ছে।

কাক তার ঠোঁট ঘষল ছোটখোকার মাথায়। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর পেট নামাল ছোট ছেলের মাথার ওপর। তাতে আর কি! দু-ভাই-ই পাথর।

ও তপু, তুইও পাথর হয়ে গেলি বাবা! যেমন তোর দাদা! দুই ভাই-ই পাথর! এইরে, আমার দুই ছেলে পাথর। ও নার্সদিদি, ডাক্তারবাবু, আমার কি হবে—নিজের ভেতরে এটুকু বলে জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছ হয়ে আরও খানিকটা বেশি অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে বুকের গভীরে টানতে চাইল অমরনাথ।

কাক এবার ঠোক্কর দিল অমরবাবুর ছোট ছেলের মাথায়। বার বার তিনবার। ছোটখোকা নড়ল না। চোখের পাতা পড়ল না।

কি হবে গায়ত্রী, আমাদের দু ছেলেই যে স্ট্যাচু হয়ে গেল।

বড় কষ্ট করে আমায় কিনেছিল অমরবাবু। না খেয়ে। জামা গায়ে না দিয়ে। জুতো না পরে। তোমার বউ তোমায় মাঝে মাঝেই বলত, তেলের পেচি। সে তোমার জুতো, ফুলশার্ট আর ধুতির দুরবস্থা দেখে। দাড়ি কামাতে কাপড় কাচা সাবান গালে বুলিয়ে। বড়বাজার থেকে মাসকাবারি মাল কিনে দুহাতে দুটো ভারি চটের থলি ঝুলিয়ে গোটা হাওড়া ব্রিজ হেঁটে পেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে আসতে। বলতে বলতে গিনি অন্ধকারে গড়াচ্ছিল। সংসারের সারা মাসের মুদি-মশলা বাজার বড় হালকা নয়। কি বল! বলেই গিনি রানীর দিক থেকে ঘোড়সওয়ারের ছবি হয়ে পাশ ফিরল।

অমরনাথ বলল, যেও না। যেও না গিনি।

তোমায় আমি আমার নাতনির হাতে দিয়ে যাব। তার মুখখানা দেখলে আমার গায়ত্রীকে মনে পড়ে। দশ—এগার বছর বয়েসে গায়ত্রী কি অমনই দেখতে ছিল? কি জানি।

তুমি আমায় খুব কষ্ট করে জমান টাকায় কিনেছিলে অমরবাবু। বলতে বলতে আরও গভীর আঁধারে চলে যেতে চাইল সেই হাফগিনি। স্ট্যাচু হয়ে যাওয়া নিজের দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে অমরনাথ চেঁচিয়ে উঠল—আমি কিছুতেই তোমায় হারাতে দেব না। হারিয়ে যাবে কেন তুমি? আমার লক্ষ্মীর গিনি। বড় কষ্ট করে কেনা, না খেয়ে! না পরে। গায়ত্রীর কত স্বপ্ন! আশা। কত কষ্ট করে গায়ত্রী তোমায় আটকে রেখেছে। আমাদের কত অভাব গেছে। ধার করেছি। তবু বিক্রি করিনি। বাঁধা রাখিনি তোমায়।

মূর্তি হয়ে যাওয়া দুই ছেলেকে কাটিয়ে অমরবাবুর হাফগিনি আরও কোনো নিরুদ্দেশ-অন্ধকারে চলে যাচ্ছিল। তার পিঠের সোনালি গোল আলোটুকু ফালি ফালি হয়ে বসে যাচ্ছিল অমরনাথের মাথায় ভেতর।

কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীর আসনের সেই নৌকো আবারও ভেসে আসছিল চোখের সামনে। আধুলি চেহারার হাফগিনি গড়িয়ে গড়িয়ে কোন অন্ধকার ঢালে মুছে গেল। 'হায় হায়' করে উঠল সেই কলার পেটকোর তৈরি নৌকোর মাঝি।

কাক ডেকে উঠল। কা কা কা কা।

অমরবাবু পরিষ্কার শুনতে পেল—হায়রে, বড় অকল্যাণ হল। খুব অকল্যাণ। লক্ষ্মীর গিনি হারিয়ে যাওয়া। গিনি গেলা অন্ধকার নিঃশব্দে হাসছিল। তার হাসির শব্দ ঘষে সাফ করে দিতে দিতে একটা গ্যালপিং ট্রেন গড়িয়ে গেল লাইনের ওপর দিয়ে।

দিদিভাই, তোমায় আর দেয়া হল না। এটুকু ভেবে নাতনির মুখটা আবারও দেখতে পেল অমরনাথ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চাপা নাক! ভাসা ভাসা চোখ। ফরসা রঙ।

গায়ত্রী! গায়ত্রী! ভেতরে ভেতরে ডুকরে উঠল অমরনাথ।

কোজাগরীর সেই নাও আবারও দুলে উঠছিল বন্ধ দুচোখের সামনে। লাইজলের গন্ধ, বেডসোর পরিষ্কার করার ওষুধের গন্ধ, স্পিরিট, ফিনাইল—সব ছাপিয়ে লক্ষ্মীর আসনে সেই ফুটে ওঠা পদ্মের হালকা হালকা সুরভি টের পাচ্ছিল অমরনাথ।

কোজাগরীর পদ্ম-গন্ধ আরোগ্য নিকেতনের বাতাস অন্যরকম করে দিচ্ছিল।

যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট

বিধান সরণি যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ছিল তখন ছোট মেসেমশাই চাকরি করতেন আসাম সিলিমিলাইট লিমিটেড, অফিসের নামটা ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করা হল কি না, তা নিয়ে অশোকের খানিকটা সংশয় তো থাকলই। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা ডেট ক্যালেন্ডার অনেক দিন অশোকদের বাড়ির ছ-কোনা টেবিলে ছিল। তার এক কোণে আসাম সিলিমিলাইট-এর লোগো, গণ্ডার।

দাদামশাইয়ের তিন জামাইয়ের ভেতর ছোট মেসোমশাই-ই সবচেয়ে রূপবান ছিলেন। লম্বা, ফর্সা, মাথাভর্তি কালো চুল। নিয়মিত শ্যু-টাই-স্যুট পরে অফিসের কাজে প্লেনে আসাম—তখনও অসম বলা রেওয়াজ হয়নি—চলে যেতেন। মায়ের জন্যে খুব সুন্দর একটা চাদর এনেছিলেন আসাম থেকে, কালো রঙের, তার ওপর সোনালী সুতোর কাজ। জমিটা সিল্ক ধরনের। কিন্তু গায়ে দিলে কলকাতার শীত দিব্যি চলে যায়। আমাদের চন্দননগরের শীতও পার হয়ে যেত। ঐ কালো চাদর গায়ে দিলে মা খুব রাগ করত। মায়ের তো আর গরম শাল বা চাদর ছিল না। বড়দিনের ছুটিতে ছোটমাসি আমাদের বাড়ি যাবেই, থাকবে। সঙ্গে বড় কেক, একেবারের একটা কেক—কুমিরের চেহারার, সেটা দেখে তো আর কেটে খেতে ইচ্ছে করে না।

বাবা ছোটমাসিকে বলত, 'মেমসাহেব'। কী ফর্সা ছোটমাসি! আমার মায়েরা তিন বোনই ফর্সা। বিয়ের আগে একটু যেন কোলকুঁজো, দাঁত সামান্য উঁচু ছিল ছোটমাসির। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসল পাশ করতে পারল না, তারপরই বিয়ে হয়ে গেল। ছোট মেসোমশাই বছর দশ-বারো বড় ছিলেন মাসির। তাতে কী হল! বিয়ের পর তো মাসির গায়ে মাংস লাগল। অশোকের মনে পড়ল, তার জন্ম ১৯৫২ সালে। ছোটমাসির বিয়ে হল ১৯৫৬। বিয়ের আগে আমায় নিয়ে চন্দননগরে 'যদুভট্ট' সিনেমা দেখতে গিয়ে ছোটমাসি তো ধপাস, এক আছাড়। খুব মোটা ছিলাম তো, সামলাতে পারেনি। তারও পরে যে বার ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন এলেন কলকাতায়, বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সেদিন আমাদের চন্দননগরের বাড়ি খুব সিঙারা ভাজা হচ্ছিল। বোধহয় আলু-ফুলকপির। বাবার এ-সবে খুব উৎসাহ ছিল। বাবা এসে বলল, কলকাতায় ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন এসেছেন। তাঁদের দেখার জন্যে কী ভিড়, কী ভিড়! ছোটমাসি সেদিন আমাদের বাড়ি।

এ-সবই অশোকের মনে পড়ছিল টাউন স্কুল স্টপে নেমে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট তো কবেই বিধান সরণি হয়ে গেছে। হাতিবাগানের মোড়, স্টার থিয়েটার, রাধা, দর্পণা—এই সব সিনেমা হল, বাঁ দিকে টাউন স্কুল, ডান দিকে হেমন্ত বসুর বুক অব্দি লাল রঙের স্ট্যাচু—সব পেরিয়ে যেতে যেতে অশোকের মনে পড়ল, ছোটমাসির বড় ছেলে বাবুন যে-বার হল, সে-বার আমরা দেওঘর বেড়াতে গেছি। ওখানেই মা স্বপ্ন দেখল, বাবুন হয়েছে। কাঁসার গেলাসের ভেতর একটা ঝিনুক বা চামচে দিয়ে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা যেত বাবুনকে। ঢন ঢন ঢনা ঢন—শব্দ করে যেত বাবুন। শব্দ করত আর চুপ করে বসে থাকত।

ওর মুখেভাত হল তারক প্রামাণিক রোডের বাড়ি। বাড়িতে নহবত বসালেন বাবুনের ঠাকুরদা, ছোট মেসোমশায়ের বাবা। তিনি পাবনা থেকে খেদা খেয়ে আসা মানুষ। পার্টিশনের পর খুব কষ্ট করে কলকাতা পৌঁছেছিলেন প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায়। সঙ্গে বউ, দুই ছেলে, এক মেয়ে। কলকাতায় এসে তিনি কবিরাজি প্র্যাকটিস শুরু করেন। নাম-করা কবিরাজ ছিলেন। তো সেই বাবুনের মুখেভাতে বাড়িতে সানাই। এলাহি মাছ-মাংস-মিষ্টি। কার্ড ছাপা হয়েছিল, শাদার ওপর রুপোলিতে এমবস করে 'অন্নপ্রাশন' লেখা। পাশে হাসিমুখের বাচ্চা ছেলে। ফোকলা। পা ছড়িয়ে বসে। কপালে কাজলের টিপ। মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সামনে ঝিনুক-বাটি, কাজললতা, লোলাকাঠি, কাঠের ঘোড়া। এ সব ছিল কি, নাকি ছিল না? পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে অশোকের মনে হয়, সব কেমন যেন গুলিয়ে যায় মাঝে-মাঝে। তলিয়ে যায় কত স্মৃতি। আবার ভেসে ওঠে।

আকাশ কেমন মেঘসাজে গম্ভীর হয়ে আছে। টাউন স্কুলের মাথায় মেঘ ছিল। এই তেলিপাড়ায় ঢোকার মুখেও মেঘ আছে। এবার খুব আম উঠেছে। ল্যাংড়া, হিমসাগর সস্তাও হয়েছিল বেশ কয়েক দিন। এই শ্রাবণে ফজলি উঠেছে। বড় ফজলি। গা-টা কালো হলে মিষ্টি হবে। অশোকের মনে পড়ছিল, আমরা হাওড়া থেকে একবার বেবি-ট্যাক্সি করে বিবেকানন্দ রোডের বাড়ি গেলাম। ছোট মেসোমশাই অনেক ফজলি আম আনলেন বাজার থেকে, পাঁঠার মাংস। খুব খাওয়াদাওযা হল। অত স্যুট-টাই পরা মানুষ, কিন্তু সন্ধ্যে করতেন নিয়মিত। আর নস্যি নিতেন খুব। শুগারে শুগারে শেষ হয় গেল। আসাম সিলিমিলাইট লিমিটেড বন্ধ হয়ে গেল। ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেল তারা। আমার বাবা বলত, মার্চেন্ট আপিসের চাকরি, এই আছে এই নেই. সত্যি তো তাই হল! খুব কষ্ট করতেন ছোট মেসোমশাই তখন। কত দিন চাকরি ছিল না। পরে একটা ছোট প্রাইভেট ফার্মে, খাটনি বেশি, পয়সা কম।

শেষের দিকে নিজের লোকজনদেরও ঠিকমত চিনতে পারতেন না। কথা জড়িয়ে যেত। চলে যাওয়ার আগে দিন পরেন পাড়ার কাছেই কোনো নার্সিংহোমে ছিলেন। কেউ একটা খবর দিল না আমায়। অথচ মরার পর খবর তো আসেই।

শরীর অনেক দিন ধরেই খারাপ যাচ্ছিল। ডাক্তার। ওষুধ। স্ক্যান করার দরকার ছিল। চান করতে চাইতেন না। বাথরুম করতেও না। দাঁত মাজা নয়। স্ক্যান করে দেখা গেল, ব্রেনের সব সুতোগুলো শুকিয়ে গেছে। আর ভালো হওয়ার নয়, বাবুনের বউ সর্বাণী ফোন করতে করতে বলছিল। বাবাকে হাত বেঁধে রাখতে হত নার্সিংহোমে। বাড়িতে যে শেষ চব্বিশ ঘণ্টা ছিলেন, তখনও হাত বাঁধা। গায়ে কী জোর! নার্সিংহোমে আবারও তো দিতে হল। সেদিন বাংলা বন্‌ধ, শুক্রবার। পাঁচটায় নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স, আটটার ভেতর সব শেষ।

আমি কেন এত সব মনে রাখি। মিছিমিছি কষ্ট পাই, স্মৃতিভারে। চোখে জল আছে। নার্সিংহোমে যেতে পারলাম না একদিন। খবরই পেলাম না! ...ভাবতে ভাবতে আবারও আকাশ দেখল অশোক। কী সুন্দর দেখতে ছিল ছোট মেসোমশাইকে! সবাই বলত, ধর্মেন্দ্র! তারক প্রামাণিক রোডের ভাড়া বাসায় বাবুনের ভাত, সানাই বাজল। কত

খাওয়াদাওয়া! আর বাড়িতেই বাসন্তী পুজো। পাবনায়, দেশের বাড়ি থেকে আনা শরিকানি পুজো। চারদিনের উৎসবে ঢাক, কাঁসি, লোকজন খাওয়া, এক চালার বাংলা ডিজাইনের ঠাকুর। সন্ধিপুজো।

তারক প্রামাণিক রোডের বাড়িটা কেমন ছিল। চারপাশে দোতলা। মাঝখানে উঠোন। উঠোনে বেলেপাথর। অন্ধকার, শ্যাওলা-ধরা কলতলা, চৌবাচ্চায় ঠাণ্ডা জল, পায়খানার গোল প্যানে কালো ফাটা দাগ, সময়ের শ্যাওলা। খিলান-করা বড় বড় ভারী দরজা, জানলার মাথায় কাচের লাল-নীল হলুদ ময়ূর পেখম। তার ভেতর দিয়ে আলো আসে কি আসে না। যদি এসে পড়ে, তা হলে দিনটা অন্যরকম হয়ে যায়। বাবুনের কবিরাজ ঠাকুরদা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। কেউ গেলে একটু তল-চোখ করে বলতেন, কে-রে! কে এলি!

তারক প্রামাণিক রোডের সে-বাড়ি ছেড়ে ছোটমাসিরা সবাই তেলিপাড়ায় চলে এল, সেটা হবে বছর বত্রিশ-তেত্রিশ আগে। একই বাড়ির সামনের দিকটা বাবুনের ঠাকুরদা। পেছনের দিকে তাঁরই আর—এক কবিরাজ বন্ধু। তাঁদের পদবি সেন।

বাবুনের ঠাকুমা এখনও বেঁচে। নব্বই হয়ে গেল। বড় ছেলে চলে যাওয়ার শোক, সব মিলিয়ে কেমন আছেন—এ সব জানতে চাওয়া একসঙ্গে ঘাই দিল অশোকের গভীরে! বৃষ্টির জল এক ফোঁটা পড়ল অশোকের চুল-কমে-আসা মাথায়। এই বর্ষাতেই তো চন্দননগরের বাড়িতে বাবা ইলিশ মাছ এনেছে। আমি আর ছোট মেসেমশাই পাশাপাশি ভাত খেতে বসেছি। হঠাৎ আমার পাত থেকে একটা পেটির মাছ তুলে ছোটমেসোর থালায়, আপনি খান।

মা তো হাঁ-হাঁ করে উঠল। পঞ্চদেবতাকে ভাত নিয়ে, গণ্ডুষ করে খেতে বসেছে, ব্রাহ্মণ মানুষ। গেল বুঝি সব। খাওয়া নষ্ট হল। ছোট মেসোমশাই কিন্তু আমাকে বকলেন না। খাওয়া ছেড়ে পাত্র ত্যাগ করে উঠলেনও না। বললেন, থাক না দিদি। ওকে আর বকবেন না। ছোট ছেলে—।

ছোট ছেলে, মা গজগজ করে যাচ্ছিল। সেও তো কত কত বছর হয়ে গেল।

এই তো তেলিপাড়া লেন, এখানে থমকে গেল। তারই সামনে ভারী খিলানওলা বাড়ি, সেখানে সরু স্পেস। বাড়ির খিলান মাথায় নেয়া চৌকো থামে সস্তার এলা রঙ। তার ওপর আটকান শাদা পাথর। 'প্রাণাচার্য' কথাটি শুধু পড়া যায়। সেখানে কালোটুকু আছে। বাকিটা সময়ের আলো-হাওয়া রোদে শ্বেতপাথর রঙের।

ডান দিকে যেতে হবে। ছোটমাসি একতলাতেই শুয়ে। পাশে সোফায় ওঁর এক ভাগনি-অঞ্জুদি। অশোক চেনে। আর বড়মাসিমাও মেঝেতে ছোটবাসির পাশে। সবটাই শোকের, আলুথালু।

অশোককে দেখে ছোটমাসি খুব ধীরে কেঁদে উঠল। ছোটমাসি এ রকমই বরাবর। আর বড়মাসি জোরে।—আমরা থাকতে নমিতার যে এ-রকম হবে ভাবিনি। কী যে হয়ে গেল সব! তোর মা চলে গেল আঠার বছর হয়ে গেল। তোর বাবা চলে গেল দু'বছর। সবাই

চলে যাচ্ছে এক এক করে।

ততক্ষণে সোফা থেকে উঠে পড়েছে অঞ্জুদি। ছোট মেসোমশাই তো শুয়ে থাকতেন ঐ সোফাতেই। শুয়েই থাকতেন। পায়ে জোর নেই। স্মৃতি মুছে আসছে। অশোকের মনে পড়ে যাচ্ছিল।

থাক্ বড়মাসিমা। বলতে বলতে বড়মাসিমার পিঠে হাত রাখল অশোক। তখনও কান্না উঠে আসছে সত্তর-পেরন উষারানীর গলা দিয়ে। বাবা, ছোট মেসোমশাই, বড়মাসিমা—সবাই কাছাকাছি বয়েসের। কিন্তু যাওয়ার তো আর হিসেব নেই কোনো—নিজের ভেতরই নিজেকে শোনাল অশোক।

শেষ দিকে কাউকে চিনতে পারত না রঞ্জন। ঐ একবার বুলি এল।

বড়মাসিমার কথা শুনে অশোক বুঝতে পার, ভোপাল থেকে ছোটমাসির একমাত্র মেয়ে বুলি এসেছিল বাবার অসুখের খবর পেয়ে।

বুলি ছিল কি শেষের দিনে? বলতে বলতে অশোক দেখল ছোটমাসির ফর্সা মুখ, লালচে ঠোঁট কান্নার ভারে কেঁপেই যাচ্ছে।

ছোটমাসি! অশোক ছোটমাসির হাত ধরল। থাক। থাক এখন।

দাঁড়া উঠে বসি—খুব আস্তে বলে নমিতা ভট্টাচার্য উঠে বসলেন। তাঁর মনে পড়ল, মানুষটা আমার থেকে বছর দশ-বারোর বড় ছিল, শেষে অসুস্থ হয়ে কতদিন—কতদিন, সেই তো বিছানায় শোয়া। চলে গেল। শেষ দিকে নার্সিংহোমে গেলে চোখই খুলত না এক-একদিন। কতবার ডাকলে একবার সাড়া পেতাম। ভাবতে ভাবতে জল এল নমিতার চোখে, আবারও।

বুলি ছিল কি শুক্রবার! অশোক নতুন করে জানতে চাইল।

না, ছিল না। চলে গিয়েছিল। তাপস তো ভোপালে। বদলির চাকরি। ওদের ছেলে তো বাঁকুড়ায়। এই তো ওর বাবা মারা গেলেন, কতদিন ছুটি গেল। তারপর আবার রঞ্জনের শরীর খারাপ। কিন্তু বুলিতে ঠিক চিনতে পারল জানিস! বলতে বলতে উষারানী হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছলেন, চোখ থেকে ছানি-কাটানো ভারী চশমা নামিয়ে।

পুরু কাচের ওপারে দুচোখের মণি কেমন যেন বড় বড় মনে হয়। বড়মাসিমার ফর্সা কী সুন্দর গলা, এখন চামড়া আলগা হয়ে গেছে, অশোক দেখছিল। এই কি বয়েস? আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক ক্ষয়? ধীরে বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল অশোক।

চোখের জল মুছে ছোটমাসি উঠে বসেছে।

হ্যাঁ, বড়মাসিমা—কী বলছিলেন বুলির কথা!

ও বাবা, বুলিকে তো প্রথমে দেখে কিছুতেই চিনতে পারে না রঞ্জন। কে এসেছে বল তো জিজ্ঞেস করলে খালি বলে, আমাদের লোক। তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমাদের লোক। আমাদের লোক। বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই আছে।

শেষে দিন দুই পর একদিন সকালে 'নানি মা, নানি-মা' বলে ডেকে উঠল, জানিস! আমরা সবাই তো অবাক!—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল ছোটমাসি। বুলিকে 'রানিমা' বলে

ডাকত তো! সেই রানিমা মুখে-মুখে নানি-মা। ডাকছে তো ডাকছেই, অনেকবার। বেগুনি ছাপা শাড়ির আঁচলে দু চোখ চাপা দিল ছোটমাসি। বড়মাসি আবারও কেঁদে উঠল জোরে।

বাবুনের বউ, সামনেই ছিল, সবর্ণী। জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন অশোকদা?

না, থাক।

খান না। করছি তো।

তোমরা খেলে কর।

ও অশোক, ছেলেরা, বউমা, সব ভালো—বড়মাসিমা জানতে চাইল।

ঘাড় নাড়ল অশোক।

বিস্কুট দিও অশোককে। বলতে বলতে ছোটমাসি সবর্ণীর দিকে তাকাল।

মিষ্টি দিও তো বাবলুকে। অফিস থেকে এসেছে। ফ্রিজে মিষ্টি আছে বৌমা—বলতে বলতে উষারানী তাকালেন ছোটবোনের দিকে।

অশোক ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ। কতদিন পর বাবলু বলে ডাকল কেউ! মা নেই, বাবাও না। 'বাবলু' বলে কে আর ডাকে আমায়! এটুকু ভেবে নিয়ে অশোক বলল, মিষ্টি খাব না মাসিমা। অ্যাই সবর্ণী, মিষ্টি খাব না। দিয়ো না আমায়।

খান না অশোকদা। সবাই নিয়ে নিয়ে আসছেন, তা থেকেই—এ তো আর দোকান থেকে আনাচ্ছি না! অশোকের মনে পড়ল, সে হাতে করে মিষ্টি ফল, হবিষ্যির জিনিস—কিছুই আনেনি।

না, মিষ্টি দিও না সবর্ণী।

তা হলে ফল খান। আপেল কেটে দি। কলা, পেয়ারা—যা ইচ্ছে। না গো, শুধু চা-বিস্কুট দাও। ইচ্ছে করছে না।

তা কি হয় নাকি! অফিস থেকে এসেছেন।

ভালো আছেন অশোকদা?

হ্যাঁ, ভালো। ঘাড় নেড়ে খুব নিচু গলায় উত্তর হাওয়ায় ভাসিয়ে অশোক দেখল বুলোর বউ। বাবুনের পরের ভাই বুলো।

তুমি ভালো আছ? অশোক জানতে চাইল।

আছি।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে অশোকের রিন্টুকে মনে পড়ল। বাবুনের পর বুলি। তারপর বুলো আর রিন্টু।—রিন্টুকে দেখছি না?

আছে কোথাও, এদিক-ওদিক—বলতে বলতে চায়ে চুমুক দিল ছোটমাসি।

আমার চায়ে বেশি মিষ্টি দাওনি তো বউমা? উষারানী জানতে চাইলেন।

না, বলতে বলতে সবর্ণী বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিল। একটা তুলল অশোক।

আর একটা নে, কিছুই তো খেলি না। বলতে বলতে নমিতা অশোককে দেখলেন। কত ছোট ছিল আমার বিয়ে সময়, বছর চারেক। একবার শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে প্যান্টে—ইস্, জল জোগাড় করো। ধোয়াও। প্যান্ট কাচো। তখনও বাবুন হয়নি। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। আমি, সে আর বাবলু। মানুষটা চলে গেল, আজ নিয়ে চার দিন, কত কথা মনে পড়ে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাবলুর জন্যে জল জোগাড় করল সে—বাবুন, বুলি, বুলো, রিন্টুদের বাবা।

চা খেয়ে কাপ নামাল অশোক। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে প্রায়। পাতাল রেলে উঠলে ধর্মতলা তো একটুখানি, সেখান থেকে বাসে হাওড়া। তারপর ট্রেনে চন্দননগর।

কাজের দিন কিন্তু আসবি। সকাল সকাল, বউমা ছেলেদের নিয়ে—ছোটমাসিমা তাঁর ভারী শরীর ছড়াচ্ছিলেন। সোফায় বসা অঞ্জুদি তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, ভালো করে বোসো মামিমা।

আমি ঠিক আছি অঞ্জু—তুমি বোসো। বলে নমিতা তার পা টান করলেন। তারপরই বললেন, বাবুন বা বুলো কেউ একজন যাবে, তোর বাড়ি চন্দননগর। তোর কার্ডে নামও লেখা হয়ে গেছে। কিছুই তো পড়ে থাকে না বাবা—

অশোক একটু গলা জোর করেই ফেলল বোধ হয়—না, আমার ওখানে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে না বাবুন-বুলোকে। চন্দননগর কি এখানে! শ্যামবাজার থেকে চন্দননগর, কম দূর। আর কার্ড লাগবে না আমার। এটা কি কোনো আনন্দের ব্যাপার—বলতে বলতে নিজেকে গুছোচ্ছিল অশোক।

যাওয়ার আগে ঠাকুমার সঙ্গে দ্যাখা করে যাস!

আবার ওপরে! কী বলব! অশোকের গলায় অস্বস্তির কাঁটা। কী বলব আমি ঠাকুমাকে—অশোক ভাবছিল, যাঁর বড় সন্তানটি মারা গেছে আজ থেকে দিন-চারেক আগে!

উনি সব জানেন?

জানেন। সবই জানেন। কিন্তু কাউকেই কিছু বলছেন না এ-সব নিয়ে। এটুকু বলে উষারানী চশমা মোড়া দু চোখ তুলে অশোককে দেখলেন।

যাই, দেখা করে আসি। বলে সরু সিঁড়ি বেয়ে অশোক উঠল। দোতলার ঘর। লাল মেঝে। বিছানা। লাল অয়েলক্লথ। ঠাকুরদেবতা, একগাদা কৌটোকাটি। খানিকটা সিল্কের কাপড়ে ঠাকুমার নাভি থেকে পা অব্দি ঢাকা। একমাথা শাদা চুল। খুব ছোট করে ছাঁটা। কোমর পড়ে গিয়েছিল অনেক দিন।

ঠাকুমা, আমি বাবলু।

ও বাবলু, গায়ত্রীর ছেলে—আয়, আয।

সব মনে আছে বুড়ির। সব।

আমি আর পারি না ভাই! কবে চইল্যা যামু, কোন দিন, কইতে পারস?

অশোক বসতে পারছিল না। এ-ঘরেই থাকতেন বাবুনের ঠাকুরদা, তখন উঁচু চৌকি ছিল একখানা। ঠাকুরদা চলে যাওয়ার পর মেঝেয় ঢালা বিছানায় ঠাকুমা।

বসবি না দাদুভাই?

না ঠাকুমা, যাই।

আবার আইস্যা যেন আমারে যেন না দেখস। আমি আর পারি না দাদুভাই। আর পারি না। বলতে বলতে নব্বইয়ের সেই রোগা, পাতলা, ফর্সা ফর্সা, চুল-কাটানো বৌচকাটি একটু সামনে এসে বললেন, খাইছস কিছু? তোরে দিছে! আমারে তো কিছুই দেয় না। সব তারা খায়। মরছে তো কী হইচে, তাই বইল্যা খাওন বন্ধ—হেয়া কখনও হয়। কই পাবনায় তো এমন হইত না। অখন সবই যেন কেমন হইয়া গেল—

মণ্ডুককথা

হাতের তেলোর ভেতর বোর্ড পিন ফোটালে কেমন লাগে?

ভোঁতা, জঙ ধরা পিন হলে একরকম। স্টেশনারি দোকান থেকে সবে কিনে আনা নতুন পিনে আর এক রকম ব্যথা। দুটো কষ্টকে মন দিয়ে আলাদা করতে করতে শুধু হাতের পাতাতেই নয়, পায়ের পাতাতেও সেই বোর্ড পিনের খোঁচা টের পেল অরূপ।

বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের ক্লাস ইলেভেনের বায়ালজি প্রাকটিক্যাল ক্লাস। মোম মাখান চৌকো, লম্বাটে ট্রের ওপর ব্যাঙ। তার আগে ক্লোরোফর্ম ছিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে ব্যাঙকে। তারপর চিৎ করে ফেলে তার জননতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র—সব পর পর ডিসেকট করা। সেটা ১৯১৯। একটা 'ভারত' বা 'পানামা' ব্লেডের দাম পাঁচ নয়া পয়সা। এখন যে কয়েনটাকে আর প্রায় দেখাই যায় না। এক, দুই, তিন পয়সা তো উঠে গেছে বহু দিন। ব্লু কোটিং দেয়া 'প্রিন্স' ব্লেডের দাম দশ নয়া। 'সেভেন ও ক্লক' আর একটু বেশি। সে যাক গে।

নতুন কেনা ব্লেডে কেঁচো, আরশোলা, ব্যাঙ, চিংড়িমাছ—এক বছরে এই চার রকম প্রাণী কাটা। কালো বা সবুজ ভেলেভেটে মোড়া বাহারি বায়ালজি বক্সে সরু মুখের কাঁচি, চিমটে, ক্ষুর, ছুরি—সব স্টিলের। আর আতশ কাচ। মোম-ফেলা ট্রের ওপর সামান্য জল। সেই জলে চার হাত পা ছড়ান ব্যাঙ। বাতাসে ক্লোরোফর্মের ঢিমেতালা গন্ধ। চোখে আতশ কাচ দিয়ে ব্যাঙের গভীরে জেগে থাকা সেই সব প্রত্যঙ্গ দেখা।

তারা তো সব কুনো ব্যাঙ। তখন বালির বাড়িতে বর্ষা পড়তে না পড়তেই গাদা গাদা ব্যাঙ। ঘুঁটের বস্তার পাশে। ভাঙা, না-ভাঙা কয়লার ঢিবির ধারে। ঘরের ভেতর, রান্নাঘরে উঠে আসে ব্যাঙের ছানারা। ধাড়ি কোলা ব্যাঙও। বর্ষার জমা জলে, ডোবায় কিলবিল করে ব্যাঙাচি। আস্তে আস্তে ল্যাজ খসে গেলে একসময় তারা ব্যাঙ।

বাযালজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্যে স্কুলে একটা আরশোলা চার আনায় বিক্রি করে যেত একজন। তার কাছে বড়সড় কুনো ব্যাঙ এক টাকা। তখন এক টাকার অনেক দাম। প্লাস্টিক প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে, নয়ত উনোন থেকে মায়ের পোড়া কয়লা তোলার লোহার চিমটে দিয়ে ব্যাঙ ধরেছি। বায়ালজি প্রাকটিক্যাল ক্লাসে কাটার ব্যাঙ। গায়ে হাত পড়লেই ব্যাঙ চিরিক করে...। সেই পেচ্ছাপ গায়ে লাগলেই নাকি ঘা। ব্যাঙের থুতুতেও নাকি গরল। বিষ।

তখন রাস্তাতে অনেক সোনা ব্যাঙ। একটু জল পড়লেই গ্যাঙর গ্যাঙ ব্যাঙের ডাক। 'ডাকিছে দাদুরী মিলন পিয়াসে/ঝিল্লি ডাকিছে...' পাঁচ টাকা দিলে কলেজ ল্যাবরেটরির বেয়ারারা কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের 'সল্ট' বলে দেয়। যাক গে সে সব কথা। সেটা ১৯১০।

বালির বাড়ির স্যানিটারি পায়খানায় পর পর তিনটে চেম্বার। দেড় মানুষ সমান সেই চেম্বারের ওপর সিমেন্টের ঢালাই ছাউনি। পাশের সোকপিটে কোনো ঢাকনা নেই। সেখানে জল জমে। অনেক মশা। ঝাঁক বাঁধা মশারা গুন গুন গুন গুন করে। সেই সোকপিটের জমা জলে বড় বড় সোনা ব্যাঙ। আধ হাতের থেকেও বড় লম্বা। চার হাত পা ছড়িয়ে সেই

সব ব্যাঙেরা সাঁতার দিত। তখনও ব্যাঙের ঠ্যাঙ বিদেশে বরফ চাপা দিয়ে চালান দেয়া শুরু হয়নি।

বড় ব্যাঙকে বাবা বলতেন, ভাইয়ো। ছোট ব্যাঙকে কুতকুতি। এই ভাইয়ো কথাটি কি বাবার আবিষ্কার! নাকি ঢাকা থেকে নিয়ে আসা অনেক স্মৃতির সঙ্গে সেই 'ভাউয়া' শব্দটিও এসে গেছিল—তা থেকেই ভাইয়ো, যা বড় ব্যাঙ বলতে বোঝায়।

ব্যাঙের মাথায় নাকি মণি থাকে। কে জানে কেন, ছোটবেলায় এই সব বিশ্বাস করতে বেশ লাগত।

রূপকথার গল্পে অভিশপ্ত রাজপুত্র ব্যাঙ হয়ে যায়। তার বিয়ে হয় রাজকুমারীর সঙ্গে। তারপর এক সময় সেই ব্যাঙের খোলস পুড়িয়ে দিয়ে রাজকুমারী পেয়ে যায় রাজপুত্রকে। আর রাজপুত্তুর? তার কি কোনো যন্ত্রণা থাকে? কষ্ট? খোলস হারানর বেদনা?

কি করে হয়? কি করে? অরূপের মাথার ভেতর নাগরদোলার পাক।

পঁয়তাল্লিশ প্লাস অরূপ বাগচির এতসব কথা পর পর মনে পড়ল না। কিন্তু তার মাথার খাদে ক্লোরোফর্মের ভারী গন্ধ। মোমমাখা ট্রের ওপর শোয়া তার হাত পায়ে বোর্ড পিন। সকালে অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে ঝর্ণা বলেছে, এমাসে একটা মশারি কিনতেই হবে। রোজ অ্যাত মশা ঢোকে। আসলে পাঁচশ টাকা দিয়ে বছর তিনেক আগে একটা মশারি কিনেছিল অরূপ। তাদের শোয়ার খাটের মাপ সাড়ে ছয় বাই সাত ফিট। বক্স খাট। ফরেন নেটের সেই মশারিতে খুব হাওয়া ঢুকত। কিন্তু হলে হবে কি! এক মাসের ভেতরই পোকায় তার দফাদফা করল। ফুটো আর ফুটো। কত আর জোড়াতালি দেয়া যায় রোজ! সেই ফুটো দিয়ে মশা। মাঝরাতে উঠে রক্ত খেয়ে টুবো হওয়া সেই মশা মারা। দু হাতের পাতায়, আঙুলে রক্তের ছোপ। পায়ে হাতে মশার কামড়।

খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে চারপাশে। সঙ্গে ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। কি, শুনতে পাচ্ছ! বাচ্চা-কাচ্চার ঘর। একবার ম্যালেরিয়া, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বা অন্য কিছু হলে আর উপায় নেই। এনকেফেলাইটিসও হচ্ছে চারপাশে, কাগজে দেখলাম। মশারি না কিনলে এবার...

লোকজনের যত না হচ্ছে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা এনকেফেলাইটিস—তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হচ্ছে খবরের কাগজের হেডিংয়ে। এমন লিখছে যেন মড়ক লেগে গেছে কলকাতায়। বলেই অরূপের মনে হল, মোম মাখান ট্রের ওপর জলের পাতলা মলাটের নিচে চার হাত পায়ে পিন লাগান অবস্থায় কাটা পেট নিয়ে সে শুয়ে আছে।

যাই বল তুমি, মড়ক না হোক, মারা তো যাচ্ছে লোকজন। হাসপাতালের ভেতর ম্যালেরিয়ার দাপট। আর গোটা কালিঘাট ভবানীপুর টালিগঞ্জ তো—ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চল হয়ে গেল। নর্থে শ্যামবাজার বৌবাজার বাগবাজার কলেজস্ট্রিট—সব জায়গায় ম্যালেরিয়া। রাত নটার পর নাকি ম্যালেরিয়ার মশা কামড়াবার জন্যে উড়ে আসে। আর যে বাড়িতে ঢোকে তাদের বারোটা বেজে গেল। পালা করে করে জ্বরে পড়া। কাঁপুনি, খিঁচুনি, কখনও মৃত্যু। না বাবা, আর রিসক নেয়া যায় না। তুমি এ মাসেই একটা মশারি কেন!

নিজের পনের বছরের বিয়ে করা বৌয়ের দাঁত খুব সাজান, হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় ঝর্ণাকে। তার দিকে তাকালে অরূপ টিভি-র পর্দায় ধারাবাহিক চেতাবনী—পাত্রে জল

জমাবেন না, পরিষ্কার জলে ম্যালেরিয়ার মশা ডিম পাড়ে—এমনটি শুনতে পায়। কিংবা তাদের ছেলেবেলায় শোনা সেইসব ছিকুলি-ধাঁধা—'এক থালা সুপারি গুনিতে না পারি।'

কি হবে এর উত্তর?

কেন, তারা বসান আকাশ।

'বন থেকে বেরুল টিয়ে/

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' মানে কি?

জানি তো—আনারস।

'বগা ঠুঁটি বগা ঠুঁটি বগাও তো নয়/

উড়ে উড়ে পেখম ধরে ময়ূরও তো নয়

মানুষ খায় গোরু খায় বাঘও তো নয়

শহরে বন্দরে ফেরে চোরও তো নয়।' কি হবে এর উত্তর?

মশা।

আর এইটা—'ঘরের মধ্যে ঘর/তার মধ্যে পড়ে মর'?

মশারি।

ঝর্ণার সঙ্গে এইসব কথা হয় না। কিন্তু অরূপ বাগচি তার বৌয়ের সাজান দাঁতে টিভি-র পর্দা দেখতে দেখতে ভাবতে শুরু করে, এমাসে আমি এত কি করে পারব ঝর্ণা! নিয়ম মতো তিন মাসের বিল একসঙ্গে পাঠিয়েছে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। একটা তারিখের আগে তিন মাসের বিল একসঙ্গে দিলে খানিকটা বেশি রিবেট পাওয়া যায়। তাই বা কম কি? ধর—নশো টাকা ইলেকট্রিক বিল, ফোনের বিল সাতশো, হল ষোলশো। তারপর তুতুল-মিতুল—আমাদের দুই কন্যার ক্লাস সেভেন আর এইটের টিউশন ফি। তিনশো তিরিশ প্লাস তিনশো পঁচানব্বই। ক্লাস এইটের তুতুলের দুজন প্রাইভেট টিচার। ইংরেজি বাংলা—মানে ল্যাংগোয়েজ গ্রুপ—দুশো টাকা। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিকস—সায়ান্স গ্রুপ—তিনশো টাকা। দুজনের আঁকার স্কুল। ষাট প্লাস ষাট—মোট একশো কুড়ি। দুজনের নাচ—দেড়শো দেড়শো তিনশো। স্কুলে যাওয়া আসার রিকশা ভাড়া আছে দুজনের—তিনশো সত্তর। পাম্পের বিল আছে। এল আই সি-র একজন হায়ার গ্রেড অ্যাসিসটেন্ট অর কত পারে বল তো! এরপর ফ্ল্যাটের লোন কাটা আছে। ইয়ারলি ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাতে এন এস সি কেনার জন্যে মান্থলি হাজার টাকা রেকারিং। সেই জমা টাকা ভোগ করা তো দূরের কথা, আমি ছুঁতে পর্যন্ত পারব না।

বিদেশি বিমা কোম্পানিকে তো ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ফিস ফিস করে বলে ওঠে অফিসের পুরনো দেয়াল। প্রাচীন দরজা-জানলা বলে ওঠে, সেই রকম বিল আসছে পার্লামেন্টে।

আসছে কি, এসে গেছে। নেহাৎ বার বার সরকার বদলাচ্ছে, তাই—

মালহোত্রা কমিটির রিপোর্ট—

খুব খারাপ দিন আসছে সামনে। নতুন কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। যাকে তাকে, যেখানে সেখানে বদলি করে দেবে—তোমার চাকরির শর্তেই এটা আছে, এমন বলে। জানলা-দরজা, দেয়াল, টেবিল-চেয়ার, পেপারওয়েট, জলের গ্লাস, ফাইল—সবাই ফিসফিস

করে এইসব কথা বলে।

ফিরে আসবে সেই কোম্পানির আমল। ন্যাশনালাইজেশনের পর এল আই সি যে লাভ করে তার অনেকটাই এ দেশের উন্নয়নে খাটে। ব্রিজ তৈরি হয়, রাস্তাঘাট। কোটি কোটি টাকার লাইফ ফান্ড আমাদের—সেখানেও বিদেশি ইনসিওরেন্স কোম্পানি হামলা করবে। এসব শুনলে অরূপ হাতের তালু ও পায়ের পাতায় জঙ ধরা পিনের ব্যথা টের পায়। ক্লোরোফর্মের গন্ধ বসে যায় বুকের ভেতর।

ইউনিয়নও কিছু করতে পারবে না। করার কোনো ক্ষমতা নেই। সব জায়গায় মেশিন বসে যাচ্ছে। কমপিউটার, ফ্লপি। ম্যানুয়ালি আর কিছু হবে না। লোকই লাগবে না অ্যাত। ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর থাকবেই না বলতে গেলে। যা থাকবে—তা হল কয়েকজন অফিসার আর কিছু মেশিন।

ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর না থাকলে ইউনিয়নের চাপও নেই।

মনমোহন সিং, চিদাম্বরম, যশোবন্ত সিনহা—সবারই কথাবার্তা কাছাকাছি। বিমা বেসরকারিকরণ করতে হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর সামনে খুলে দিতে হবে ব্যবসার দরজা।

এসব কথার ছ্যাঁকা অফিসে ঢুকলেই গায়ে লাগে। অরূপ বাগচি বুঝতে পারে বেশ বড় কিছু একটা রদ-বদল হতে যাচ্ছে। বড় টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের চৌকো নেমপ্লেট, তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা—অরূপ বাগচি—এইচ জি এ—হায়ার গ্রেড অ্যাসিসটেন্ট। তার টেবিলের নেম প্লেটও কি কি যেন বলে। শুনতে পায় অরূপ।

পরীক্ষা দিয়ে অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে ঢুকেছিলাম। তারপর আবার পরীক্ষা দিয়ে এইচ জি এ। তাতে মাইনে হয়ত সামান্য বাড়ল। কিন্তু দাযিত্ব বাড়ল অনেক। এখন অন্যকে কাজ দিতে হয়। অফিসাররা প্রায়ই ডেকে পাঠান আমাকে।

ইউনিয়ন এই যে স্ট্রাইক ডাকে, নয়ত এক ঘণ্টার কর্মবিরতি—তাতে আরও ক্ষতি আমাদের। মাইনে কাটা যায়। টানাটানি বাড়ে সংসারের।

কি হবে এই সব স্ট্রাইক-মাইক করে! যা হবার তো হবেই। বিদেশি কোম্পানি আসবেই। সরকার যা করার করবেই। কেউ কিছুই আটকাতে পারবে না।

এমন অনেক কথা মেঘ হয়ে অফিসে ঘোরে। পাশাপাশি চলে গেট মিটিং, স্লোগান, কর্মবিরতি। জলের গ্লাস, ফাইল। ইউনিয়নের চাঁদা। বেস কমিটি। ঘরের মেঘ বাইরের মেঘ কখনও কখনও এক হয়ে যায়।

তিনটে ডি এ কমে গেল পরপর।

তার মানে মাসে হাজার টাকা কম। আমরা চালাব কি করে?

এক হাজার টাকা। ভেবে দেখুন, এক হাজার। বলতে বলতে হাত-পায়ের তেলোয় ভোঁতা পিন ফোটাবার যন্ত্রণা টের পায় অরূপ। মাথার ভেতর ক্লোরোফর্মের নাচ। নাকের মধ্যে সেই ঝিমঝিমে গন্ধ। দু চোখ জড়িয়ে আসে।— দেশে নাকি মুদ্রাস্ফীতি কমছে!

কোথায়! জিনিসের দাম তো কমে না।

এই তো, এই তো কাগজে লিখেছে—বলে আর একজন এইচ জি এ খবরের কাগজ

এগিয়ে দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি কমল

নয়াদিল্লি ৮ আগস্ট—মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার গত ২৪ জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে আরও কমে হয়েছে ১.১৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে তা ছিল ১.৬২ শতাংশ। গত বছর এই একই সময়ে এই হার ছিল ৮.৭৮ শতাংশ। পাশাপাশি আলোচ্য সপ্তাহে সমস্ত পণ্যের জন্য পাইকারি মূল্যসূচক সামান্য বেড়ে হয়েছে ৩৫৭.৪। আগের সপ্তাহে তা ছিল ৩৫৭.৩।—পি.টি.আই।

এসব তো কাগজে-কলমে কমে। খবরের কাগজে তিনের পাতায় পাঁচ ছ লাইনের এই খবর পড়ে গা-জ্বালা করে। বাজারে গেলে কোথাও টের পাওয়া যায় না মুদ্রাস্ফীতি কম। সব জিনিসের দাম বাড়ছে—ইনফ্রেশন—ইনফ্রেশন। কিন্তু খবরের কাগজ ডাটা দিয়ে দিয়ে দিব্যি কমিয়ে দিচ্ছে। আর ডি এ কমে যাচ্ছে আমাদের। এসব ভেবে অরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। এই এক বাড়তি খরচ। প্রতিবার বাজেটের পর ভাবি ছেড়ে দেব। দিন পাঁচ-সাত সিগারেট ছাড়া থাকিও। তারপর একটা দুটো একটা দুটো করে, যে কে সেই। ঝর্ণা এক সময় খুব মুগ্ধ থাকত সিগারেটের গন্ধে। এখন বিরক্ত হয়।

কি খাও এইসব ছাইপাঁশ। অকারণ কাশি হয। গলায় ইরিটেশন। তুতুল-মিতুলেরও তো প্যাসিভ স্মোকিং-এর থেকে। অ্যাত দেখাচ্ছে টিভি-তে। কিন্তু আমাদের কানে গেলে তো, পয়সা দিয়ে কি এক গাদা ধোঁয়া গেলা। এসব বলতে গিয়ে ঝর্ণার সাজান দাঁত কাঁটাতারের বেড়া হয়ে দাঁড়ায়।

অফিসে এখনও নন স্মোকিং জোন হয় নি। বাইরে গিয়েও ফুঁকতে হয় না। কলকাতার অনেক অফিসেই স্মোকিং ফ্রি জোন হযে গেছে। হাওয়ায় ধোঁয়া মেশাতে মেশাতে অরূপ ভাবল ভি আর এস দিলে আমি কি নিয়ে নেব? পরে যদি ভি আর এসও না দেয়! ফরেন ব্যাঙ্কগুলোতে যেমন নোটিশ দিয়ে পর পর টারমিনেশান-এর চিঠি ধরিয়ে দিচ্ছে। কাল কিংবা পরের মাস থেকে তোমার আর চাকরি নেই। দৌড়-ঝাঁপ করে সকাল নটায় অ্যাটেনডেন্স। তারপর ফেরার সময়ের কোনো ঠিক নেই। কোম্পানি কার লোন দেবে। গাড়ি কিনে মাসে চল্লিশ লিটার কি আর একটু বেশি পেট্রল ফ্রি। সেই স্বপ্নের চাকরি চলে গেলে আলিবাবার গুহার দরজা রাতারাতি বন্ধ। সুপার অ্যানিউটেড ম্যান।

সামনে লম্বা টেবিলের ওপর জল রঙের কাচে নিজের মুখ ভেসে উঠলে একটা ব্যাঙকেই যেন দেখতে পায় অরূপ। মাথার চুল অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে চওড়া কপাল। সেই কপালে ব্রণের দাগ। নতুন ফুসকুড়ি। কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিড, আমাশা।

চোখে চশমার বড় বড় কাচ আরও বড় হয়ে ভেসে উঠল টেবিলের কাচে। ব্যাঙের চোখ। ব্যাঙের জিভ ওল্টান। সেই ওল্টান জিভ নিয়ে ব্যাঙ পোকা-মাকড় শিকার করে। কবে পড়েছিলাম যেন প্রকৃতি বিজ্ঞান বইয়ে। অরূপের মনে পড়ল।

কলকাতায় আর ব্যাঙ দেখতে পান অরূপবাবু! নিজের ছায়াকে নিজেই জিজ্ঞেস করে অরূপ।

নাতো—নিজের প্রশ্নের জবাব দেয় নিজেই।

আগে রাস্তা-ঘাটে খুব দেখা যেত ব্যাঙ। সোনা, কোলা, গেছো, কটকটে, কুনো। সত্তর সালে—হ্যাঁ, ঐ সময়েই হবে, ব্যাঙ ধরে ধরে চালান দেয়া শুরু হল না?

আপনার অ্যাত মনে থাকে কি করে অরূপবাবু?

ঐ যে হাতে পাঁচ ব্যাটারি, নয়ত তিন সেলের বড় টর্চ। অর পিঠে বড় ঝোলা। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে। একজন নয়। অনেক লোক।

ব্যাঙ ধরত কি দিয়ে?

কেন চিমটে, নয়ত কোচ।

তারপর ধরে ধরে বিদেশে। লোকাল রেস্তরাঁয়ও কখনও। খুব দামী ডিশ। ফ্রগ লেগ একেবারে চিকেন লেগ পিসের মতো। অসাধারণ। ডিলিশাস।

সিগারেটের ধোঁয়ায় অরূপের মুখ আবছা হয়ে গেলে টেবিলের কাচে জলছবি হয়ে ভেসে থাকা তার ছায়াও আড়াল হয়ে যায়।

সাউথ বেঙ্গলে খুব ব্যাঙ ধরত লোকজন। ধরে ধরে একেবারে ভুষ্টিনাশ। ব্যাঙের বংশ শেষ। বিশেষ করে সোনা ব্যাঙ। লোভ। মানুষের লোভ। টাকা। আরও টাকা। অনেক টাকা। ফরেন কারেন্সি। বৈদেশিক মুদ্রা। উন্নয়ন।

ব্যাঙের আরও সব কি কি নাম আছে যেন অরূপবাবু?

ও মিস্টার বাগচি—আপনি এও জানেন না! অথচ সকালে বাংলা দৈনিকটি এলেই তো তার পাঁচের পাতায় 'শব্দছক'-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তিমি মাছকে যে গিলে খায়, এতো তাকেও গিলে খায়—তিমিঙ্গিল গিল—হবে কি? আর এই সরস্বতী ছিলেন বাংলার সাধক কবি?

এতো পরমানন্দ সরস্বতী।

উপনিষদ বিশেষ, ছ অক্ষরে?

বৃহদারণ্যক।

সকালে সব কাজ ফেলে শব্দছক নিয়ে নাড়াঘাঁটা করলে ঝর্ণা বিরক্ত হয়।— কি রিটায়ার্ড পার্সনের মতো দিনরাত শব্দছক কর।

করি তো। যাতে আলঝাইমার না হয়।

ঐ ভুলো-রোগ তোমার হবে না। আমার সঙ্গে ঝগড়ার পরেই সব কথা যে ভাবে মনে রাখ তুমি।

বয়েস হলে কি হবে, কিছুই বলা যায় না ঝর্ণা। কিস্যু বলা যায় না। ব্রেন সেল যদি একটু একটু করে শুকিয়ে যায়—

রাখ তো তোমার বাজে কথা। বাজে কথা বাদ দাও।

ব্যাঙের আর প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ কি আছে? বেঙ, দাদুরী, ভেক, মণ্ডুক। মণ্ডুক শব্দটা যেন কোন একটা বাংলা সিনেমায় শুনেছিলাম! কোন সিনেমায়—কোন সিনেমায়—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আগন্তুক। সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক। উৎপল দত্ত বলেছিলেন কথাটা। একটা ডায়ালগে। কূপমণ্ডুক—কুয়োর ব্যাঙ হয়ো না। বা এরকম কিছু। কি অসাধারণ অভিনয় উৎপল দত্তের। একেবারে সমস্ত রকম ম্যানারিজম বাদ নিয়ে অন্য ধরনের ক্যারেকটার

রোল। 'আগন্তুক' ছবিটা অবশ্য তেমন আহামরি কিছু লাগে নি অরূপের।

আমার সি আর-এ কি কোনো কালো দাগ পড়ল? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করে অরূপ। অফিসে প্রতি মাসের শেষ তিন দিন খুব কাজের চাপ থাকে। আর মাসের প্রথম তিনদিনও। তখনও মাথা তোলা যায় না। এছাড়া মার্চের ইয়ার এন্ডিং তো আছেই। কিন্তু অ্যাত করেও কি শেষ রক্ষা হবে? পারব কি রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত চাকরি করতে! আমার দুই মেয়ে, ঝর্ণা, বাকি জীবন, ফ্ল্যাটের লোন! বয়েস হলে শরীর ভাঙবে। শরীর খারাপ হবে। মেয়েদের এডুকেশন খরচ। বিয়ে—সবই তো আছে।

বালির বাড়িতে—একতলার একটা ঘর, কমন বাথরুম-পায়খানা নিয়ে থেকে গেলে হাউজ বিল্ডিং লোনের টেনশান, আরও নানান খরচের ধাক্কা—এসব নিয়ে দুশ্চিন্তার পাহাড় ঘাড়ে চাপত না। কিভাবে ম্যানেজ হবে সব, যদি সত্যিই চাকরি না থাকে! কোথায় গিয়ে দাঁড়াব! এসব অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে মাথার ভেতর উথাল-পাথাল হতে থাকে। বুকের মধ্যে ছড়ায় ক্লোরোফর্মের ঝাঁঝ। কি রকম যেন একটা ঝিমঝিমে ব্যাপার।

ডি ও এজেন্টরা কাজের জন্যে অরূপের সামনের টেবিলে বসে। ডেথ ক্লেম।

স্যার, আমারটা একটু দেখবেন।

স্যার, আমার কেসটা—

আমারটা স্যার—

অরূপ শুনতে পায় তাকে ঘিরে অনেকগুলো ব্যাঙ ডাকছে—গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাঙ। গ্যাঙোর—

এরা কি ব্রাঞ্চে নতুন! আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। না কি দেখেছি! নিজের ভেতর এসব গিলে নিয়ে অরূপ বলল, আচ্ছা, আপনারা কেউ ব্যাঙের আধুলির গল্পটা জানেন?

কি গল্প স্যার?

জানেন না!

একটু যদি ধরিয়ে দেন স্যার।

ঐ যে একটা ব্যাঙ রাস্তায় একটা আধুলি কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেই চকচকে আট আনা হাতে পেয়ে কি তার গুমোর। রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া হাতিকে দেখে পেট ফোলাতে ফোলাতে তার মতো বড় হতে গিয়ে শেষ অব্দি ফটাস।

ফটাস মানে!

পেট ফেটে গেল। হাতি হতে গিয়ে পেট ফেটে গেল ব্যাঙের! ব্যাঙ ফিনিশ।

কি বলছেন স্যার! ব্যাঙটা মরে গেল। খুবই দুঃখের কথা স্যার। নিন, এটা রাখুন প্লিজ।

বলেছি না, এসব সিগারেটের প্যাকেট ফ্যাকেট কখনও আনবেন না আমার জন্যে। কাজ হলে এমনি হবে। না হলে হবে না।

না স্যার, কাজের জন্যে নয়। আপনি সিগারেট পছন্দ করেন, তাই—

আমি আরও অনেক কিছু পছন্দ করি। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন করবেন না।

তাতে আপনাদের অসুবিধে হবে। আপনারা কি এ ব্রাঞ্চে নতুন? আগের কথাগুলো বললেও শেষ বাক্যটি বলা হল না অরূপের। তার মনে পড়ল যে ভাবেই হোক এ মাসে একটা মশারি কিনতেই হবে। রোজ রাতে ফাঁক-ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ছে মশা। রক্ত খেয়ে ঢিব হয়ে বসে থাকছে। ভাবতে ভাবতে সামনের লোকগুলোকে অরূপ বলল, আজকে আপনারা আসুন। মুড স্পয়েল করবেন না।

সাড়ে ছয় বাই সাত ফিট খাটে অর্ডিনারি নাইলন মশারি দুশো আশি টাকা। টু হান্ড্রেড এইটটি। ভালো—ফরেন কোয়ালিটির নেট নিলে ছশো—সিক্স হান্ড্রেড। মশারি এখনই দরকার। চেতলা হাটে সস্তা পাব কি মশারি? নাকি হাওড়ার মঙ্গলা হাটে? কিংবা বড়বাজারে?

হাতের তালুতে ফোটান পিনের যন্ত্রণা আবারও টের পেল অরূপ বাগচি। সঙ্গে পায়ের পাতায় বিঁধে থাকা পিনের কষ্ট। নাক-মুখ ভরে গেল ক্লোরোফর্মের গন্ধে। ঢেকুর তুললেও ক্লোরোফের্মের গন্ধ উঠে আসছে।

খরচ পর পর সেজে থাকে। আমি আর কত পারি! সামনের মাসে চাটার্ড বাসটা ছেড়ে দেব ভাবছি। তাতে বেশ কয়েকটা টাকা বাঁচবে। কিন্তু অনিশ্চয়তা! সে তো বেড়ে যাবে নিয়ম মতো। ঐভাবে *ঠেলেঠুলে* বাসে *ওঠা*। ভাবলেই গা কেমন করে। গলা শুকিয়ে আসে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কিছু কিছু আরাম চায়। সেই আরাম অর্জন করতে গেলে টাকা লাগে। চাকরি করে সৎপথে থেকে টাকা হয়! এসব ভাবলেই মাথা ভারী হয়ে আসে ক্লোরোফর্মের গন্ধে। দুপুরের ভাত-তাকারি-ডাল-মাছের বদহজমি ঢেকুর জড়িয়ে যায় জিভের সঙ্গে। কেমন যেন টকসা একটা জল *উঠে* আসে ভেতর থেকে। বাইরে মেঘমাখা শ্রাবণের পৃথিবী আস্তে আস্তে ভেপসে *ওঠে*।

বালি শান্তিরাম রাস্তার বাড়িতে আমরা তাঁতের মশারি টাঙিয়ে রাতে শুতাম। সেই মশারি ময়লা হয়ে গেলে মা গরম জলে সোডা দিয়ে সেদ্দ করে কেচে নিতেন। পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। তারপর নেটের মশারি এল। সুতির নেট। ক্ষারে কাচা মশারির গায়ে একটা সাবান সাবান গন্ধ। সব পর পর মনে পড়ে যাচ্ছে অরূপ বাগচির।

মশারি কিনতেই হবে এ মাসে। সঙ্গে কেনা দরকার দু দুটো ওয়াটার প্রুফ। তুতুল-মিতুল—দুজনের জন্যেই ডাকব্যাক কোম্পানির ওয়াটার প্রুফ। অর্ডিনারি ওয়াটার প্রুফ কিনলে বগল থেকে বড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। রিকশায় বসে মেয়েরা ভেজে। এভাবে ভিজলে জ্বর হবে। দুটো ওয়াটার প্রুফ মানে আরও প্রায় শ ছয়েকের ধাক্কা। কোত্থেকে পাব আমি অ্যাত টাকা! এসব ভাবলেই হাতের তালু, পায়ের পাতায় মরচে ধরা পিনের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে।

ভাবতে ভাবতে আবারও ফাইলের গলিঘুঁজিতে ফিরে গেল অরূপ বাগচি।

মশারি না কিনলে সত্যি সত্যি এবার বিপদ হবে।

দেখছি। দেখছি। বলে ঝর্ণার কথাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল অরূপ। আজকাল একই কথা অনেকবার করে বলে ঝর্ণা। এ কি বয়েস বাড়ার সংকেত? আমিও কি একই বাক্য রিপিট করি! নিজে টের পাই না।

একবার ম্যালেরিয়া হলে কিন্তু—

আমাদের এই এলাকা ম্যালেরিয়া জোন নয়।

না হোক। মাঝরাতে উঠে রোজ ফটাস ফটাস করে মশা মারা যে কি বিরক্তিকর, যে মারে সে জানে। তুতুল-মিতুলদের মশা কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দেয় একেবারে।

দেখছি। এমাসেই—বলে সিগারেট-দেশলাই নিয়ে ছাদে উঠে যায় অরূপ।

ফুটো মশারির ভেতর শুয়ে ঘুম আসতে দেরি হয় না। ঘুমে ভাসতে ভাসতে বালির বাড়ির ঢাকনা ছাড়া সেই সোকপিটের ভেতর উপুড় হয়ে ভাসা বড়সড় সোনা ব্যাঙটিকে দেখতে পায় অরূপ। কি তার বিশাল বিশাল ঠ্যাঙ। এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারে কতটা রাস্তা।

ঘুন ঘুন ঘুন ঘুন করে মশার ঝাঁক উড়ছে সোকপিটের জলের ওপর। তা থেকে কখনও কখনও একটি দুটি একটি দুটি পেটে যাচ্ছে সোনা ব্যাঙের।

ব্যাঙ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মশা বাড়ল। ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে উঠল অরূপ। তারপর পাশ ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ল কতদিন আগে ছেড়ে রাখা সেই ব্যাঙের চামড়াটির কথা। ব্যাঙের চামড়া গা থেকে সরিয়ে রেখে রাজপুত্তুর হলাম। সেই ছালটি এক রাতে তুমি কি পুড়িয়ে দিলে ঝর্ণা? না কি অন্য কেউ? আমার অভিশাপ কি মুছে গেল তাতে? আবার আমি ব্যাঙ হয়ে যেতে চাই। বালির বাড়ির সোকপিটে ভাসা সোনা ব্যাঙ।

ঘুমের ভেতর আস্ত এক মণ্ডুক হয়ে উঠতে চাইল অরূপ।

আজান-গাছ

শেষ রাতে কথা বলে উঠল আজান-গাছ।

কথা তো বলেই। তারপর উড়েও যায় রাতের অন্ধকারে। তখন তার দুপাশে ডানা নেই। তবু গাছ ওড়ে।

ও গাছ, তোমার নাম আজান কেন?

সে হবে নে—এক কিস্যা আছে।

কি কিস্যা ভাই, বলা যাবে না?

যাবে তো।

তা বল তা-লে।

সে হবে এখন পরে—

এমনটি বলতে বলতে আজান-গাছ সামনে নদীর দিকে তাকায। এই তো মাঠ ছিল, সেদিন। এখন সেখানে ভর-ভরাট নদী।

নদী বলল, গাছ ভাই, গাছ ভাই—

শুধু গাছ ভাই বললে হবে না। বল আজান-গাছ—আমার একটা নাম নেই—

আকাশে রোদ একটু একটু করে উঠে আসতে চাইছে। তার ছাযায-আলোয সেই গাছের ডালে-পাতায ছাযা-আলোর চিরি চিরি। গাছ তো ঝুরি নামিয়েছে অনেক অনেক বছর আজে। হাত চেহারার ডালপালার গা থেকে দাড়ি যেমন নামে, কিংবা ল্যাজ—তেমন তেমনই ঝুরি।

গাছটা অশ্বত্থ। প্রাচীন অশ্বত্থ।

কি গাছ, তাই তো?

গাছ চুপ করে থাকে।

এসবই একা থাকলে শুনতে পায নবু শেখ। কিন্তু দেখতে পায না গাছকে। আজান-গাছ কত দিন যে মুছে গেছে।

ও নবু, কি কর তুমি?

কেন, ঘোড়ার গাড়ি চালাই।

কি নাম তোমার ঘোড়ার?

নাম তো দেই নাই। নাম নেই কোনো।

তা ডাকো কীভাবে?

ঐ যে—এই, ঐ, শোন রে—এদিকে শোন।

কথা শোনে ঠিকঠাক?

শোনে তো।

কি খায় তোমার ঘোড়া, নবু?

গুড়, ভেজা ছোলা, ধানের তুষ।

রোজ?

হ্যাঁ রোজ। দেড় কিলো ভিজে ছোলা, আখের গুড় পাঁচশো গ্রাম, ধানের তুষ পাঁচ টাকার।

এতে হয়?

হয়ে যায়। বলতে বলতে নবু তার ক্ষয়ে আসা লুঙ্গি আর একটু তুলে শক্ত করে বাঁধে কোমরের সঙ্গে। ময়লা গেঞ্জিও টেনে নামায়।

লালগোলা রথতলা বাজার থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আজান-গাছ আর নদীর ধারে পৌঁছতে লাগে চল্লিশ মিনিট।

নবুর হাতে ঘড়ি থাকে না। যারা নবুর ছাউনি ছাড়া টাঙায় চাপে, তাদের হাতে আছে। এক ঘোড়ায় টানা ছাউনি ছাড়া টাঙা।

ও নবু, ভাই ঘোড়াটা কত দিয়ে কিনেছিলে?

দু হাজার।

কতদিন আগে?

তা হবে বছর ছয়েক।

ঘোড়ার পায়ের নাল বসান রাস্তা ভাঙার শব্দ—খপ খপ,খপা খপ কখন যেন মুছে যেতে থাকে এই সব কথায়।

পদ্মা খুব ভাঙছে, না ভাই?

শহর থেকে ভাঙন দেখতে আসা বাবুরা এমন কিছু জানতে চাইলে নবু চুপ। নবু জানে এত সব কথা বললে তাকে নিজের ঘোড়াই ধমক দেবে রাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকবে আর বলবে, কি আজে বাজে বকো! যদি পুলিশ হয়!

পুলিশ! ও বাবা, নবু খুব ভয় পায় পুলিশকে। পুলিশ ধরলেই খুব ঝামেলা। বিপদ। কিন্তু পুলিশ তো জানে না নবু রোজ রাতে আজান-গাছের পাশাপাশি এই বিশাল নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যায়। তখন তার গাড়ি সমেত ঘোড়াও ওড়ে। চাঁদের আলো জড়িয়ে গিয়ে লোহার চকচকে পাদানিতে কি একটু ছু-মন্তর হয়ে যায় না। চাঁদ আটকে যায় গাড়ির গায়ে।

আকাশ তখন জিজ্ঞেস করে, ও নবু, তোমার কোনো দুঃখু নেই?

দুঃখু! নেই আবার!

কি দুঃখু তোমার নবু?

সে অনেক। কত বলব।

বলই না।

সে হবে এখন পরে।

পদ্মা এগিয়ে আসছে। একটু একটু করে মাটি ঢুকে যাচ্ছে নদীর বুকে। রোজ রোজ এগোয় নদী। মাটিতে দাঁত বসায়।

শ্রীমন্তপুর, পাহাড়পুর, শিকারপুর—সব পেরতে হয় নদীর ধারে আসতে গেলে। ডান দিকে একটা বড় জলা—অনেকটা লম্বা। তার বুক থেকে পাট-পচানি গন্ধ ভেসে আসে। সন্ধ্যের দিকে ভন ভনানো মশার ঝাঁক।

চু-উ-উ বলে ডাক দিলে সেই সব মশারা কেমন এক সঙ্গে জুটে যায় মাথার ওপর। তারপর গালে গলায় তাদের দু একটা কামড়। কখনও ঢুকে পড়ে মুখের ভেতর।

রাত আরও একটু ঘন হলে একটা চাঁদ জেগে থাকে লালগোলা স্টেশনের মাথায়। আকাশের পাঁচিলে সেই ঘুঁটে থ্যাবড়ানো চাঁদের আলোয় শেষ রাতের স্টেশন একেবারে অন্যরকম। সব গাড়ি ছেড়ে গিয়ে, টিকিট ঘর বন্ধ হয়ে গেলে গোটা লালগোলা স্টেশনই চলতে আরম্ভ করে। তার গায়ে তখন সি. পি. আই (এম. এল)-এর দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির পোস্টার। কাগজের ওপর রঙ আর তুলি দিয়ে দিয়ে—'কোচবিহার জেলে নিহত কামিনী বর্মণ লাল সেলাম।' 'নির্বাচন বয়কট করুন।'

নবু এত সব পড়তে পারে না। কিন্তু গোটা স্টেশনটা চলতে চলতে যখন পদ্মার পাড়ে থমকে দাঁড়ায়, তখন আজান-গাছে বসা একটি ফাজিল দোয়েল বার বার বলে, গোদাগাড়ি হাটে ইলিশ খুব সস্তা।

ইলিশের নাম শুনেই কান খাড়া খাড়া হয়ে ওঠে নবু শেখের।

ঐ যে দুঃখু জানতে চেয়েছিলে না—ইলিশ খেতে পাই না ঠিক মতো। কি দাম সব জিনিসের! সর্ষের তেলও কত দামি আর আক্রা হয়ে গেল! আহা! ইলিশ ভাজা—পদ্মার ইলিশ। কোথায় পাওযা যায় যেন!

কেন গোদাগাড়ি হাটে।

গোদাগাড়ি হাট!

হ্যাঁ, গোদাগাড়ি হাটে আসে বাংলাদেশের ইলিশ।

আহা! বাসি ইলিশের ছালন—কি যে খেতে! খাসির মাংসেব থেকেও—

দোয়েল নবুর এসব কথা না শুনে পা নাচাতে লাগল। আর দুটো শালিক, যারা আজান-গাছের সঙ্গে এপার-ওপার করে রোজ, তারা হঠাৎই বলে উঠল, আজান-গাছ কেন নাম আমরা কিন্তু জানি।

দোয়েল সে দিকে তেমন মন না দিযে আকাশ দেখল।

আর নবু শেষ আশ্বিনের গরমে খানিকটা জেরবার হযে কপালের ঘাম কাচাতে কাচাতে বলল, কেন কেন?

ওর নিচে নামাজ পড়া হত এক সময। আজান দিতেন একজন পাকা দাড়িঅলা বুড়োমানুষ। কি তাঁর গলার সুর। তাঁর সেই সুরে আশপাশের অনেকে এসে জমতেন।

তোমরা এত জানলে কি করে? নবু জানতে চাইল।

গত জন্মে আমি তো—

কি, কি ছিলে তুমি?

সে ছিলাম কিছু।

কি ছিলে বলবে তো! আর গতজন্ম আবার হয় না কি? সে তো শুধু ওদের—

ওদের মানে—শালিকের গলায় জিজ্ঞাসা—

ওদের মানে হিন্দুদের—

আমি তো হিন্দু সাপ ছিলাম গতজন্মে। আমার মাথায় রাম—ও না, রাম নয়, কৃষ্ণের

খড়মের ছাপ ছিল।

তারপর!

তারপর আর কি? মরলাম লাঠির বাড়িতে। তারপর কেঁচো, কেন্নো আর শুঁয়োপোকা জন্ম পেরিয়ে এ জন্মে শালিক।

সাপ আবার হিন্দু-মুসলমান হয় না কি?

হয় তো। দেখলে না বিরানব্বই সালের ৬ ডিসেম্বরের পর কত হিন্দু সাপ। মুসলমান সাপ। চারদিকে সাপ আর সাপ। সবাই ছোবল মারার জন্যে মাথা তুলে আছে।

দোয়েল বলল, জানো তো এখানে—এই আমাদের লালগোলায় দিল্লি থেকে হেলিকপটার উড়ে এসে নামল। লালগোলা এম এন অ্যাকাডেমির মাঠে। সেখানে তখন অনেক তাঁবু। কত কত বানভাসি মানুষ। তাদের খাবার-দাবার। রান্না-বান্না। জল, ওষুধ। কম্বল। যত ভোট-পার্টি, ধর্ম-পার্টি—সবাই হাজির।

নবুর মনে পড়ল পদ্মা কেমন যেন ফুঁসে উঠেছিল বর্ষায়। কি তার ফোঁসানি। বাপরে বাপ! এই আসে। এই আসে। এই বার এসে পড়ল বলে—এভাবে এগোয় পদ্মা।

কিন্তু আজান-গাছের নাম আজান-গাছ হল কেন?

সে তো বললামই তোমায় আগে—বলতে বলতে দোয়েল মাটিতে পোকা খুঁজতে চাইল। এখন আর পোকাও নেই সে রকম। যা কীটনাশক চারপাশে। পোকা হবে কি! ব্যাঙ, সাপ—সব নিকেশ হয়ে যাচ্ছে—তো যা বলছিলাম, সেই পাকা দাড়িঅলা মানুষটা কথা তো বলেছি অনেক আগে। তিনি রোজ আজান দিতেন। দিনে রাতে পাঁচবার।

তারও আগে, সে হবে অনেক, অনেক দিন আগে আজান-গাছের কাছে থাকতেন এক পীরসাহেব। তাঁর শাদা পোশাক। বুক অব্দি শাদা দাড়ি। সেই পীরসাহেবের ছিল দুটি পোষা পরি। সাজন-পরি আর গোজন-পরি। সাজন-পরি ভারি সুন্দর দেখতে। গোজন-পরি ততটা নয়।

সেই পীরের নাম কি দত্তাপীর?

তাতো জানি না। তবে এটুকু জানি সাজন-পরি গান গাইত রাতে। কি সুন্দর তার গলা। তখন আজান-গাছের আশে-পাশে কাউকে হঠাৎ হঠাৎ পরিতে পেত। বলতে বলতে দোয়েল চেষ্টা করল সাজন-পরির মতো গান করতে। একবার, দুবার—হল না বোধহয়। ফেল মেরে মুখ কালো হল দোয়েলের।

আহা, সাজন-পরি। কি তার রূপের বাহার!

পরিতে পেলে কি হয়? নবু জানতে চেয়ে এক ধমক খেল দোয়েলের কাছে।

পরি পাওয়া মানুষ চাঁদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ফেলে। আকাশে বড়, লালচে একখানা চাঁদ দেখলে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছের সঙ্গে সঙ্গে চোখে আরও কত না জল। জল।

চোখে জল এলে কি পুলিশ ধরে? নবু জানতে চাইল।

কি জানি? বলেই দোয়েল্ আবারও সাজন-পরির সুর ধরার চেষ্টা করল।

নবু মনে করতে চাইল আজান-গাছ কি সত্যিই আছে শ্রীমন্তপুর, পাহাড়পুর,

শিকারপুর, সেখালিপুরে? নাকি সেই গাছের ডালে বাঁদররা বাসা করার পর আজান-গাছ সত্যি সত্যি উড়ে চলে গেল। কোথায়? নদীর নিচে কি? নাকি আকাশের ভেতর? তার জায়গায় গজিয়ে উঠল কংক্রিটের মসজিদ। কি তার বড় বড় মিনার। ঝকঝকে। গম্বুজে দামি সিরামিক টালি। মিনারের মাথায় মাথায় সোনালি রঙ। ভেতরের দেয়ালে বড় বড় ঘড়ি। বাঁধান বড় চবুতরায় রমজান মাসে উপচে যাওয়া নামাজেব ভিড়। মসজিদের বড় গম্বুজের পাশে গা-লাগোয়া ছাদেও কত মানুষের কাতার। ও দিকটায় পরপর কয়েকটা দোকনঘর। মাস গেলে ভাড়া পায় মসজিদ কমিটি।

নবু এত সব জানে না। দোয়েল জানে। কিংবা দোয়েলও জানে না। হয়ত জানে হলুদ চোখ আর ঠোঁটের সেই জোড়া শালিক। যারা দিল্লি থেকে বন্যা দেখতে আসা ভি আই পি আর মন্ত্রীদের লাথি দেখিয়েছিল। আর ক্যাচ ক্যাচ কুচ কুচ কোচ কোচ করতে করতে নিজেদের ভাষায় খুব বকে দিয়েছিল তাদের।

শালিকরা কি বলেছিল?

নবু জানে না।

জানে তার ঘোড়া। যার কোনো নাম নেই।

তো সেই নাম ছাড়া ঘোড়া বলছিল, সেখালিপুরের বাঁধ ভেঙে পদ্মা যদি একবার ছুটে আসে না, তাহলে সাড়ে সব্বনাশ। বহরমপুর, জিযাগঞ্জ—সব ভেসে যাবে। পদ্মা মিশে যাবে গঙ্গায়। তখন তো যাকে বলে প্রলযকাণ্ড। পরিদের গল্প—সাজন-পরি আর গোজন-পরির কিস্যা, আজান-গাছের কাহিনী—সব ধুযে যাবে।

সে এমন আর খারাপ কি? বলেই নবু বলল, রাতে তো তোমার পিঠে পাখনা বেরোয়। আমরা দিব্যি গাড়ি সমেত উড়ে যাব নদী পেরিযে। কিংবা খুঁজে নেব সেই জায়গাটা, যেখানে লুকিয়ে আছে আজান-গাছ।

আসলে আজান-গাছ ভয় পেয়েছে। বলে ঘোড়াটি তার মাথা নাড়ল।

কেন, ভয় পাবে কেন?

ঐ বাঁদররা। যারা এসে বলল, এখানে রাম নাম হবে। রামের নাম। দিন রাত রামকীর্তন। অর হবে দত্তাত্রেয়র পুজো।

দত্তাত্রেয় কে তা বুঝি জানো না। তা জানবে কি করে, তুমি তো আর হিন্দু নও। শোন বলি তাহলে। দত্তাত্রেয় হলেন এক বিখ্যাত ঋষি। অত্রির বৌ অনুসূয়ার পেট থেকে জন্মাল দত্তাত্রেয়। বিষ্ণুই জন্মাল আসলে।

তুমি এত সব জানলে কি করে! আমার ঘোড়া তুমি। তুমি দুলদুলের কিস্যা বলবে। নয়ত বোররাকের উড়ে যাওয়া।

তা জানব না কেন? আমাকে বলেছে শালিক জোড়। যাদের একটা কয়েক জন্ম আঁগে হিন্দু সাপ ছিল।

দত্তাত্রেয়র ভাই দুর্বাসা আর সোম। ব্রহ্মা জন্মাল সোম হয়ে। মহেশ্বর দুর্বাসা। সে আরও অনেক গল্প।

গল্প এখন থাক তাহলে। বলতে বলতে নবুর হাই উঠল।

বাইরে চাঁদের আলোয় আলোয় যেন হাজার হাজার যুঁই ফুল ফুটেছে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সারা দিন গাড়িটানা ঘোড়ার হাই উঠল। তার পিঠে, পেছনের পায়ে ডাঁশ, মশা উড়ে উড়ে বসছিল। পেছনের পা ঠুকে ঠুকে মশা তাড়াচ্ছিল নাম না পাওয়া নবু শেখের ঘোড়া।

তারপর এক সময় রাত বেড়ে গেলে ছানা রঙ জ্যোৎস্নার জল কেটে খানিকটা অন্য রঙ হয়ে গেলে ঘোড়া স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে আজান-গাছ ছিল। আর ছিল লালগোলার সেখালিপুরের পাড়ভাঙা নদী। আজান-গাছ তারপর কোথায় যেন উড়ে গেল। পড়ে থাকল একটা বিশাল কালো গর্ত। তার নিচে চাঁদের আলো পৌঁছতে ভয় পায়।

নদী বলল, ঐ বুড়োটার জন্যে পারলাম না সব ভাসাতে। সত্তর পেরিয়ে গেছে, তবু মনের কি জোর। গায়েও তাকদ আছে। নইলে ভাদ্র মাসের ঐ আকাশভাঙা বৃষ্টির ভেতর এসে সবাইকে চিৎকার করে ডাকে—বাঁধ বাঁচাও। বাঁধ বাঁচাও।

ঘুমে একটা ছোট ঢুলুনি মতো এসে গেল ঘোড়ার। মশা তাড়াতে পা ঠুকে ঠুকে আবারও নতুন এক স্বপ্নে ঢুকে পড়তে চাইল। তার মনে পড়ল নদীর পাড়ে বি এস এফ ক্যাম্প। সেই তাঁবুর পাশে ভাঁজ করা সবুজ সবুজ লোহার চেয়ার পেতে হিন্দি খবরের কাগজ পড়ে একজন বি এস এফ জওয়ান। মাথায় চুল কম। কিন্তু কালো গোঁফটি যত্নে পাকানো। নদীর গায়ে মাটি যাতে না ভাঙে, তার জন্যে পাথর। লোহার মোটা জাল। অনেকগুলো বাঁশ।

সেই বুড়োমানুষ, যে কিনা সেই ঝড়জলের রাতে চিৎকার করে সবাইকে ডাকল, বাঁধ বাঁচাল, তার কথা ক-জনেই বা জানে!

ঘেঁষ-মাটিতে তৈরি সরু বাঁধের পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি। তারপরই সেখালিপুর হাইস্কুল, স্থাপিত ১৯০৯। দোতলা স্কুলবাড়ির ময়লাটে হলদে রঙে শেষ বেলার রোদ। রোদটার রঙ অনেকটা যেন জলে ভেজা ভুষি। পাশে বাঁশের গায়ে আটকানো টিনের বোর্ডে নবজাগরণ ক্লাব, বয়রা সেখালিপুর। স্থাপিত-১৯১৭।

এসব আমি খেয়ে নিতে পারতাম। হল না শুধু ঐ বুড়োটার জন্যে। বলতে বলতে নদী ধাক্কা দিল ঘেঁষ-মাটিতে তৈরি বাঁধে।

বাঁধ বলল, আঃ! আঃ!

নদী আবারও ধাক্কা দিতে দিতে বলল, আঃ! আঃ! বললেই হবে! বাঁধ তৈরির লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি, ঠিকাদারবাবুদের বড় বড় বাড়ি হচ্ছে শহরে। দালান-কোঠা। ব্যাঙ্কে মোটা টাকা।

সেই লোকটা—যে কিনা বাঁধ বাঁচিয়েছিল, তার নাম তো মকবুল হোসেন। আধো ঘুমের ভেতর বিড় বিড় করল নবু শেখের ঘোড়া।

আমি লোকটাকে দেখেছি। মকবুল হোসেন আর তার ছোট ভাই নবি হোসেন। দুজনেই এসে দাঁড়াল নদীর পাড়ে। বাঁধের পায়ের কাছে। নদী তার মতো করে উত্তর দিল।

নবি হোসেন বলল, আমরা তো ইঁদুর। জল বাড়লেই ভাসব। ইঁদুর ভাসলেই বা কি! থাকলেই বা কি?

নবি হোসেনের সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। মকবুল হোসেনের মাথার সব চুল শাদা। এসব মনে করতে করতে নবু শেখের ঘোড়া দেখতে পেল আজান-গাছ উড়ে যাওয়ার পর সেই বড়-সড় অন্ধকার গর্ত। তার গভীরের সোঁদা গন্ধ কেমন যেন চেনা মনে হল নবু শেখের ঘোড়ার।

অচিনতলা

গাছটিকে ঘিরে গোটা তিনেক কাহিনী বাতাসে ওড়ে। তারপর উড়তে উড়তে তারা কখনও কখনও আকাশে, মেঘের গায়ে পৌঁছে যায়। সেইসব গল্প গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। কথায় কথায় গাছের নাম হয় অচিনগাছ। সেই গাছের ছায়া মাটিকে যেটুকু আড়াল করে রোদ জল থেকে, কালেদিনে তার নাম হয়ে যায় অচিনতলা।

বহরমপুর থেকে তা হবে পঞ্চাশ কিলোমিটার। সেখানে ডোমকলের বাটিকামারি মৌজা। সেই মৌজার ২০৯ নম্বর দাগের ৯৯ শতক জমিতে ডাল-পাতা ছড়িয়ে রোদ্দুর বাতাস ক্লোরোফিল নিজের গভীরে শুষে নিতে নিতে অচিনবৃক্ষ দাঁড়িয়ে। সেই যে আদি মা-গাছটি, তাকে বোধহয় এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক গাছের গা থেকে এক দুই তিন—এইভাবে পরপর দশটি গাছ। বলতে গেলে গাছে গাছে জঙ্গল একটা।

লম্বাটে সবুজ পাতা। ডালে ডালে সেই পাতার বাহার। জড়ামরি করে দাঁড়ান দশ ভাই, নাকি দশ বোন গাছেদের দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে খুব বড় একখানা সবুজ মেঘ থমকে আছে।

ও মেঘ, গাছের ডালপালা কেমন? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল হাওয়া।

কেন, দেখতে পাও না তুমি? সব সময়ই তো যাচ্ছ-আসছ।

পাই। পাই। কিন্তু তবুও জানতে ইচ্ছে করে তোমার থেকে।

ঐ যেমন হয় বট-অশ্বত্থের ডাল। তবে ঝুরি নামেনি। কাছে গেলে খুব মন দিয়ে সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে যদি আবিষ্কার করা যায় একটি দুটি ঝুরি, তাহলে তাদেরও গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচের দিকে ছায়াল জমিতে নেমে আসতে দেখা যাবে। ঝুরি থেকে নতুন গাছ জেগে ওঠে না মাটি ফুঁড়ে। ঝুরিরা নিজের নিয়মে বাড়ে।

গাছের পাতা ঝরা শুরু বসন্তে। ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্রে পৌঁছলে সেইসব পাতাদের ঝরে পড়ার গান। সন্ধ্যে পেরিয়ে যাওয়া হাটতলায় কেনাবেচা সরে গেলে টু হার্টস থ্রি স্পেড ফোর ডায়মণ্ড—এসব বলতে বলতে তাস চালাচালি খুব জমে। তায়েব আলি মোল্লা তাসের ওপর তাস, রঙের ওপর রঙ চাপাতে চাপাতে বলে ওঠে, জার্ডিন কোম্পানির ডবল চাবি মার্কা সারের বস্তা দেখেছ তোমরা?

তায়েবের চুলে এখনও পেকে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। দিন দুই না কামালে দাড়ির খাঁজখোঁজে শাদা আঁচড় চোখে পড়ে খুব নজর করল্য। মাথার ঠাসা কালো চুলে রোদ্দুর পড়লে চকচক করে ওঠে।

কী করে তোমার এত সব মনে থাকে বল তো?

ঐ মনে থেকে যায়। বল তো প্রফুল্ল সেনের আমলে কবে বড় রায়ট হল?

হল তো রায়ট। কিন্তু সে সব কি মনে থাকে তোমার মতো!

চৌষট্টি সালে। খুব কাটাকাটি। মারামারি। সেই কাশ্মীরের হজরতবাল নিয়ে। খবরের কাগজে কীসব বেরল না। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা-কাজিয়া। তার একবছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ।

টু হার্টস
থ্রি স্পেড
ফোর ক্লাবস
ডবল
রিডবল
পাস

এসব শব্দ—হয়ত বা ঠিকঠিক এইসব কথাই হয়তো নয়, এর কাছাকাছি কিছু হাওয়ায় ভেসে এদিক-ওদিক চলে যেতে চাইছিল। আর মনসুর গাজি নিজের হাতের তাসে, রঙ ফোঁটা সামলাতে সামলাতে বলল, বল দেখি সে সময় পাকিস্তানের পেসিডেন কে?

এ আবার একটা জানার ব্যাপার হল! কেন, আয়ুব খান।

আর ভারতের?

ভারতের প্রধানমন্তিরি লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

বলেই তায়েব আলি মোল্লা বলল, নাও, রঙ বল।

এসব কথার ফাঁকে তাস জমে ওঠে। শাফল করার শব্দ, তাস ভাঁজা, বাঁটা—সব মিলিয়ে আড্ডা বেশ জমজমাট।

তোমার ল্যাংড়ারে মনে আছে তাযেব চাচা? শ্যাম দত্ত জানতে চায়।

সবে পঞ্চাশ পেরন তায়েব তার থেকে বছর আট দশের ছোট শ্যামের দিকে তাকিয়ে বলে, কী বলব বল দিকিনি! ল্যাংড়ারে আবার মনে নেই? শামু পোদের বাড়ি ভাড়া থাকত। তখন পাকিস্তান। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। ঠ্যাঙে গুলি না কী লেগে। এক ঠ্যাঙ কাটা। বগলে ক্রাচ নিয়ে হাঁটত। নাম ছিল হরি মণ্ডল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। হরি মণ্ডল। তোমার তো সব মনে আছে চাচা।

সে আবার থাকবে না! হরিটা তার কাটতে উঠত পোস্টে। ডেমরে কলাগাছ এক হাতে র‍্যাঞ্চের মতো জাপটে ধরে গাছ বেয়ে উঠে কলার কাঁদি কেটে আনত। তার কলাগাছ বাওয়া ছিল দেকার মতো। ঐ ন্যাংড়া পায়ে—নাও রঙ বল—বলতে বলতে হাতের তাস ময়ূরপেখম করে নিজের চোখের সামনে ধরল তায়েব। ক্লাবের টেক্কা, হার্টস-এর বিবি—দেখা যাক—

সেই ল্যাংড়া গুলি খেয়ে ম'ল—

মরবে না! কতগুলো চুরি করেছে তার আগে। শামু পোদের দাদা দিপু পোদ, তার কোঠাবাড়িতে ঢুকে চুরি করে নিয়ে এল না সব—ঘড়ি-রেডিও—একদম বাজি ফেলে। খালি নরম কাদার ওপর ক্রাচের দাগ দেখে শামু দিপু তারে ধরলে—হরিভাই, এ তোমার কাজ।

তা যাই বল তায়েব চাচা, পোস্ট বেয়ে উঠে শেষ অব্দি গুলি তো খেল পুলিশের।

ঐ তোমাদের ভুল। গুলি খাবে কেন! তখন এত পুলিশ কোথায়! ম'ল তো কারেন্ট খেয়ে। শক ঝাড়ল এমন। তিন পাক ডিগবাজি খেয়ে একেবারে নীচে। পড়ল আর ঘাড় ভেঙে মরল।

তাই! আমরা জানতাম পুলিশের গুলিতে মারা গেছে হরি মণ্ডল—বলে শ্যাম নিজের

হাতে তাস দেখল।

মনসুর বলল, নবা কোনো কথা বলছে না। নিজের হাত দেখে খালি রঙ করে যাচ্ছে। নবা, তুই কিছু বল। মনসুর তায়েবের থেকে বছর পাঁচের বড়। আর নবা শ্যামের বয়সি, কি একটু বড়ই হবে হয়ত। নিজের হাতের তাস খেলিয়ে দেখতে দেখতে নবা বলল, কী আর বলব! ল্যাংড়ার মারা যাওয়াটা আমার মনে আছে। তখন আমরা তো ছোট। গ্যালভানইজ করা অ্যালমুনিয়াম তার অনেকটা পড়ে ছিল ল্যাংড়ার পাশে। আমরা কেউ কেউ খানিকটা খানিকটা তার কেটে নিজের নিজের মতো বাড়ি নিয়ে গেছি তখন। অ্যালমুনিয়াম, পেতল দিয়ে তখন বিস্কুট, চানাচুর এই সব পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিদিন পাড়ায় ফিরিঅলা আসে। দাঁড়িপাল্লার একদিকে তামা, পেতল, অ্যালমুনিয়াম, অন্য দিকে চ্যানাচুর, বিস্কুট। ওজনে যতটা যেমন হয়। শেষে পুলিশ আসবে শুনে ভয়েময়ে পুকুরের জলে কাটা তার ফেলে দিলাম। নাও, এবার রঙ বল।

আচ্ছা তায়েব চাচা, আমাদের এই যে দশটা গাছ, যাকে সবাই অচিনতলা বলে, সেটা কেমন করে হল, তার কিছু জানা আছে তোমার?

আছে বইকী বাবা। সে এক জবর কিস্যা।

কী কিস্যা শুনি।

সে অনেক অনেক সাল আগে। বর্ষার সময় বেসুমার পানিতে চারপাশ থইথই। তখন কুমিরের পিঠে চেপে এক দরবেশ আসতেন। কী তার নুরানি চেহারা। মাথাভর্তি শাদা চুল। গালভরা পাকা দাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে চাঁদের আলো।

তারপর?

সেই দরবেশের পরনে শাদা আলখাল্লা। ইয়া লম্বা, উঁচু এনসান। হাতে ফকিরি লাঠি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে সাপ। সেই লাঠির গায়ে শাদা, হলুদ, লাল—নানান রঙের পাতর বসান। দুহাতেই পাতর বসান অনেকগুলো আংটি। গলায় বড় বড় পুঁতি তার পাতরের মালা। তো সেই দরবেশ কুমিরের পিঠে চেপে বেসুমার পানি পেরিয়ে আসতেন ইদিকে। এ গাছ তাঁরই কুদরত। দরবেশের কেরামতিতে গাছ গজাল, বড় হল। সবই আল্লাতালার মেহেরবানি। নইলে বাটিকামারির এক ব্যবসায়ি আবদুল মান্নান কাঠ কাটতে এসে বিপদে পড়বে কেন! দরবেশ সাহেব এসে পানির ভেতর থেকে ডাঙা খুঁজে খুঁজে বার করলেন। তারপর গাছ পয়দা করলেন।

আমি কিন্তু আর একটা গল্প শুনেছি। বলে শ্যাম দত্ত হাতের তাস মাটির মেঝেয় পাতা শতরঞ্চির ওপর নামিয়ে রাখল।

কী, কী গল্প! শুনি—বলে মনসুর তাকিয়ে রইল শ্যামের দিকে।

ঐতো কামরূপ-কামিখ্যে থেকে এল এক জাদুকর। তার পেট বোঝাই কাঁয়ুর-কামিখ্যের বিদ্যে। তার হাতে যে জাদু দেখানর লাঠিটা, সেই লাঠি মাটিতে পুঁততেই গাছ। আমাদের এই অচিনগাছ। সেই জাদু দেখন লোকটা বড় বড় গাছ চালিয়ে আনত আকাশ দিয়ে। উড়ে আসছে গাছ। যেন এক ঝোড়ো মেঘ, হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে। আর সে পাতরও চলত। সেই চালানি পাতর জলে ভাসতে ভাসতে চলে আসত। জলে ভাসা জ্যান্ত পাতর

যেন কচ্ছপ। যাকে মারার দরকার, সেই চালানি পাতর তাকে এসে মারবে এক টুঁসো। ব্যস, খতম। একেবারে অক্কা। বলেই শ্যাম আবারও নজর দিল হাতের তাসে। তারপর তাস ফেলল।

দুর দুর। কী যে বল না শ্যাম! এসব গপপো আছে বটে, তবে দরবেশের গাছ আনাটাই ঠিক। আসমান থেকে গায়েবি-গাছ নিয়ে এলেন হুজুরসাহেব। একেবারে গজব। পাবে এই গাছের সঙ্গে আর কোনো গাছের মিল ? আশপাশের তো নয়ই, দূরেরও না। এ হল আশমানি-গাছ। সেই হুজুরের কুদরত। এইটুকু শেষ করে তায়েব বলে উঠল, হ্যাঁ, কী যেন রঙ ছিল!

এতক্ষণ মন দিয়ে হাতের তাস দেখছিল মনসুর। সব শুনেটুনে বলে উঠল, তোমাদের এসব গপপো ছাড়াও আরও একটা কিস্যা আছে। বাটিকামারির এসাক মোল্লা গো। তার দাদা—পরদাদা—তারও পরদাদা—মানে বাপের বাপ—ঠাকুরদা—তার ঠাকুরদা—এই করে আটাশ পুরুষ আগে গো সে ছিল এক এতবারি শেখ। দেশে তখন তুর্কি রাজা। এতবারি শেখ তুর্কি বাদশার কর্মচারী। এইরকম বর্ষাকাল তখন। এবার তো এখনও সেভাবে বর্ষা নামল না, তো সেবার খুব নেমেছে। গা ছেড়ে নেমেছে। চারদিকে পানি আর পানি। পানির স্রোত একেবারে। বজরায় করে ফিরছে এতবারি শেখ। দুপাশে ভরাভর্তি নদী। হঠাৎ এতবারির নজরে পড়ল পানিতে ভেসে যাচ্ছে পেতলের ঘটি। স্রোতের মাতায় নাচতে নাচতে যাচ্ছে। আর সেই ঘটির ভেতর চারাগাছ। তেমন বড় নয়। কিন্তু পাতা দেখা যাচ্ছে। এতবারি শেখ প্রথমটায় তেমনভাবে বুঝতে পারেনি। পরে ভালো করে নজর করলে তখন সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল সামনে। তাড়াতাড়ি বজরা নিয়ে সেই পানিতে ভাসা ঘটি ধরল এতবারির লোকজনেরা। তারপর সেই চারা এনে ডাঙায় পুঁতে দিল এতবারি। সেই গাছই বাড়তে বাড়তে—। নাও, তাস ফেল। বলে মনসুর আবারও তার হাতের তাসে মন দিল।

বাইরে, আকাশের গায়ে একখানা কালো মতো মেঘ শিকারি বেড়াল হয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে মেরে এগোচ্ছিল। এই আষাঢ়ে এখনও তেমন ঝেঁপে জল হয়নি। আবার জল হলেও গরম কমছে না। কালো মেঘ একটু একটু করে চাঁদ ঢেকে দিলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া ফিসফিস করে বলে গেল, এবার বৃষ্টি আসতে পারে।

হাওয়া এই বলে যাওয়ার পর পরই দু-এক ফোঁটা দু-এক ফোঁটা করে নেমে গেল। হাটচালার ভেতর তাসুড়েদের সে সবে খেয়াল নেই। তারা সবাই হাতে তাস, রঙ, তার ফোঁটা—সাহেব বিবি গোলাম আর টেক্কা—এই সব নিয়েই নিজেদের ভেতর বলে যাচ্ছিল।

নতুন করে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে শ্যামের মনে পড়ল এই অচিনগাছ দশটিকে বাঁচানোর জন্যে ভাইপো যুগল আর তার সব বন্ধুরা কী সব কমিটি টমিটি করেছে কেলাবের তরফ থেকে। সেই কমিটি এইসব গাছ বাঁচাতে কী কী সব করছে।

কই গো শ্যামদা, তাস ফেল।

হ্যাঁ। বলতে বলতে শ্যাম তার হাতের তাস খেলুড়ের ভেতর বিলোতে থাকল।

খুব সকালেই বৃষ্টি নামল ঝমঝম। আষাঢ়ের মেঘ সাজা আকাশ থেকে ফোঁটারা দ্রুত নেমে আসছে পৃথিবীতে। সেদিকে তাকিয়ে যুগলের কাল রাতে দেখা স্বপ্নটা আবারও মনে পড়ে গেল।

অযুগল, তোদের সেই অচিন বৃক্ষ বাঁচাও কমিটি, তার কথা নাকি ক-দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, বেরিয়েছে।

কেন, তোদের কমিটির নাম কাগজে এল কেন?

না আসার কী আছে? আমরা অচিন গাছের ডালপাতা নিয়ে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেছিলাম। কোন জাতের গাছ জানার জন্য।

পেলি কিছু হদিস?

না। বলতে পারল না ওরা।

সে কী রে! কিছুই বলতে পারল না।

নাগো। তাই তো আমাদের এখান থেকে যিনি খবর পাঠান না, সেই মনসুর আমেদ—যাঁকে মনসুরদা বলি আমরা সবাই, সেই মনসুরদা খবরটা করে দিলেন তাঁর কাগজে। এখন তো কলকাতার কাগজে জেলার খবর বেশ গুরুত্ব নিযে ছাপা হয়, সে যাকগে—সেই মনসুরদাই খবর পাঠালেন। আর তা ছাপাও হযে গেল। গাছের কাছাকাছি হাজেরা বিবির চায়ের দোকান আছে না, সেই হাজেরা বিবিই তো বলেছে মকবুলদাকে—অনেক অনেক বছর আগে একটা অচিনগাছ উপড়ে যায়। ইট পোড়ানোর জন্যে আজিজ মৌলবি সেই পড়ে যাওয়া গাছের ডাল কেটেছিলেন। সে রাতেই স্বপ্ন দেখলেন মৌলবি। বলতে বলতে কাল রাতে দেখা স্বপ্ন আবারও মনে পড়ে গেল যুগল কুণ্ডুর। মনে পড়ে যেতেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

মৌলবির স্বপ্নের ব্যাপারটা তো বললি না!

ওতো আমি আর কী বলব! হাজেরা বিবিই যা বলার বলেছে। মৌলবি স্বপ্ন দেখলেন তাঁর ঘরের ভেতর অচিনতলার দশটি গাছ ঢুকে পড়েছে। তারপর তারা ডালপাতা নাড়তে নাড়তে নাচতে লাগল ঘুরে ঘুরে। গাছেরা নাচছে। হাততালি দিচ্ছে। পরদিন সকালে মৌলবিসাহেব অচিনতলায় গিয়ে দেখেন সেই মুখ থুবড়োনো গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যস, ইট পোড়ানোর জন্য যেটুকু ডাল কাটা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে গাছ দিব্যি আগের মতো।

তোরা আরও ভালো বলতে পারবি, কালুপুর-দাসপাড়ার যে ফেমিলির গোরু-ছাগল মারা গিয়েছে রাতারাতি, তারাও ওই অচিন গাছের ডাল কেটেছিল—তাই না?

শ্যাম কুণ্ডুর জিজ্ঞাসার উত্তরে যুগল বলল, হ্যাঁ—সেইরকমই তো শুনেছি।

বাইরে আষাঢ়ের আকাশ সমানতালে বৃষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীতে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যাম বলল, একটু বাইরে বেরোনোর দরকার ছিল, তার মধ্যে বৃষ্টি।

যে স্বপ্নটা দেখলাম—প্রাইমারি স্কুলের পিয়ন যুগল কুণ্ডু কাল রাতে দেখা স্বপ্নটা মনে করতে চাইল। কালো কালো অনেকগুলো লোক দা-কুড়ুল হাতে হইহই রইরই করে ছুটে

আসছে। স্বপ্নটা কেমন যেন কালো কালো। যেমন হয় ছবি তুলে ক্যামেরার ভেতর থেকে রোল বের করে স্টুডিও থেকে ধোয়ানর পর। সেই লম্বা কালো ফিতের মধ্যে জিনিসটা চোখের সামনে মেলে ধরলেই তো তার ভেতর কী কী আছে—সব খানিকটা খানিকটা ফুটে ওঠে চোখের সামনে। কী যেন বলে তাকে। কী যেন বলে! নিজের ভেতর নিজেই হাতড়াচ্ছিল যুগল। ও, মনে পড়েছে নেগেটিভ। নেগেটিভ। স্বপ্নটা কেমন যেন নেগেটিভ হয়ে বসে গেছে মাথার ভেতর।

হা-রে-রে-রে-হা-রে-রে-রে করে সেই নেগেটিভমার্কা লোকগুলো ছুটে আসছে। তাদের হাতে কাটারি, কুড়ুল। কী চিৎকার! বাপরে বাপ।

কারা হামলা করবে অচিনতলায়! কারা কেটে নেবে গাছ! ভাবতে ভাবতে যুগল বাইরে তাকাল। সেখানে তখনও অঝোরে বৃষ্টি।

আমার কুমড়োর চালান আসবে হাটতলায়। থাকা দরকার ছিল। কিন্তু এমন নচ্ছার বৃষ্টি—। বলতে বলতে শ্যাম ব্যাজারমুখে আকাশের দিকে তাকাল।

অ ঠাকুরপো, তুমি কি চা খাবে?

বেলা নটা বাজে প্রায়। আর ঘণ্টা দুই পরেই ইশকুল। তবু যুগল কুণ্ডুর এক কাপ গরম চায়ের ইচ্ছে হল এই বৃষ্টির সকালে। বত্রিশ হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে হয়নি। মাথার সব চুল উঠে মস্ত টাক পড়ে গেল। তেমন রোজগার নেই। পয়সার জোর না থাকলে বউ পোষা যায়! আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের চোয়াড়ে মুখ, কোল বসা চোখ, ঢোকা গাল দেখে নিজের ওপরই রাগ হয় বেশি। কিন্তু করা যাবে কী! আমার বাবার মাথাতেও বড় টাক ছিল। মামাদেরও মস্ত মস্ত টাক। তাই দাদা আমি—কারও মাথাতেই চুলের বিশেষ বালাই নেই। দাদার ছেলে দুটোও কালেদিনে আমাদের মতো টেকো হবে।

তোমার দাদাও চা খাবে কি?

খাব। খাব। বলে শ্যাম মেঘে বৃষ্টিতে কাদা কাদা আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারও ব্যাজার হয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যুগল তার গত রাতে দেখা স্বপ্নের ল্যাজটা খুঁজে পেল। গলাবাজি করতে করতে দৌড়ে আসা লোকগুলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাদের সকলেরই ছুটে আসা পায়ের পাতা, হাতে উঁচু করে ধরে রাখা মুঠোবন্দী দা-কুড়ুলের চকচকে ফলা, আর মুছে যাওয়া মুখের মধ্যে শুধুই ঝকঝকে দাঁত দেখতে দেখতে চায়ের কাপ হাতে শিউরে উঠল যুগল। আর চুল খোলা একটা মেয়ে, তার পরনের শাড়িটি শাদা, পিঠের ওপর চুল ফেলে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে অচিন গাছেদের কোনো একজনকে। মেয়েটির দুহাতের বেড়ের মধ্যে সেই গাছ। দা-কুড়ুল নিয়ে ছুটে আসা লোকেরা এবার ধীরে ধীরে পিছোচ্ছে। পিছোচ্ছে...

বৃষ্টি বোধহয় থেমে এল! আমায় ছাতাটা দে তো যুগল। বলে শ্যাম তার পাঁচ বছরের ছোট ভাইয়ের ঘোর ভেঙে দিল।

কোথায় কমল বৃষ্টি! এর মধ্যে হাটে না গেলেই নয়!

না রে, বললাম না কুমড়ো নামবে। অনেক টাকার ব্যাপার। নিজে থাকলে ভালো হয়।

দে, ছাতা দে। বলেই ঠক করে চায়ের কাপ-ডিশ নামিয়ে রাখল শ্যাম।

স্বপ্নে অচিনগাছ আটকান মেয়েটির মুখ কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিল না যুগল। তার চওড়া পিঠ ছাপান কালো চুল—তাকে দেখে শ্রাবণের মেঘের কথা মনে পড়ে যেতে পারে কোনো কবির—সেই দীর্ঘ কেশমালা দেখতে দেখতে যুগল তার পুরো স্বপ্নটাকেই কালো করে ফেলল।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ যেমন থাকে, তেমনই ভেসে আছে নিজের মতো। তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো বড় একখানা টর্চের ফোকাস হয়ে এসে পড়েছে পৃথিবীর মুখে।

দশেক্কে দশ—এমন নামতা পড়ে একা একা দাঁড়িয়ে অচিন গাছেরা। চার পাশে আর কোনো শব্দ নেই। শুধু এক এক করে গাছতলায় এসে হাজির হচ্ছিলেন সেই কুমিরে চেপে ঘুরে বেড়ান দরবেশ, কামরূপ-কামাখ্যার জাদুকর। দরবেশ জাদুকরকে দেখতে পেলেন না। জাদুকরও দেখতে পেলেন না দরবেশকে। গাছ—দশটি গাছ একসঙ্গে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল সেই শাদা আলখাল্লা পরা শাদা চুল-দাড়ির দীর্ঘ মানুষটিকে। তাঁর হাতে সাপ চেহারার ত্যাড়াবাঁকা লাঠি। লাঠির গায়ে পেতলের গজাল, লাল নীল পাথর।

হুজুরসাহেবের গলার রঙিন পুঁতি আর বড় বড় পাথরে চাঁদগলা আলো এসে পড়েছে। জাদুকরের ঝলমলে শেরোয়ানি, চোস্ত পাজামা, বাহারি পাগড়িতেও চাঁদ আর চাঁদ। জাদু দেখান মানুষটি কেয়ারি করা সরু, কালো গোঁফের পাশে জ্যোৎস্না নিজের নিয়মে ইলিবিলি কাটছিল।

হুজুরসাহেবের কুমির চুপ করে উপুড় হয়েছিল অচিনতলায়। তার কালচে পিঠে জ্যোৎস্নার আলপনা। চাঁদের দিকে তাকিয়ে কুমিরটি খুব আস্তে আস্তে নিজের ল্যাজ নাড়ছিল। আর তখনই সেই পিতলের ঘটিটি ভেসে এল জলের ওপর দিয়ে। তার গভীরে একটি নবীন চারা। সেই চারার ডগে, পাতায় জ্যোৎস্না মাখামাখি।

অচিনতলায় অনেক অনেক বছর আগের একটি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি নিজের নিয়মে নেমে এল।

হুজুরের ঘোড়া

কিস্যাটা এমন ছিল—বাগদাদ থেকে আসা পীরসাহেব হজরত শাহমনি রহমাতুল্লা (রঃ) নিজের ঘোড়া আর পোষা বাঘ নিয়ে ঘুরতেন।

এ গল্পটি দলপতিপুরের সবাই জানে।

গ্রামের বয়স্ক বুজুর্গরা কেউ কেউ বলেন, তখন হল গে মোসলমানদের রাজত্তি। বাদশা মোসলমান। কি দাপট মোসলমানের।

আশপাশে পীরবাবার অনেক মুরিদান। তারা এখনও রাতে হজরত শাহমনি রহমাতুল্লাকে শাদা ঘোড়ায় চেপে পাশে বাঘ হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে দেখে। বাঘ নয় তো পোষা কুকুর। একেবারে মাথা নিচু করে হুজুরের পাশে পাশে। এই সব মুরিদানদের ভেতর নৈটির মুজিবুর রহমানের নানাও আছে।

দৌলতপুরের লোকজন চাঁদের আলোয় পীরসাহেবকে দেখে আজও। কিংবা তারও জন্মের অনেক অনেক আগে যে জন্মেছে সেই মানুষটির কাছ থেকে পীরদর্শনের গল্প শোনে।

তা হ্যাঁ বাবা, হুজুরের উরস কবে?

সে তো হয় ফি বচ্ছর ফাল্গুনের তের চোদ্দ আর পনের—পর পর এই তিনদিন। তখন হজরত শাহমনি রহমাতুল্লা সাহেবের বংশধারার লোকেরা আসেন মোল্লা সিমলে, গড়মান্দারন থেকে।

আশপাশের কেউ নয়, বাইরে থেকে হঠাৎ আসা কেউ জানতে চাইলে এমন উত্তর পাওয়া যায়। পীরাবাবার সমাধির পাশেই দারসে আলিয়া মাদ্রাসা। একতলা বাড়ি। ছাত্ররা থাকে। একপাশে রান্নাবান্না। ঢাউস কড়াই। বিশাল উনোন। বড়সড় হাঁড়ি।

মাদ্রাসার পেছনে অনেক বড় আর পুরনো এক গাছ। সেই গাছের মাথায় পাখি। তাদের কিচিরমিচির।

গাছ জিজ্ঞেস করে, ও ভাই মাদ্রাসা, তোমার বয়েস কত?

তা হল গে বছর পঁয়তাল্লিশ। বাংলা ১৩৬০ সনে গাঁথাগাঁথি শেষ হল। তোমার কত?

তা হবে—হ্যাঁ—শ দেড়শ তো হবেই। বয়েসের কি আর গাছ পাথর আছে আমার!

এখন তো তোমার খুব বোলবোলাও—তাই না মাদ্রাসা ভাই?

গাছের কথায় মাদ্রাসা চুপ।

চুপ করে রইলে কেন? রোজার ঈদের খাল ব্যাচা পয়সা, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিল কেটে চাঁদা তোলা—সে তো অনেক টাকা গো—বাচ্চা ছেলে সব, কি কচি কচি মুখ সবার—মাথায় একটা মইশে ধরা শাদা টুপি তার সঙ্গে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি, দ্বীনের কাজ করছে বাবারা। টাকা তুলছে।

এই মাদ্রাসা বাড়িয়ে কি লাভ হচ্ছে বল তো! মুসলমানের ছেলে এমনিই চাকরি-বাকরি পায় না। আরবি শিখে চাকরি হয়! দিল্লি গিয়ে কষ্ট করে মৌলানা পাশ করে এসে বড় জোর সাত আটশ টাকা মাস মাইনেতে মৌলবিসাহেব। সংসারে এক গাদা চ্যাঁ ভ্যাঁ। গুচ্ছের

বালবাচ্চা, দায়দায়িত্ব। সাত আটশ টাকায় কি হয় বল তো এ বাজারে? একটাই বাঁচোয়া, লোকের বাড়ি দাওয়াত থাকে। তা হবে, মাসের মধ্যে কুড়ি দিন। কিন্তু হলে হবে কি! সেও বড় মশলাদার খাবার দাবার। তেল, ডালডা, ঝালমশলা। চর্বিঅলা গোস্ত। পেটে সইলে হয়।

এ সব শুনে চুপ করে থাকে মাদ্রাসা। বাড়িটির সামনে চৌকো মতো উঠোন। তারপর মাথার ওপর ছাদ ঢালাই করে রঙ করা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা জায়গা একটা। গাছ জানে ওখানে ভিড় হয় উরসের সময়। ফি বচ্ছর ফাল্গুন মাসে।

মাজার ছাড়িয়ে ডানদিকে খানিকটা গেলে অনেকগুলো মাটির বাড়ি। মাথায় টালির চাল। সে সব বাড়িতে হজরত শাহমনি রহমাতুল্লা সাহেবের অনেক মুরিদান। ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাশে বাঘ হাঁটান পীরবাবা তাঁদের মাঝে মাঝেই দেখা দিয়ে যান।

ভাদ্রের আকাশ কেমন যেন থম মেরে আছে। মাটির উঁচু দাওয়ায় বসে শাকুর আলি বাইরে চড়ে যাওয়া রোদের তাপ টের পেল। ঘরের ভেতর পায়ার নিচে ইট দিয়ে অনেকটা তুলে ধরা চৌকির পেছন দিকে ঝাপসা মতো অন্ধকার লেগে আছে। মাটির দেয়ালে।

তক্তপোশ থেকে নেমে পাছা, কোমর ঘষটে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দাওয়ায় নেমে এলে গায়ে কাঁথা লাগে। কাঁথার শাদা জমি তেল ধুলো আর সময়ে কেমন যেন কালচে। তার গায়ে পুরনো তেলের গন্ধ। সুতোর ফোঁড়ে সময়ের আঁচড়।

হরিপালের নৈটি থেকে আসা মুজিবুর রহমান তার নানাকে দেখে কি যেন কি ভেবে আবারও বাইরে উঠোনের দিকে তাকাল। সেখানে অনেকগুলো দিশি মুরগি। ঝুঁটি ফোলান গোটা দুই তাগড়া মোরগ। মাঝে মাঝেই কঁক কঁক কঁক কঁক করে মুরগি তাড়াচ্ছিল মোরগরা। আর পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে, কখনও ঘাস সরিয়ে পোকা খুঁজছিল।

এসবই চোখ এড়িয়ে গেল মুজিবুরের। সে এই পীরসাহেবের মুরিদান পাড়ায় ঢুকতে ঢুকতে গাছ আর মাদ্রাসার কথাও একটু একটু শুনতে পেয়েছে। সবটা বুঝতে পারেনি। তাদের নৈটির বাড়ির পাশে যে মসজিদ, তার পাশে পুকুর। সেই পুকুরের ঘাট বাঁধান। মসজিদটি বেশ প্রাচীন। তার বড় গম্বুজের গায়ে তৈরি হওয়ার হিজরি সনটি লেখা আছে। মসজিদ আর পুকুর কথা বলে।

কি বলে?

সেও সব ঠিকঠাক মনে পড়ে না মুজিবুরের। সে কখনও পুকুরে নেমে পানিতে কুল্লি করতে করতে শুনতে পায়—

মানুষের ইমান কমছে।

মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে।

তা হলে মসজিদে এত ভিড় কেন? নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে মুজিবুর।

জবাব মেলে না।

অ মুজু—বাপ আমার—ভেতর থেকে ডাক দিল নানি। দুটো মুড়ি খাবি নাকি বাপ?

তা খাব। বলতে বলতে মাটির দাওয়ার ওপর থেবড়ে বসে পড়ল মুজিবুর। আর এই বসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে থাকা রোদের টুকরো খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। বসে বসে

আজ সকাল থেকে যা যা হয়েছে মনে পড়ল পরপর।

মসজিদের পাশের পুকুরে জাল টেনে বড় রুই মাছ ধরা হয়েছে। তার থেকে গোটা দুই মুজিবুরের ভাগে। চার শরিকের পুকুর। সেই মাছ ভাগ হবে। আমার দু মেয়ে—রুপো আর সোনা। তারা দুজনেই বাংলা ইস্কুলে পড়ে। একজন ক্লাস ফাইভ আর একজন সিক্স। তা দুই বোন তো মাছ দেখে একেবারে খুশিতে দশখানা। মাছ খেতে দু বোন যে ভালোবাসে, তা কিন্তু নয়। অ্যাণ্ডা খেতে পছন্দ করে বেশি—তাও দিশি মুরগির ডিম। নয়ত দিশি মুরগির মাংস।

মেয়েদের মা—আমার বউ রাখি একেবারে মুখে তুলবে না মাংস। তা সে হোক না খাসি, মুরগি কিংবা গোরু-গোস্ত। সে মাছ ভালোবাসে। ছোট মাছ একটু বেশি। ভারি মানুষ। দু দুটো মেয়ে আমার। আমার মায়ের খুব ইচ্ছে একটা খোকা হোক—দুই খুকির পর। আমি তো মায়ের একটাই ছেলে। দাদাটা মরে গেল না—গাড়ি চাপা পড়ে। তারপর তো পাগল পাগল দশা মায়ের।

আমারও খুব ইচ্ছে একটা খোকার। আহা, কেউ চেরাগ জ্বালাতে থাকবে না বংশের। পরের ছেলেরা জামাই হয়ে এসে সব নেবে। এই নিয়ে রাখিকে কিছু বললে চুপ করে থাকে।

তুমি তো ইস্কুল ফাইনাল অব্দি পড়েছ রাখি। ইস্কুলের নাম রুকসানা খাতুন। আমিও তো সেই ক্লাস টেন অব্দিই। এটুকু ভেবে নিয়ে বছর চুয়াল্লিশের মুজিবুর বাইরের আকাশ দেখল। তারপর নিজের ভেতরেই বলে উঠল, আমার এই খোকা হওয়ার ইচ্ছেয় তুমি কোনো জবাব দাওনা। এসব নিজেকে নিজে বলে চুপ করে যায় মুজিবুর।

সকালে পঞ্চায়েত প্রধানের দু চাকা এল এই দিকে। পার্টির কাজ আছে প্রধানের। আমিও তো প্রধানেরই পার্টির লোক। তাই ঐ গাড়ির পেছনে নৈটি থেকে দলপতিপুর।

রাখিকে আবারও একটা পেটে ধরার কথা বললে চুপ করে থাকে। কিন্তু ছেলের শখ যে একেবারে নেই। তাও বলা যাবে না।

তুমি আমাদের খেতমজুর হারা-লক্ষ্মীর ছেলে বিকাশকে কেন রাখ আমাদের বাড়ি?

বিকাশকে আমি ভালোবাসি। তুমিও তো ভালোবাস।

নিজের বউয়ের সঙ্গে এসব কথা হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান চুপ করে যায়। তার মনে পড়ে সোনা রুপো—আমাদের দুই মেয়ে অসম্ভব ভালোবাসে বিকাশকে। বিকাশও ওদের। সংসারের অনেক কাজ করে বিকাশ। জল তোলে। ফাই-ফরমাশ খাটে। উঠোন ঝাঁট দেয়।

সকালে জালে ধরা মাছ দুটো নিয়ে বিকাশ একটা বড় ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখল। তখনও প্রধানের ফটফটিয়া এসে ডাকেনি। উঠোনে ঝুড়ির নিচে ধড়ফড়ান দু'দুটো মাছ। শেষ রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। আলগা গুঁড়ো ধুলো সেই ঝমঝমানিতে ভিজে খানিকটা কাই কাই। রুপোলি'পেট পিঠের দুটো মাছ ধড়ফড় করছে ঝুড়ির তলায়। খানিকটা দূরে চোখ বুজে ম্যাঁও ম্যাঁও ডাকা দুটো বেড়াল। ডানা ঝটপটান কাক একটা। বিকাশ তাদের তাড়াল। অ্যাই, যাঃ! হুস হুস।

মেঘ ভাঙা রোদ্দুরের ঝুড়ি চুঁইয়ে খানিকটা খানিকটা সেই জোড়া মাছের গায়ে। শেষ রাতের বৃষ্টিতে ভাঁটফুল ভিজেছে। সঙ্গে পাতারাও। পাতিলেবু গাছের লেবু, পাতা—সবই বৃষ্টিতে ভিজে একসা।

সিমেন্ট বাঁধান উঁচু বারান্দার একেবারে শেষ দিকে রাখির রান্নাঘর। পাশে আলু রাখার ঘর। মাঠ থেকে আলু উঠলে রাখা হবে কয়েক বস্তা। সেই ঘরে একটাই জালের দরজা। জানলা নেই। কালকের বৃষ্টিতে উঠোনের পুরনো আমগাছ অনেকক্ষণ ধরে চান করার পর দিব্যি মাথা নাড়ছে আরামে।

বিকাশ উঠোনে খোঁয়াড়ের হাঁস-মুরগিদের দরজা খুলে দিয়েছে। এবার জল আনবে বাইরে থেকে। জল আনতে আনতে বিকাশের মনে হল এ বাড়ির কাকি আমায় কি ভালোইবাসে। দিদিরাও খুব ভালো। সকালে এক সঙ্গে মুড়ি খাই আমরা। তার আগে চা-বিস্কুট। কোনো কোনো দিন মুড়ির বদলে পরোটা। কাকি কিছুই খায় না আমায় না দিয়ে।

রান্নাঘর থেকে রাখি ডাক দিল—অ বিকাশ!

যাই কাকি।

রাখি একটু নিচু হয়ে দু মুখো উনোনের ভেতর এক মুঠো শুকনো তুষ ছুঁড়ে দিল। দপ করে লাফিয়ে উঠল আগুন।— অ বিকাশ, কেরোসিনের জায়গাটা একটু দিয়ে যা বাবা।

দালানে জলের বালতি নামিয়েই বিকাশ ছুটল কেরোসিনের বোতল আনতে। ঘরে চৌকির ওপর সোনা-রুপো বসে বসে পড়ছে। কি সুন্দর তাদের পড়ার সুর। বিকাশও অ চেনে। আ চেনে। ক খ গ। ১, ২, ৩। কাকি চেনায়।

আমায় পড়তে ইচ্ছে করে না। লিখতেও না। বারে বারে লেখা ভুল হয়ে যায়। বানাম কিছুতেই ঠিক হয় না।

বানাম নয় বিকাশ, বানান। ঠিক করে বল। কাকি বলবে। সোনাদি রুপোদিও তার সঙ্গে ধুয়ো ধরে ধরে।

ঐ হল। সব কি মনে থাকে নাকি!

লেবু গাছে কালকের বৃষ্টিতে ছিঁড়ে যাওয়া জাল আবারও বুনে বুনে সারিয়ে নিচ্ছিল মাকড়সা। একটা টুনটুনি লাফ দিয়ে উঠোনের এ কোণ থেকে খানিকটা সরে গিয়ে ছোট উড়ানে লেবু পাতার ফাঁকে বসল কাঁটা বাঁচিয়ে। সেইটুকু ঝাঁকুনিতে মাকড়সা তার জাল বোনা থামাল। তারপর আবার শুরু করে দিল জোড়াতালির কাজ।

মাছ দুটো বড় ঝুড়ির নিচে ঝটপট ঝটপট করে উঠেই চুপ করে গেল। দুটো শালিক এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে সেই দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়ল খেলায়। বাড়ির কার্নিশে যে পায়রারা ভোর থেকে বক বকম বক বকম করতে করতে গলা সাধছে, তাদের থেকে একটা দুটো ছোট্ট ওড়নে জায়গা বদল করল। তাদের ডানায়, গলায় ভোরের মেঘভাঙা আলো।

এ সবই এক সঙ্গে দেখতে পেল বিকাশ।

পায়রাদের ওড়াউড়ি, ডাকাডাকিতে তার মনে পড়ল এবাড়িতে রাতে প্যাঁচা আসে। প্যাঁচা এসে কার্নিশে বসে। রাতে পায়রা ধরে খায় প্যাঁচা। রাতের বেলা কুকুর-বেড়ালের

চোখ যেমন জ্বলে, তেমন প্যাঁচারও।

সোনাদিদি রুপোদিদি বলে, পয়রা নয় বিকাশ, বল পায়রা। ক্লাস সিক্সের সোনাদিদি, ক্লাস ফাইভের রুপোদিদি। দুজনেই আমায় পড়তে বসায়। ভালোবাসে। তেলেভাজা, জিলিপি, সন্দেশের কোনা ভেঙে দেয়। কাকিও পড়ায়। কিন্তু আমায় পড়তে ভালো লাগে না। বাইরে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। একতলায় কাকাদের বড় চারটে ঘর। লম্বা, সরু বারান্দা। সেখানে কাকার মা বিছানায় শুয়ে। বুড়ি দিনরাত পান খায়। দাঁত নেই। নিজেই লোহার ছোট হামানদিস্তায় ছ্যাঁচে। তারপর গালে দেয়। পানের লালচে রস বেরিয়ে আসে ঠোঁটের পাশ দিয়ে।

সে বুড়ি যে কত গল্প বলে।

জিন-পরিদের গপ্‌পো। ঘোড়া আর বাঘঅলা পীরের গপ্‌পো। সিন্দাবাদ। আলিবাবা, মর্জিনা-আবদাল্লা। সোহরাব-রোস্তম। আমার খুব ভালো লাগে গপ্‌পো শুনতে।

কাকাদের বাড়ি অনেক বড়। দোতলা। চারখানা বড় বড় ঘর দোতলায়। সামনে লম্বা বারান্দা। সেখানে লাল সিমেন্ট। মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা বারান্দায় সকালে পায়রারা এসে আড্ডা মারে। ওড়ে। হাগে। কুটো ফেলে নোংরা করে। কাকি বকে। সব ঝাঁট দিতে হয় আমায়।

কাকার বন্ধুরা এলে দোতলায় থাকে। রাতে শোয়। গরমের দিনে বারান্দায় মাদুর পেতে গল্প করে।

আমার বাবা হারাধন নস্কর। মা লক্ষ্মী। আমাদের বাড়ি নৈটি মোড়ের কাছেই। পাকা রাস্তার ওপর। রাস্তা দিয়ে বাস, ট্রেকার, দু চাকা, রিকশাভ্যান যায়। আমাদের ঘরে ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়। আমার দুই দাদা। এক বোন। দাদা কাজ করে কাকার সুতো কলে।

কাকা তো রোজ সাইকেল নিযে বেরিয়ে সুতো কলে এসে বসে। পাশেই দোতলা পঞ্চাত আপিস। বাইরে লাল রঙ। ভেতরে দোতলায় ফোন আছে। কাকা কারখানা চালু করে পার্টি আপিসে যায়। নয়ত পঞ্চাত আপিসে।

রাখিকে কেরোসিনের বোতল দিতে দিতে বিকাশ দেখতে পেল রান্নার কাঠের জন্যে শুয়ে-বাবলার শুকনো ডাল কাটছে কাকি। যেমন কাকা মোটাসোটা। তেমনি কাকিও। কাকি ফারসা। গোলমুখ। নাকে শাদা নাকছবি। কানে গয়না। কাকা তেমন ফারসা নয়। ময়লা মতো। কিন্তু আমার বাবার মতো কেলে নয়; আমার মাও কালো। তাই আমিও—।

কথা না শুনলে মাঝে মাঝেই কাকা আমায় রাগ করে বলে, এবার বাড়ি রেখে আসব তোকে। সেই শুনেই কি কান্না আমার।

কাকি এসে কাছে টেনে নেয়। বলে, না, না। বিকাশ এখেনে থাকবে। পড়াশুনো করবে। কতা শুনবে।

কত বয়েস হল তোমার! অ বিকাশ, কত হল? কাকাদের খোঁয়াড় থেকে ছাড়া পাওয়া হাঁসেরা লদর গদর লদর গদর করে উঠোন পেরতে পেরতে জিজ্ঞেস করে।

তা আর কত হবে! আট, দশ।

দুর দুর, দশ হবে কেন! বলতে বলতে খেঁকি চেহারার মাদি কুকুরটা চলে যায় পাশ দিয়ে। হাওয়ায় ভ্যাপসা মতো খানিকটা গন্ধ ছড়াল। এই কুকুরটা শুয়ে থাকে কাকাদের উঠোনে। সেখানে ফাঁকা গোয়ালঘর। চাষে হাল দেয়ার বলদ তো এখন আর নেই। খোরাকির অত খরচা পোষায় না। সব বলদ বিদেয় করে দিয়েছে কাকা। তাদের থাকার বড়সড় জায়গাটা আছে। আর আছে ঘরের মাটির মেঝেতে বিঁধে বসে যাওয়া জাব দেয়ার পোড়ামাটির বড় গামলা।

শুধু মাঠে মই টানার জন্যে বলদ লাগে। অনেকে মিলে একটা বলদকে খাওয়ায় সেই কাজের জন্যে।

বলদ রাখার ঘরে খড়ের তড়পা। এখন সব ডিজেলের নাঙল।

কাকা বলে—

কি বলে—কি বলে—কিছুতেই মনে পড়ছিল না বিকাশের।

পাওয়ার টিলার। পাওয়ার টিলার—বলতে বলতে খেঁকি মা-কুকুরটা চলে গেল। এই তো ক মাস আগে সাত-আটটা গ্যাঁড়া বাচ্চা হল তার। তারপর দেখতে দেখতে কেমন বড়ও হয়ে গেল। কুকুরের বাচ্চাগুলো গ্যাঁড়া, আমিও গ্যাঁড়া। বয়েস বোঝা যায় না।

পঞ্চায়েত প্রধানের দু চাকা ক্যাঁক ক্যাঁক করে ডেকে উঠল।

কাকা তো তার আগেই চান টান করে রেডি।

যে খেঁকিটা একটু আগে বিকাশের বয়েস হিসেব করছিল সে আবার বলল—তা সে বাবরি মসজিদ ভাঙাই হয়ে গেল ছ বছর। তখন আমি বেশ ছোট। তারও আগে থেকে তুমি এ বাড়িতে আছ বিকাশ। ভাত খাচ্ছ। মুড়ি খাচ্ছ। জল তুলছ। ঘুমচ্ছ। পড়তে বসতে বললে কান্নাকাটি করছ। মুরগি কেটে আনছ। পায়রা তাড়াচ্ছ। তখন একবার কথা হল না—হিন্দুর ছেলে মোল্লাবাড়ির ভাত খাচ্ছে। এসব কি ফরজ হচ্ছে! তুমি যাকে কাকা বল, মানে আমাদের মুজিবুর রহমান গো—খুব গোঁ তার। জেদ খুব। বললে, বিকাশ আমার বাড়িতে ছিল। থাকবে।

উঠোনের প্রাচীন আমগাছটি কাল রাতের বৃষ্টিতে ভিজে বেশ তাজা আর সরেস। সকালের হাওয়ায় বেশ মজা পেতে পেতে সে বলল, বিকাশের বাবা-মাও তখন খুব কড়া ছিল। আমাদের মুজিবুর যেমন কোনো ফতোয়া মানেনি, তেমনি হারা-লক্ষ্মীরাও কারও কোনো কথা শুনল না। তারা তো মুজিবুরদা, রাখি বৌদি বলতে অজ্ঞান। বলল, আমাদের ছেলে যেমন আছে দাদা-বৌদির কাছে, তেমনই থাকবে।

পঞ্চায়েত প্রধান নৌশাদ আলি মল্লিক আবারও গাড়ি বাজাল। নিজের ভারি পায়ে পলিথিনের হলদেটে চপ্পল গলাতে গলাতে মুজিবুরের মনে পড়ল কাল শেষ রাতে আমি দেখলাম আমার মামার বাড়ি দলপতিপুরের পীরবাবাকে।

তাঁর সঙ্গে শাদা ঘোড়া আর হলুদের ওপর কালো ছোপঅলা বাঘ। পীরবাবার সারা শরীর থেকে কি নুরানি। আলো আর আলো।

প্রধানের মোটর সাইকেলের পেছনে বসতে বসতে মুজিবুর দেখতে পেল পীরের মাজারের সামনে সেই লম্বাটে দুই পাথর। অনেকটা যেন পুরনো বাড়ির বরগা। তেমনই

লম্বা। তবে চওড়াতেও বেশ খানিকটা।

সেই দুই পাথর নাকি পীরের দুই ঘোড়া।

বাগদাদ থেকে এসেছিলেন হজরত শাহমনি রহমাতুল্লা সাহেব। তাঁর ঘোড়ারাও আরবি। আর বাঘ! সে নিশ্চয় এই দলপতিপুর বা তার আশপাশের হবে।

মোটর সাইকেল হাওয়ায় উড়ল। হজরত সাহেবের ঘোড়ারাও এমন উড়তে পারত।

পার্টি মিটিংয়ে সময় মতো পৌঁছতে হবে। নৌশাদ আলি মল্লিক অনেকগুলো ঘোড়ার স্পিড তুলতে চাইল একসঙ্গে।

নানার বয়েস, তা হবে একশর কাছে। নানি আশি পার করেছে। আমার মারই তো সত্তর হতে চলল।

অ মুজু, একটা ব্যাটা হল না তোর! বৌটার বয়েস হয়ে যাচ্ছে। বংশে চেরাগ জ্বালবে কে বাপ!

মুজিবুর তার এক দিনের জমা দাড়ি মোড়া গাল বাঁ হাতের পাতায় ঘষে নিয়ে মনে মনে হিসেব করল আমি বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। রাখি সাঁইতিরিশ আটতিরিশ। এখনও চেষ্টা করলে কেন হবে না! সে সব মুখে না এনে ঠোঁটে খানিকটা হাসি টেনে এনে মুজিবুর বলল, তোমার শরীর কেমন আচে বল তো। ওসব ছাড়ান দাও।

ব্যাতা বাপ। সারা গতরে ব্যাতা! বিষ একেবারে। নড়তে পারি না। চাঁদের বাড়া কমায় ব্যাতা বাড়ে কমে বাপ।

বড় এক বাটি মুড়ি তেল মাখিয়ে দিয়ে গেল সেজোমামি। সঙ্গে খানিকটা আদা কুচি, শশা কুচো। কাঁচা লঙ্কা।

বড় থাবায় করে মুড়ি নিতে নিতে মুজিবুরের মনে পড়ল সকালে আমি ছ খানা খাস্তা পরোটা আর আলুর তরকারি খেয়ে বেরিয়েছি। গরম গরম ভেজে দিল রাখি। পোড়া ডালডা আর ভাজা হওয়া আটার গন্ধে এক তলার সমস্ত দালান কেমন যেন অন্যরকম হয়েছিল। তখন দুই মেয়ে সবে উঠে দাঁত ব্রাশ করছে। তাদের দুজনের চোখেই ঘুম। বিকাশ বাঁ হাতে প্যান্ট তুলে ধরে ডান হাতে টিনের বালতি নিয়ে এক কাত হয়ে জল তুলছে। তার পোকালাগা দাঁতে সকালের আলো।

তুমি কেমন আছ নানা? বাটির মুড়ি শেষ করতে করতে তেল-গন্ধঅলা কাঁথামোড়া সেই বুড়োকে জিজ্ঞেস করল মুজিবুর।

কোনো উত্তর নেই।

বাটির মুড়ি অনেকটাই শেষ। সেজমামি এসে জানতে চাইল আর দেবে কিনা। এখন তো আর চাষের মুড়ি নেই। সব কেনা। এসব মনে হওয়ার পরও মুজিবুর আরও খানিকটা মুড়ি চাইল। জলে ভিজিয়ে খাবে।

কি গো নানা!

কাঁথামোড়া সেই অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষটি পাশ ফিরল। কোনো উত্তর নেই।

নিজের মায়ের বাবা শাকুর আলিকে দেখে কেমন যেন কষ্ট হল মুজিবুরের। এই তো জীবন। বাঁচতে বাঁচতে একদিন অচল পয়সা। হোদবোধ নেই কোনো। শুধুই বেঁচে থাকা। খাওয়া ঘুম। পাইখানা পেচ্ছাপ। তাহলে এতদিন বাঁচা কেন? কেন জমি, সন্তান! পার্টি, পঞ্চায়েত অফিস!

শাকুর আলি দূরে ভাদ্রের রোদ দেখছিল। কিংবা দেখছিল না। তার ফ্যালফ্যালে চোখ ছাড়ানো জোড়া আঁশফল হয়ে জেগেছিল টালির চালার নিচে। বেশ কয়েকটা মাছি বার বার উড়ে উড়ে বসছিল শাকুর আলির কাঁথায়। চোখে, নাকের পাটায়। গালের ময়লা মতো দাড়িতে। ঠোঁটেও।

দুপুরবেলা দুটি ভাত ডাল খেয়ে গেলে হত না বাপ! কদ্দিন পরে এলি!

না নানি। এই তো মুড়ি খেলাম। শশা। আবার জলেও ভিজিয়ে খেলাম পরে।

ছোট উঠোনের একপাশে রান্নাঘরে ভাত ফুটে ওঠার গন্ধ। কি একটা পাতাও যেন পুড়ছে সঙ্গে। নারকেল পাতা কি?

হুজুর শাহমনি রহমাতুল্লা সাহেবকে কাল শেষ রাতে দেখলাম। সঙ্গে শাদা ঘোড়া, পাশে বাঘ।

আমায় কি একটা ছেলে দেবে হুজুর!

অ মুজু, বৌমাকে নিয়ে একবার আয়। হুজুরের দোরে বল। গোলাপপানি আগরবাত্তি চাদর দে। ব্যাটা একটা বড্ড দরকার। পরের ছেলেকে খাইয়ে বড় করলেও সে পরই থাকে। এক গাছের ছাল কি অন্য গাছে জোড়া লাগে বাপ!

বাটিতে এখন জলমেশা মুড়ির তলানি ধুলো। বাইরে ভাদ্রের আকাশ নতুন করে মেঘে মেঘে গম্ভীর। হয়ত এখনই পানি আসবে। এবার ফিরতে হবে আমায়। মুজিবুর আবারও চোখের সামনে পাথরের লম্বা পাটা-হয়ে যাওয়া ঘোড়াদের দেখতে পেল।

দারসে আলিয়া মাদ্রাসার উঠোনে তখন টুপি পরা বাচ্চাদের ভিড়। পাথর হয়ে যাওয়া জোড়া ঘোড়ার ওপর মেঘরা বৃষ্টি নামিয়ে আনতে চাইল।

সে রাতে জ্যোৎস্নায় কি এ জাদু ছিল। চাঁদের আলোয় অনেক অনেক বছর আগে পাথর হয়ে যাওয়া দুই আরবি ঘোড়া জেগে উঠল মাঝ রাতে। ঘুমের ভেতর ফোকলা গালের বাইরে নাল ভাঙতে ভাঙতে শাকুর আলি সেই জোড়া ঘোড়াদের দেখতে পেল।

ঘোড়ারা পাশাপাশি দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের ভেতর কথা বলছিল। দলপতিপুর থেকে নৈটি পৌঁছতে তো অনেকটা সময় লেগে যাবে। রাত থাকতে পৌঁছতে পারব কি?

তাদের এসব কথা শুধু শাকুর আলিই শুনতে পেল। আর এই সব শুনতে শুনতে তার খুব জোরে পেচ্ছাপ পেয়ে গেল। শাকুর অন্য অনেক দিনের মতোই এটা বিছানা না উঠোনের নর্দমা—গুলিয়ে ফেলল।

খুব জোরে নাক ডাকছিল মুজিবুরের। রাত ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও গাঢ় হয়ে যায়। শেষরাতে উঠে খামারে যেতে হবে। সেখানে শীতে, শেষ শীতে ধান সেদ্দ হয়। ধানের সময় না হলেও আকাশের নিচে একা একা খামারে বসে থাকতে ভালো লাগে। কোনো কোনো দিন বিকাশ যায় আমার সঙ্গে। বাতাসে তখন অন্যরকম গন্ধ। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল মুজিবুর।

রাখি তার স্বামীর নাক ডাকা শুনতে শুনতে পাশ ফিরল।

পীরসাহেবের জোড়া ঘোড়ারা ততক্ষণে নৈটির মোড় পেরিয়ে মসজিদে, পুকুর ছাড়িয়ে মুজিবুরের উঠোন পৌঁছতে চাইছিল।

পাশ ফিরতে ফিরতে নাক ডাকা থামিয়ে মুজিবুর রাখিকে বলতে চাইল, চলো, বেরতে হবে।